182 Mc 946

সাহিত্যের কথা

IMPERIAL LIBRARY
No. 5855
Date... 31.1.47
CALCUTTA

A 1338

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রকাশক

শ্রীমণীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত

১২৪।৫বি, রসা রোড, কলিকাতা।

182 Me 946.2

চারি টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

ঘোষ প্রেস

৪, প্রাণনাথ সেন লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ-পত্র

সুহৃদ্বর, পণ্ডিতপ্রবর, ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাশ, বি, এ, বি, এল.

মহাশয়ের করকমলে

গত ১৮৯৩ সালের প্রারম্ভে তুমি এবং আমি যখন ঢাকা জুবিলি
অধ্যয়ন করি, তখন হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় তোমার অনুরাগ দে
আমি মুগ্ধ হই। পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পাঠ শেষ-ক
যখন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই, তোমার অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালাভা
চর্চ্চায় কখনও বিরত হই নাই। তাই আজ এই ক্ষুদ্র পুস্তক "সাহিত্য
কথা"—আমাদের এই দীর্ঘব্যাপী, অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সাহচর্য্য
নিদর্শন স্বরূপ তোমার করে অর্পণ করিলাম। ক্ষুদ্র বস্তুও বন্ধু
শক্তিতে বিশাল হইয়া উঠে। আমিও সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করি-

একান্ত স্নেহশীল

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভূমিকা

বিগত পচিশ বৎসর হইতে সময় সময় যে সকল প্রবন্ধ লিখিতাম, কখনও অন্যের অনুরোধে, কখনও বা নিজের প্রেরণায়, সেইগুলি একত্রে যে কোন কালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তাহা আশা করি নাই। আমার একান্ত স্নেহাস্পদ কবি শ্রীমান রণজিত সেনগুপ্ত ও 'বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের' সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই উভয় হিতকারী বন্ধুকে আমার আশীর্ব্বাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, যে একটী নিবেদন লিখিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছে, আমি তাহার উপযুক্ত না হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়া শ্রীমানের অযাচিত স্নেহের অবমাননা করিতে সাহসী হই নাই, সহৃদয় পাঠক আমার ত্রুটী হইলে ক্ষমা করিবেন।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ-ই বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। নানাভাবে আমাকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং আমার বন্ধু শ্রীমান অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সেনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অন্যান্য পত্রিকা যেমন সোনার-বাঙ্গলা,

পূর্ণিমা, শিশির, নবযুগ, রূপ ও রঙ্গ প্রভৃতি কাগজের সম্পাদকবর্গের নিকটও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

হুগলীর শ্রেষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আমাকে অনেক নূতন তথ্য দিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তকের অনেকগুলি রচনা বহু পুরাতন; হয়তো সেইগুলি আরও সংযত হইলে ভাল হইত, কিন্তু সেগুলিকে পরিবর্ত্তন না করিয়া, তখনকার সবটাই পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম। ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

বিনীত

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

১২৪।৫-বি, রসা রোড
কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৫৩

নিবেদন

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ; ১৯২
খৃষ্টাব্দে ওকালতি ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধুর সহিত দেশের কাজে আত্ম
নিয়োগ করিয়া কারাবাস করেন এবং দেশবন্ধুর সহচর হিসাবে
রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত। দেশবন্ধুর পরলোক-গমনের
পর, তাঁহার জীবনী রচনা করিয়া তিনি জীবনীকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লা
করেন। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতা হিসাবে তৎকালে তাঁহা
বিশেষ সুনাম থাকিলেও, ১৩৩৫ সালে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী
বিশ্লেষণ করিয়া 'গিরিশ প্রতিভা' প্রকাশ করিলে, নাট্য-সাহিত্যের সূক্ষ্ম
সমালোচক হিসাবে তিনি প্রখ্যাত হন। তাহার পর ভারতীয় নাট্যমঞ্চের
ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া তিনি
এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে
রাজনীতিক্ষেত্র হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেও, জাতীয় কংগ্রেসের
ইতিহাস রচনা করিয়া ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি ভারতে সর্ব্বজন পূজ্য।
তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী অসংকোচে বলা যায়—বস্তুত তিনি একাধারে
সমালোচক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সামাজিক ও
অনন্যসাধারণ শিল্পী (**Tragic Actor**) এবং সর্ব্বোপরি রাজনীতি-
বিশারদ।

Asiatic Society of Bengal-এর সুযোগ্য সম্পাদক D
Johan Van Manen ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাহার Indian Stage, Vol
নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে য
লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলে তাঁহার পাণ্ডি
সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইবে :—

"A lawyer by profession through force of materi
necessity—day in and day out, busily engaged in t
grim drama, or ludicrous comedy of the Courts—
sheds, as so many of his brethren, his legal rob
when leaving court to become a student of li
instead of one of law, and an incarnation of humani
instead of one of officialdom. It has always stru
me how great a service the lawer class has render
to scholarship and literature in this country,
a tradition which we would hope will not die f
many a long day to come. As secretary of Asiat
Society of Bengal I can not forget that this Venerab
society itself was founded by a lawyer, Sir Willia
Jones, and I most heartily welcome this latest follow
of the old example."

সম্প্রতি গত জুলাই মাসের 'The Teacher's Journal' মাসিকপ
হেমেন্দ্রবাবুর নব প্রকাশিত "Subhas Chandra" পুস্তকখা
সুমালোচনা প্রসঙ্গেও উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"Dr. Das Gupta the author of this volume needs no introduction to the reading public. He is widely known as a journalist, litterateur and a patriot. His recent writings on national topics have added to his fame as a thinker and keen observer of INTERNATIONAL POLITICS."

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি হিসাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, তাঁহার বঙ্গভাষায় বিভিন্ন সময়ে রচিত, বিবিধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সুলিখিত অজ্ঞাত প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত প্রবন্ধগুলি দেখিয়া, একত্রে গ্রথিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি; কারণ বিভিন্ন বিষয়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজি প্রকাশিত হইলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের-ই সমৃদ্ধি হইবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু বৈষ্ণব-সুলভ বিনয় সহকারে তিনি ঐগুলি প্রকাশ করিতে সংকোচ বোধ করেন এবং বলেন যে ঐগুলি বহুদিন পূর্ব্বের রচনা, বর্ত্তমানের সহিত উহার খাপ খাইবে না।

বস্তুতঃ স্বর্গে গিরিশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম ও মুসলমান, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও বাঙ্গলার প্রথম গদ্যগ্রন্থ, যাত্রার ইতিবৃত্ত প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যে কোন কালেই পুরাতন হইবে না, তাহা কে অস্বীকার করিবে।

অভিনেতা ও নাট্যকারগণ, দেশসেবকগণ, সাহিত্যিকগণ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তকে নাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস লেখকরূপে, জাতীয় কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত লেখকরূপে, "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদক ও বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতিরূপে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গিরিশ অধ্যাপকরূপে ও যশস্বী অভিনেতা হিসাবে জানেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সমস্যা লইয়াও, তিনি যে ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার লেখনী-নিসৃত প্রবন্ধগুলি হইতেই প্রমাণিত হইবে। আমার বিশ্বাস ইহাতে সাহিত্যের লেখনী অবশ্য জ্ঞাতব্য গ্রন্থের ব্যাপার হইল।

তাঁহার ন্যায় বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে অল্পই আছেন; তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির কথায় বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তল্লিখিত রচনা গুলি প্রকাশ করায়, তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি এবং পরিশেষে আমার একান্ত অনুরোধ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলার সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসার কল্পে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের ঐকান্তিক সাধনার যথাযোগ্য পুরস্কার ও তাহার বিরাট কার্য্যে সহযোগিতা প্রদান করিতে কখনও বিস্মৃত না হন।

শুভ মহালয়া
৭ই আশ্বিন, ১৩৫১

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
সম্পাদক, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন।

সূচিপত্র

১।	বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব	...	১—১৪
২।	স্বর্গধামে বঙ্কিম-গিরিশ প্রসঙ্গ	...	১৫—৩০
৩।	রবির পিছনে একটি ছায়া	...	৩১—৫৬
৪।	গিরিশ ও চিত্তরঞ্জন	...	৫৭—৫৯
৫।	জাতি ধর্ম্ম সমন্বয়ে গিরিশচন্দ্র	...	৬০—৬৫
৬।	নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র	...	৬৬—৬৯
৭।	কল্পনা ও বর্ত্তমান মহাসমর	...	৭০—৮০
৮।	ভক্তিমূলক নাটক ও শ্রীরূপগোস্বামী	...	৮১—৯১
৯।	ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র	...	৯২—১০২
১০।	পানিহাটীতে শ্রীচৈতন্যদেব	...	১০৩—১২৬
১১।	গিরিশচন্দ্র	...	১২৭—১৩৭
১২।	সমাজ সংস্কারে শরৎচন্দ্র	...	১৩৮—১৫৩
১৩।	" " " " " " (২	...	১৫৪—১৬৫
১৪।	দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী	...	১৬৬—১৮১

১৫।	দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র	...	১৮১—২০১
১৬।	বঙ্কিম ও মুসলমান	...	২০২—২১০
১৭।	যাত্রার ইতিবৃত্ত	...	২১১—২৫৭
১৮।	রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাঙ্গলা অভিনয়	...	২৫৮—২৬৩
১৯।	প্রথমাভিনীত খাঁটি বাঙ্গলা নাটক	...	২৬৪—২৭৩
২০।	অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন	...	২৭৪—২৮৩
২১।	স্বাদেশিকতায় রবীন্দ্রনাথ	...	২৮৪—২৯৭
২২।	বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম গদ্য পুস্তক	...	২৯৮—৩০৮

182 Mc 946

সাহিত্যের কথা

IMPERIAL LIBRARY
No. 5855
Date... 31.1.47
CALCUTTA

A 1338

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রকাশক

শ্রীমণীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত

১২৪।৫বি, রসা রোড, কলিকাতা।

182 Me 946.2

চারি টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

ঘোষ প্রেস

৪, প্রাণনাথ সেন লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ-পত্র

সুহৃদ্বর, পণ্ডিতপ্রবর, ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাশ, বি, এ, বি, এল.

মহাশয়ের করকমলে

গত ১৮৯৩ সালের প্রারম্ভে তুমি এবং আমি যখন ঢাকা জুবিলি
অধ্যয়ন করি, তখন হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় তোমার অনুরাগ দে
আমি মুগ্ধ হই। পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পাঠ শেষ-ক
যখন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই, তোমার অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালাভা
চর্চ্চায় কখনও বিরত হই নাই। তাই আজ এই ক্ষুদ্র পুস্তক "সাহিত্য
কথা"—আমাদের এই দীর্ঘব্যাপী, অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সাহচর্য্য
নিদর্শন স্বরূপ তোমার করে অর্পণ করিলাম। ক্ষুদ্র বস্তুও বন্ধু
শক্তিতে বিশাল হইয়া উঠে। আমিও সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করি-

একান্ত স্নেহশীল

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভূমিকা

বিগত পচিশ বৎসর হইতে সময় সময় যে সকল প্রবন্ধ লিখিতাম, কখনও অন্যের অনুরোধে, কখনও বা নিজের প্রেরণায়, সেইগুলি একত্রে যে কোন কালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তাহা আশা করি নাই। আমার একান্ত স্নেহাস্পদ কবি শ্রীমান রণজিত সেনগুপ্ত ও 'বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের' সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই উভয় হিতকারী বন্ধুকে আমার আশীর্ব্বাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, যে একটী নিবেদন লিখিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছে, আমি তাহার উপযুক্ত না হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়া শ্রীমানের অযাচিত স্নেহের অবমাননা করিতে সাহসী হই নাই, সহৃদয় পাঠক আমার ত্রুটী হইলে ক্ষমা করিবেন।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ-ই বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রিকায় বাহির হয়। নানাভাবে আমাকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং আমার বন্ধু শ্রীমান অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সেনকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অন্যান্য পত্রিকা যেমন সোনার-বাঙ্গলা,

পূর্ণিমা, শিশির, নবযুগ, রূপ ও রঙ্গ প্রভৃতি কাগজের সম্পাদকবর্গের নিকটও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

হুগলীর শ্রেষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আমাকে অনেক নূতন তথ্য দিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তকের অনেকগুলি রচনা বহু পুরাতন; হয়তো সেইগুলি আরও সংযত হইলে ভাল হইত, কিন্তু সেগুলিকে পরিবর্ত্তন না করিয়া, তখনকার সবটাই পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলাম। ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

বিনীত

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

১২৪।৫-বি, রসা রোড
কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৫৩

নিবেদন

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয় স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ; ১৯২
খৃষ্টাব্দে ওকালতি ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধুর সহিত দেশের কাজে আত্ম
নিয়োগ করিয়া কারাবাস করেন এবং দেশবন্ধুর সহচর হিসাবে
রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত। দেশবন্ধুর পরলোক-গমনের
পর, তাঁহার জীবনী রচনা করিয়া তিনি জীবনীকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লা
করেন। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনেতা হিসাবে তৎকালে তাঁহা
বিশেষ সুনাম থাকিলেও, ১৩৩৫ সালে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী
বিশ্লেষণ করিয়া 'গিরিশ প্রতিভা' প্রকাশ করিলে, নাট্য-সাহিত্যের সূক্ষ্ম
সমালোচক হিসাবে তিনি প্রখ্যাত হন। তাহার পর ভারতীয় নাট্যমঞ্চের
ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া তিনি
এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে
রাজনীতিক্ষেত্র হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেও, জাতীয় কংগ্রেসের
ইতিহাস রচনা করিয়া ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি ভারতে সর্ব্বজন পূজ্য।
তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী অসংকোচে বলা যায়—বস্তুত তিনি একাধারে
সমালোচক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সামাজিক ও
অনন্যসাধারণ শিল্পী (**Tragic Actor**) এবং সর্ব্বোপরি রাজনীতি-
বিশারদ।

Asiatic Society of Bengal-এর সুযোগ্য সম্পাদক D
Johan Van Manen ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাহার Indian Stage, Vol
নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত সম্বন্ধে য
লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলে তাঁহার পাণ্ডি
সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইবে :—

"A lawyer by profession through force of materi
necessity—day in and day out, busily engaged in t
grim drama, or ludicrous comedy of the Courts—
sheds, as so many of his brethren, his legal rob
when leaving court to become a student of li
instead of one of law, and an incarnation of humani
instead of one of officialdom. It has always stru
me how great a service the lawer class has render
to scholarship and literature in this country,
a tradition which we would hope will not die f
many a long day to come. As secretary of Asiat
Society of Bengal I can not forget that this Venerab
society itself was founded by a lawyer, Sir Willia
Jones, and I most heartily welcome this latest follow
of the old example."

সম্প্রতি গত জুলাই মাসের 'The Teacher's Journal' মাসিকপ
হেমেন্দ্রবাবুর নব প্রকাশিত "Subhas Chandra" পুস্তকখা
সুমালোচনা প্রসঙ্গেও উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"Dr. Das Gupta the author of this volume needs no introduction to the reading public. He is widely known as a journalist, litterateur and a patriot. His recent writings on national topics have added to his fame as a thinker and keen observer of INTERNATIONAL POLITICS."

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি হিসাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, তাঁহার বঙ্গভাষায় বিভিন্ন সময়ে রচিত, বিবিধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সুলিখিত অজ্ঞাত প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত প্রবন্ধগুলি দেখিয়া, একত্রে গ্রথিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি; কারণ বিভিন্ন বিষয়ের সুচিন্তিত প্রবন্ধরাজি প্রকাশিত হইলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের-ই সমৃদ্ধি হইবে বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু বৈষ্ণব-সুলভ বিনয় সহকারে তিনি ঐগুলি প্রকাশ করিতে সংকোচ বোধ করেন এবং বলেন যে ঐগুলি বহুদিন পূর্ব্বের রচনা, বর্ত্তমানের সহিত উহার খাপ খাইবে না।

বস্তুতঃ স্বর্গে গিরিশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম ও মুসলমান, মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও বাঙ্গলার প্রথম গদ্যগ্রন্থ, যাত্রার ইতিবৃত্ত প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যে কোন কালেই পুরাতন হইবে না, তাহা কে অস্বীকার করিবে।

অভিনেতা ও নাট্যকারগণ, দেশসেবকগণ, সাহিত্যিকগণ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তকে নাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস লেখকরূপে, জাতীয় কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত লেখকরূপে, "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদক ও বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতিরূপে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গিরিশ অধ্যাপকরূপে ও যশস্বী অভিনেতা হিসাবে জানেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সমস্যা লইয়াও, তিনি যে ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার লেখনী-নিসৃত প্রবন্ধগুলি হইতেই প্রমাণিত হইবে। আমার বিশ্বাস ইহাতে সাহিত্যের লেখনী অবশ্য জ্ঞাতব্য গ্রন্থের ব্যাপার হইল।

তাঁহার ন্যায় বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে অল্পই আছেন; তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির কথায় বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তল্লিখিত রচনা গুলি প্রকাশ করায়, তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি এবং পরিশেষে আমার একান্ত অনুরোধ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলার সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসার কল্পে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের ঐকান্তিক সাধনার যথাযোগ্য পুরস্কার ও তাহার বিরাট কার্য্যে সহযোগিতা প্রদান করিতে কখনও বিস্মৃত না হন।

শুভ মহালয়া
৭ই আশ্বিন, ১৩৫১

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
সম্পাদক, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন।

সূচিপত্র

১।	বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব	...	১—১৪
২।	স্বর্গধামে বঙ্কিম-গিরিশ প্রসঙ্গ	...	১৫—৩০
৩।	রবির পিছনে একটি ছায়া	...	৩১—৫৬
৪।	গিরিশ ও চিত্তরঞ্জন	...	৫৭—৫৯
৫।	জাতি ধর্ম্ম সমন্বয়ে গিরিশচন্দ্র	...	৬০—৬৫
৬।	নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র	...	৬৬—৬৯
৭।	কল্পনা ও বর্ত্তমান মহাসমর	...	৭০—৮০
৮।	ভক্তিমূলক নাটক ও শ্রীরূপগোস্বামী	...	৮১—৯১
৯।	ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র	...	৯২—১০২
১০।	পানিহাটীতে শ্রীচৈতন্যদেব	...	১০৩—১২৬
১১।	গিরিশচন্দ্র	...	১২৭—১৩৭
১২।	সমাজ সংস্কারে শরৎচন্দ্র	...	১৩৮—১৫৩
১৩।	" " " " " " (২	...	১৫৪—১৬৫
১৪।	দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী	...	১৬৬—১৮১

১৫।	দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র	...	১৮১—২০১
১৬।	বঙ্কিম ও মুসলমান	...	২০২—২১০
১৭।	যাত্রার ইতিবৃত্ত	...	২১১—২৫৭
১৮।	রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাঙ্গলা অভিনয়	...	২৫৮—২৬৩
১৯।	প্রথমাভিনীত খাঁটি বাঙ্গলা নাটক	...	২৬৪—২৭৩
২০।	অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন	...	২৭৪—২৮৩
২১।	স্বাদেশিকতায় রবীন্দ্রনাথ	...	২৮৪—২৯৭
২২।	বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম গদ্য পুস্তক	...	২৯৮—৩০৮

সাহিত্যের কথা

——()*()——

বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব *

বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া আমরা বাঙ্গালী জাতি যে সংস্কৃতি লাভ করিয়াছি, সেই সম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের পুনরুক্তি করিয়া বর্ত্তমান বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করিবনা। প্রথমাবস্থা হইতে বাঙ্গলার গীতিকাব্য কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়া পত্রপুষ্পে অপূর্ব্ব শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গান, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাসের গান কিরূপে একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, কবিওয়ালাদের সরস কবিতা, পাঁচালি ও অন্যান্য পদাবলীর কথা, মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী বা বাঙ্গলা ভাষার গদ্য ও পদ্য, যাত্রা ও নাটকের উপর তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাবের কথাও বলিব না। এমন কি কৃত্তিবাস ওঝা বা কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কি মাধবাচার্য্য, ক্ষেমানন্দ কি বিজয় গুপ্ত, শিবায়নের রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বা ধর্ম্মমঙ্গলের ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, এমন কি ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা বা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীত সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিব না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গদ্য ও পদ্য

---

* ১৯৪৫ সনের ১লা এপ্রিল বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের দৌলতপুর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। পরবর্ত্তী ৭ই জুলাইর 'সোনার বাংলা' হইতে গৃহীত।

কিরূপে পল্লবিত হইয়া কালক্রমে মহামহীরূহে পরিণত হইয়াছে, আর কিরূপে তাহা সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে বলিয়া আশা হইতেছে, সেই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। এই বিষয়ে অনুধাবন করিলেই খুলনা যশোহরের প্রভাব বঙ্গ ভাষার সংস্কৃতির উপর কিরূপ সমধিকভাবে বিস্তার করিয়াছে তাহাই প্রথমে হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই নাম করিতে হয়, সাগরদাঁড়ির মধুসূদনের, তারপরেই দীনের বন্ধু দীনবন্ধুর। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনার সহিত যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল তাহাও সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন খুলনা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় খুলনার অন্তর্গত বরাখালি গ্রামে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গার ফলেই মোড়লগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মোড়ল পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্বদেশ-প্রত্যাগত হন। এ দাঙ্গার ফলে কয়েকটি স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ হয়। রহিমতুল্লা নামক এক ব্যক্তি আহত হয়। এই দাঙ্গার সর্দ্দার ছিল মোড়লের লাঠিয়ালের সর্দ্দার, একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক আইরিশ যুবক হিলি। এই দাঙ্গার তদন্তের ভার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ বঙ্কিমচন্দ্রের উপরই দিয়াছিলেন। অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া এবং ঘটনা স্থল দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত হন। আর সকলে তাঁহার গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। দুই বৎসর মোকর্দ্দমা চলে খুলনায়, যশোহরে ও কলিকাতায়। কাহারও কাহারও ফাঁসি হয়। কাহারও দ্বীপান্তর হয়। কিন্তু হিলির বিচার হয় হাইকোর্টে শ্বেতাঙ্গ জুরীগণের সহায়তায়। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কিন্তু হিলি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়। এই মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ যখন বাহির হইবে (আশা করি শীঘ্রই হইবে) সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন

যে এই হিলিই বঙ্কিমচন্দ্রের অমর-লেখনীতে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে লরেন্স ফষ্টররূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তদন্তের সময় জনৈক সাহেব এক হস্তে এক লক্ষ টাকার নোট আর অন্য হস্তে পিস্তল লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল। বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বঙ্কিম তাহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন।" চন্দ্রশেখরে যে আমরা পড়ি—গ্রামবাসীর চীৎকার কোলাহল—বন্দুকের শব্দ, রোদনের ধ্বনি, মশালের আলো—স্ত্রীলোক লইয়া পলায়ন—সবই এই দাঙ্গায় হুবহু ছিল। হিলি যেমন now or never বলিয়া দ্বিতীয় বার রহিমের বাড়ী চড়াও করে, ফষ্টর দ্বারাও তেমনি চন্দ্রশেখরের বাড়ী চড়াও হয়। হিলি যেমন নাম বদলাইয়া আসামের জঙ্গলে ঘুরিতেছিল, ফষ্টরও জন্ ষ্টালকাট্ নাম দিয়া প্রাণভয়ে পলাইতে-ছিল। চন্দ্রশেখরে আছে, আমীর হোসেন যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে "লরেন্স ফষ্টর নামে একজন ইংরাজকে আপনি চিনেন?" ফষ্টর উত্তর করে "কৈ না!" আমীর হোসেন—"কখনও তাহার নাম শুনিয়াছেন?" ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করে,—"নাম লরেন্স ফষ্টর—হাঁ, কই না"। হিলিও প্রথমে তাহার নাম ভাঁড়াইয়াছিল, পরে আপনাকে হিলি বলিয়া পরিচয় দেয়। ভগীবিবিকে লইয়া যাওয়া—ফষ্টরের শৈবলিনীকে লইয়া পলায়নের অনুরূপ ঘটনা। নবাবের আদেশে কুক্কুর দংশনে মৃত্যু হইবে শুনিয়া ফষ্টর যেমন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমের নিকট ধৃতাবস্থায় আনীত হইলে হিলিও সেইরূপ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তবে হিলির নিষ্ঠুরতা বিবৃত করিবার ভাষা অভিধানে নাই, আর বঙ্কিম চিত্রিত ফষ্টর হিলির তুলনায় খুব শিষ্টতার সহিতই চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমের **Rajmohan's wife** এই

খুলনায়ই লিখিত। খুলনায় বসিয়াই বঙ্কিম তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর দুইটি অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। এই জিলার নদীতীরস্থ বৃক্ষরাজির আভাস পাইবেন 'সীতারামে'। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রসাদপুরের কুটীরের ধ্বংসাবশেষ, শীর্ণ-শরীরা চিত্রানদী ও নীলকুটির নিদর্শন এখনও মাগুরার অন্তর্গত প্রসাদপুরে পাওয়া যায়। ইন্দিরার ডাকাতিয়া দীঘি এখনও গদখালিতে আছে। 'সীতারাম' যশোহর জিলার ঘটনাশ্রয় করিয়াই লিখিত। তাই বলি চব্বিশ পরগণার কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও খুলনা ও যশোহরের দাবী সাহিত্য-সম্রাটের উপরে বড় কম নয়। বস্তুতঃ "বন্দেমাতরম্" গানে এখানে যে লোকে অদ্ভুতভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি-সম্মেলনকে সার্থকনামা করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

বাঙ্গলা ভাষার কথা বলিতে গিয়া একটু দূরে চলিয়া গিয়াছি। এইবার সংক্ষেপে মূল বক্তব্য সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বা পূর্ব্বে চিঠিপত্র, খত্ কবালা, পাট্টা, কবুলতি আদালতের বা চাকুরীর দরখাস্ত আর্জ্জি ও জবাব, ব্যবসায়ের রোকঃ প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কিছু গদ্যে বড় লিখিত হইত না, তদুপরি উহাতে ছিল উর্দ্দু ফারসীর উৎকট গন্ধ। এদিকে আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বাঙ্গালা ভাষাকে বড় অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা চিঠিপত্র পর্য্যন্ত সংস্কৃতে ভিন্ন লিখিতেন না, আর তাহাও আবার দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতে। কেরী প্রভৃতি মিশনরী সাহেবদের কাছে আমাদের কিছু ঋণ স্বীকার করা উচিত বটে, কিন্তু তাঁহারা কথোপকথনেও অনুবাদের ভাষা ব্যবহার করিতেন, যেমন— "একটা সুমান্তুয়ের দুহিতা স্থির করিয়া লিপি লিখিবেন।" ১৮০১ খৃষ্টাব্দে

রচিত রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র তখনকার উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ।* ভাষার নমুনা—

"নওবতখানার উপরে ঘড়িঘর। সেখানে ঘড়িওয়ালারা তাহাদের ঘড়িতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, দণ্ড পূর্ণ হবামাত্রেই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও তখনকার প্রসিদ্ধ গদ্য লেখক। কিন্তু তাঁহার ভাষা অতীব কঠিন। যেমন—

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়া চলানীল, সে উচ্ছ্বলচ্ছীকরাতাচ্ছ নির্ঝরাম্ভ ঃ কর্ণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

ইহাই বাঙ্গলা ভাষা সাহিত্যের প্রথম স্তরের ইতিহাস। তারপর রাজা রামমোহন রায়ের যুগ। তাঁহার সময়ে গদ্য-সাহিত্য অনেকটা নিয়ম বদ্ধ হইল বটে এবং তাঁহার সম্পাদিত "সংবাদ কৌমুদী" বাঙ্গলার প্রথমাদৃত পত্রিকা সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি ভাষা তখন আশানুরূপ সারল্য ও মাধুর্য্য লাভ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠিয়া যায়, আর চারি বৎসরের মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হয়।

তারপর 'সাগরী' যুগ। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই যুগের প্রথম ও প্রধান। তিনি বাঙ্গলা ভাষা সহজ ও সুসংযত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, আর সে চেষ্টা কতকটা সাফল্য মণ্ডিতও

* যতদূর সন্ধান পাইয়াছি, শ্রীরামপুরে রচিত "ধর্ম্ম পুস্তক"ই প্রথম খাঁটি বাংলা ভাষার গদ্যগ্রন্থ। ইহা সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ। কেরী সাহেবের আসিবার পূর্ব্বে ইহা ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। প্রবন্ধান্তরে এই বিরাট গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করিব।

হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু লোকে সাগরী ভাষাকেও বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। তবে তিনি যে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী কবিকে কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন তার পরিচয় পাই এই জিলার তথা বাঙ্গলার গৌরবমণি মধুসূদনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও সহৃদয়তায়। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে ভাষার জন্মদাতা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

সিপাহী যুদ্ধের পরেই বাঙ্গলা ভাষার অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়। এই যুগসন্ধি সময়ে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুর নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস বাহির করেন। সকল বাঙ্গালী ইহা বুঝিতে সমর্থ হইল। আর, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের পথপ্রদর্শক। প্যারীচাঁদ প্রথম দেখাইলেন সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর হয় না। আর যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায় তবে বাঙ্গলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। কিন্তু বঙ্কিমকে এ ভাষাও সম্পূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে পারিল না, কেননা ইহাতে গ্রাম্য দোষ আছে, পার্শী শব্দেরও বাহুল্য আছে—যেমন বেতমিজ, তজবিজ, ফয়সালা ইত্যাদি। উপরন্তু ইহাতে আছে অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে সাগরী ভাষার সংস্কৃতবহুল শব্দ, অন্যদিকে আলালী ভাষার দোষাবলী বর্জ্জন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বনে আর কবি ঈশ্বর গুপ্তের স্বাধীনতা আশ্রয় করিয়া প্রদীপ্ত ভাস্বরের ন্যায় যে অপূর্ব্ব ভাষার প্রবর্ত্তন করেন তাহা অবিনশ্বর, চিরন্তন ও শাশ্বত। বঙ্গভাষা সংস্কৃতির ইহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

বঙ্কিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান ছাত্র; একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী। তিনি ইংরাজী খুব ভাল লিখিতেন। সে সময়ে আবার লোকে বাঙ্গলায় লিখিতে বা বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়িতে মাতৃকলঙ্ক বিবৃতির ন্যায়

লজ্জিত হইয়া পড়িত। এমতাবস্থায় তিনি যে বাঙ্গলা ভাষাই লিখিতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য-মণ্ডলের প্রধান নায়কের আসন গ্রহণ করেন, তাহার একমাত্র কারণ—জাতীয়তা বোধ। ইহাই তাঁহাকে এই মহাকার্য্যে উদ্দীপিত করিয়াছিল। আর ইহা ছিল বলিয়াই সাহিত্য সম্রাটের আসন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিলেই দেশের কার্য্য হয়, অন্য কিছুতে হয় না—এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। জাতি গঠন যে সাহিত্যের দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট ভাবে হইতে পারে —বঙ্কিম-সাহিত্য তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বঙ্গ-দর্শনের সূচনায় এই জাতীয়তা বোধ দেখি আমরা ছত্রে ছত্রে। বঙ্কিম ১৮৭২ সনে লিখিতেছেন—

"এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গলায় হয়না। বিদ্যা-লোচনা ইংরাজীতে। সাধারণের কার্য্য মিটিং, লেক্‌চার, এড্রেস, প্রসিডিংস, সমুদায় ইংরাজীতে। যদি উভয়পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে কথোপকথন ইংরাজীতে হয় কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজীতে। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গলায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন সেখানে বাঙ্গলায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদের এমন ভরসা আছে যে অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজীতে পঠিত হইবে।

"আমরা ইংরাজী বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যতদূর ইংরাজী চলা আবশ্যক ততদূর চলুক, কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখনও ইংরাজ হইতে পারিবে না। আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি, যত ইংরাজী লিখিনা কেন, ইংরাজী

কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।”

এইভাবেই ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলাভাষার সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন ও বর্দ্ধন করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ঐক্য না হইলে, যেমন দেশের মঙ্গল অসম্ভব, বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনও অসম্ভব। আমাদের এমন বিশ্বাস আছে, যদি কোন দেশীয় ভাষার রাষ্ট্রভাষার যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব হয় তবে ভারতীয় ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা ভাষারই সে অধিকার আছে। যে ভাষা সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয় স্পর্শ করে, সেই ভাষারই যেন ব্যবহার ও প্রচলন হয়, সে বিষয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা সাবহিত হইতে হইবে। তাই যেমন প্রাদেশিক কথাগুলি বর্জ্জন করা উচিত, ‘সেইরূপ কোন রাজনৈতিক বা ধর্ম্ম সম্পর্কীয় দলগত সঙ্কীর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি না হয় তাহাও করিতে হইবে।

সর্ব্বাগ্রে উচিত সাহিত্য যাহাতে জাতীয়তা-মূলক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু জাতীয় সাহিত্য জোর করিয়া সৃষ্টি করা যায় না। জাতীয়তা মূলক চেতনার অভাব থাকিলে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করা বিড়ম্বনা মাত্র। জোর করিয়া কেহ ‘বন্দেমাতরম্’ গান রচনা করিতে পারেনা, ‘আমার দুর্গোৎসবও’ লিখিতে পারেনা। ‘কুকুরের রাজনীতি’ হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ না করিয়া পরিবেশন করা কল্পনাতীত। হৃদয়ের জ্বালা না থাকিলে বঙ্কিমের ন্যায় কে লিখিতে পারিত—

“কৈ অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কৈ? মনুষ্যত্ব মিলিল কৈ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কৈ? ঐক্য কৈ? বিদ্যা কৈ? গৌরব কৈ? শ্রীহর্ষ কৈ? ভট্টনারায়ণ কৈ? হলায়ুধ কৈ? লক্ষ্মণ সেন কৈ?”

এই জাতীয়তাবোধই কবিগুরু ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী চালিত করিত—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে,
দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
(কতরূপ স্নেহকরি, দেশের কুক্কুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া)"

মধুসূদনও ব্যারিষ্টার ছিলেন। ইংরাজী পোষাক পরিতেন, ইংরা মহিলার পাণিগ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয়তা বোধ না থাকিে কি তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইত—

ধর্ম্মপথ গামী
হে রাক্ষস রাজানুজ। বিখ্যাত জগতে
তুমি—কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান
যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ। পরঃ পর সদা।

এই জাতীয়তার কথা এই জিলার মধুসূদনেই প্রকৃষ্টভাবে দেখি জাতীয়তাবোধ, স্বজাতি প্রেম ও দরদী প্রাণ না থাকিলে দীনবন্ধুর লেখনী হইতেও বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম এবং এযাবৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ-নাটক "নীলদর্পণ" প্রসূত হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলাভাষা সমগ্র বাঙ্গালীজাতির বোধগম্য করিতে হইলে হিন্দুমুসলমানে দৃঢ়প্রীতি ছাড়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এবিষয়ে

রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মপথই প্রকৃষ্ট পথ—"যত মত তত পথ"। ধর্ম্মের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সকলের আগে আমরা বাঙ্গালী। হিন্দু বাঙ্গালী, মুসলমান বাঙ্গালী,—উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা হইল এক ও অভিন্ন এই বঙ্গভাষা। এইখানেই আমাদের ঐক্য। মুসলমানের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষার অক্ষুণ্ণতা রক্ষণে যত্নশীল। কেহ কেহ আবার ইহা আপন মনে করেনা। এবিষয়ে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অগ্রসর হইব, সে বিষয়েও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিই সর্ব্বথা অনুসরণীয়। ১৮৭৩ সনে বঙ্কিমচন্দ্র মীর মসারফ হোসেন প্রণীত 'জমিদার দর্পণ' নামক একখানি নাটক সমালোচনা করিয়া বলেন—

"জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্ত্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গলাভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গলার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গলা অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গলা পরিশুদ্ধ। ইহার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। বাঙ্গলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক। পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গলার প্রকৃত উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন—হিন্দু মুসলমানে ঐক্য। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়—বাঙ্গলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গলা লিখিবেন না বা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল—ভাষার একতা।" সত্তর বৎসরেরও পূর্ব্বে বঙ্কিম যে কথা লিখিয়াছিলেন আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উচিত সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা। হিন্দুর উচিত খাঁটি বাঙ্গলায় মুসলমান-রচিত গ্রন্থের আদর করা। আর মুসল-

মানের উচিত নিজেকে খাঁটি বাঙ্গলারই লোক মনে করা। আজ কতিপয় হিন্দু-মুসলমান বঙ্কিমের বিরুদ্ধে অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন যে তিনি নাকি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। একথা যে কত অমূলক, অনুকরণপ্রিয় হিন্দু তাহা না বুঝিলেও—খাঁটি হিন্দু-মুসলমান তাহা বুঝিতে পারে। বঙ্কিম হিন্দু-মুসলমানের ঐকান্তিক প্রীতি চাহিতেন বলিয়াই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জন্য বন্দেমাতরম্‌এর ঋষি বন্দেমাতরম্ লিখিয়াছিলেন। হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত্ত্য সমভাবেই তাহার হৃদয় আকৃষ্ট করিত; আর জাতীয় মহাসমিতির উদ্ভবের বহু পূর্ব্বেই 'সীতারামের' চাঁদশা ফকিরের মুখে আরোপ করিয়াছিলেন—

("তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। হিন্দুকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মুসলমানকেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তোমার প্রজা, প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ, পাপের রাজ্য থাকে না।")

বস্তুতঃ সাহিত্য যদি ঋষি বঙ্কিমের জাতীয় সাহিত্যানুরূপ হয়, যদি কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য বর্জ্জিত হয়, যদি সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক বা লৌকিক ভাব বা ভাষার প্রাবল্য না থাকে, তবেই বঙ্গভাষা-সংস্কৃতির প্রসার হইবে, আর সেই সাহিত্য কেবল বাঙ্গলার নয়, সমগ্র ভারতবাসীরই আদরের বস্তু হইবে। যে সাহিত্য আদর্শ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনে পরিণত হন, সে সাহিত্যের স্থানে আজ যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই পরিণাম স্বরূপ আমরা পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মঠ, উদ্যোগী সেবাধর্ম্মপরায়ণ যুবকমণ্ডলী আর পাইতেছি না। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, গিরিশ

ও দ্বিজেন্দ্রলাল সৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাবে যে যুবকদল নব ভারতে গঠিত হইয়াছিল—তাহার চিহ্নমাত্র কোনদিন ছিল কিনা আজ তাহাই সন্দেহ হইতেছে। সাহিত্যের ভাব-পরিবর্ত্তনই ইহার প্রধান কারণ।

সমগ্র ভারতে রাষ্ট্রভাষা কোন্ ভাষা হওয়া উচিত, এই প্রসঙ্গে বহুদিন হইতে অনেক আলোচনা চলিয়াছে। পরিতাপের বিষয় আমাদেরই দেশের বহু মনীষী হিন্দি ভাষার পক্ষে মত দিয়াছেন। বাঙ্গলার মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে, বাঙ্গলার রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তুলনায়—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য যে নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা শতমুখে স্বীকার করিয়াছেন। গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের 'বলিদান', 'প্রফুল্ল', 'বিল্বমঙ্গল', 'গৃহলক্ষ্মী', 'সাজাহান', বিসর্জ্জন, তপতী প্রভৃতি নাটকে যে সৌন্দর্য্য বিদ্যমান—হিন্দি বা অন্য প্রদেশের নাট্যসাহিত্যে তাহার একান্ত অভাব। পরিপুষ্ট মারহাটী সাহিত্যও এ বিষয়ে নিম্নে, এমন কি তাহাদের শ্রেষ্ঠ নাটকেও বাঙ্গলা নাটকের ছায়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ যে বাঙ্গলা ভাষার সৌন্দর্য্যে সকল জগৎ মুগ্ধ, যে ভাষায় শুষ্ক প্রাণও সঞ্জীবিত হয়, যে ভাষার প্রভাব মিথিলা, মণিপুর, আসাম, নেপাল, উড়িষ্যা ও মগধেও প্রসারিত হইয়াছিল, যে ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, যে ভাষা নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমরকাব্য সৃষ্টি করিয়া জগৎকে পরিবেশন করিয়াছেন, বিস্মিত করিয়াছেন, মুগ্ধ করিয়াছেন, সেই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়া হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিলে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির মূলে কঠোর কুঠারাঘাত হইবে। আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য হইবে সে বিষয়ে সমস্বরে আমাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। কিন্তু সে প্রতিবাদ কেবল প্রস্তাবনায় যেন

পর্য্যবসিত না হয়। আমরা যেন বাঙ্গলাদেশ—আমাদের জননী জন্ম-ভূমিকে আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারি। আমাদের এই বঙ্গভাষাকে—আমাদের মাতৃভাষাকে মাতৃসম পবিত্র জ্ঞান করিতে পারি—আর বাঙ্গালী জাতিকে ভ্রাতৃজ্ঞানে ভালবাসিতে পারি। এরূপ সম্ভব হইলেই সংস্কৃতি বৃদ্ধি পাইবে, বাঙ্গলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন সম্ভব হইবে।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই—বঙ্গভাষা সংস্কৃতির প্রসার প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ পুনর্গঠনে। যে রঙ্গমঞ্চ মাইকেলকে কবিশ্রেষ্ঠরূপে সুপ্রকাশ করিয়াছিল—নীলকরের অত্যাচার দমনে সমর্থ হইয়াছিল—সিরাজদ্দৌলা মিরকাশিম, ছত্রপতি, তপোবল রাণা প্রতাপ, মেবার পতন, প্রতাপাদিত্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নাটক বাঙ্গলার জাতীয় জাগরণে অপূর্ব্ব সহায়তা করিয়া নাট্যশালাকে প্রধান জাতীয় বিদ্যায়তনে পরিণত করিয়াছিল, আজ তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া কান্না পায়। ইহাতে অর্থাগম আছে বটে, কিন্তু কোন আদর্শ নাই—সৃষ্টির প্রসার নাই—সংস্কৃতির গৌরব নাই। বাঙ্গালার 'বুদ্ধদেব' এডুইন আর্নল্ডকে মুগ্ধ করিয়াছিল, 'চৈতন্যলীলা'—কর্ণেল, অলকটকে তাঁহার আর্য্যধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছিল, 'বিল্বমঙ্গলের' নব নব সৌন্দর্য্য স্বামী বিবেকানন্দকে সুদূর আমেরিকায়ও বিমুগ্ধ করিত। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বেলগাছিয়া থিয়েটার না হইলে মধুসূদনকে পাইতাম না। জীবন-সন্ধ্যায়ও নাটক ও নাট্যশালাই তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। যখন বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য 'মায়াকানন' লিখেন, তাঁহার অনুগত কৈলাশ বসু লিখিয়াছেন "বিছানায় পড়িয়া রোগ যন্ত্রণায় কবি

ছট্‌ফট্ করিতেছেন—মুহুর্মুহুঃ রক্তবমন হইতেছে, তথাপি নাটক রচনায় বিরতি ছিলনা।" এই নাট্যশালাই পরে গিরিশচন্দ্রের আমরণ সাধনায় শতদলে বিকশিত হইয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতির—বাঙ্গলার শিক্ষা ও সভ্যতার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তাই বলি নাটক ও নাট্যশালা আমাদের কত গৌরবের বস্তু। A nation is known by its theatre. আমরা যদি আবার পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত অমর নাটকাবলীর পুনরাভিনয়ের আয়োজন করিয়া দেশের কর্ম্মীবৃন্দের নিকট তাহাদিগের আদর্শ উপস্থিত করিতে পারি, বঙ্গসাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। আমরা কায়-মনোবাক্যে সাধনা করিব এবং সকলকে সে সাধনায় উদ্দীপিত করিব—বাঙ্গলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া কেবল অখণ্ড বাঙ্গলার নহে, সমগ্র ভারতের জাতীয়তা এবং সংস্কৃতি বৃদ্ধি করিতে যেন সমর্থ হয়—যেন ভিন্ন দেশবাসীও দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া নতজানু হইয়া ইহার সাধনা করে—আর আমরা সমস্বরে বলিতে পারি—

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিত্রিংশ কোটিভূজৈর্ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে—।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গধামে বঙ্কিম-গিরিশ প্রসঙ্গ

১৯২৪ সালের শ্রাবণের এক নির্ম্মল প্রভাতে স্বর্গধামে ভূতপূর্ব্ব নাট্য
কার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বসিয়া 'রামকৃষ্ণ' লীলাকীর্ত্ত
করিতেছেন। পার্শ্বে একদিকে অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, মহেন্দ্র বসু
অমর দত্ত প্রভৃতি বসিয়া গুরুমুখনিঃসৃত বাক্য-সুধা পান করিতেছেন—
অপরদিকে গুরুভ্রাতাগণও গিরিশের মুখে গুরুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ধ
হইতেছেন।* এমন সময়ে হঠাৎ শব্দ হইল—

"গিরিশবাবু বাড়ী আছেন ?"

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন, মনে হইল যেন বড়ই চেনা গলা
ক্রমে সেই শুভ্রকেশ বৃদ্ধের আগমনে সকলেই আসন ছাড়িয়া উঠি
কৃতাঞ্জলি হইলেন। গিরিশচন্দ্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে ঋষিশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র ! বঙ্কিমবাবু, এ যে অভাবনীয় ব্যাপার—
দীনের গৃহে আপনার ন্যায় মহতের পদার্পণ ?"

সকলে সবিস্ময়ে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনে "সুপ্রভাত
'সুপ্রভাত' বলিতে লাগিলেন।

---

* ১২৯১ সালের শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাসের "প্রচার" এবং অগ্রহায়ণের 'ভারত
অবলম্বনে এই প্রবন্ধটী লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত 'সত্যের' ব্যা
লইয়া বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, কথাচ্ছলে সেইটিই বিবৃত হইয়াছে
দুইটী প্রবন্ধই দুষ্প্রাপ্য। ইতিপূর্ব্বে কোথাও উদ্ধৃত হয় নাই। —'বঙ্গশ্রী' ১৩৪৬, ফা

বঙ্কিম। হাঁ গিরিশবাবু, আজ একটী বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনার দর্শনে আসিয়াছি।

গিরিশ। আমার সৌভাগ্য! মর্ত্ত্যে তো কতবার আপনার দর্শন আকাঙ্খা করিয়াছি, কিন্তু অভিমানে যাই নাই। থিয়েটারের লোক বলিয়া আপনি ঘৃণা করিতেন।

বঙ্কিম। গিরিশবাবু, সে কথা আর তুলিবেন না। আপনিই সর্ব্ব প্রথমে আমার 'কপালকুণ্ডলা' নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করান। তারপর 'বিষবৃক্ষ' 'দুর্গেশনন্দিনী' 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম' প্রভৃতির যে রূপ আপনি দেন, অপর কাহারও তাহা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সীতারামে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সম্বন্ধে আমার মনের প্রকৃত ভাবটী যেরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা স্বর্গে বসিয়া আমি উপলব্ধি করিয়া বড়ই তৃপ্তি পাইয়াছি।

গিরিশ। বঙ্কিমবাবু—বড়ই বাধিত হইলাম। আপনার উদারতায় মুগ্ধ হইলাম—কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' করিয়া বলিবেন না। আপনি ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা এবং সর্ব্বোপরি বয়োজ্যেষ্ঠ—আমায় দয়া—

বঙ্কিম। গিরিশবাবু—ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার কথা কি বলিতেছেন? আপনি শঙ্করাচার্য্যের মুখে যে অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন, তাহা কোন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মুখে শুনি নাই। "বিল্বমঙ্গলে' যে নির্ব্বিকল্পসমাধির কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব। আমি অনেক জ্ঞানের কথা লিখিয়াছি টে, কিন্তু জ্ঞান-ভক্তি জড়িত এমন সুন্দর অবস্থার পরিকল্পনা বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। দেখুন, মর্ত্ত্যে আপনার প্রতি আমার একটু বিতৃষ্ণাই ছিল; আমার ছোট জামাইটী থিয়েটারে ভিড়িয়া আমার মেয়ের প্রতি অবজ্ঞা

করিয়া আমার মেয়েটীর আত্মহত্যারই কারণ হইয়াছিল। যাক্ যত দিন যাইতেছে আপনার গৌরব অনুভব করিতেছি।

গিরিশ। দেব, আপনার বিনয়ে মুগ্ধ হইলাম। আমাদেরও ভ্রান্তি ছিল যে আপনার দম্ভই আমাদের কাছে আপনাকে আসিতে দেয় নাই। কিন্তু পরে অক্ষয়বাবু, চন্দ্রবাবু, নবীনবাবু ও সুরেশের নিকট বুঝিয়াছি আপনার আত্মা কত নির্ম্মল! আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়াছি। আপনি আমায় আর 'আপনি' বলিয়া লজ্জা দিবেন না।

বঙ্কিম। দেখ গিরিশবাবু, বয়োধিকের সম্মান পূর্ব্বে ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক আজ মর্ত্ত্যে এক ব্যক্তির ক্রন্দন আমাকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছে।

গিরিশ ও অমৃতবাবু, প্রভৃতি (সমস্বরে)। সে কিরূপ দেব! কে সে ভাগ্যবান!

বঙ্কিম। চিত্ত ছোঁড়াই আমাকে ঠিক বুঝেছে (এখন হইতে উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন)। আজ কি না ভাই—

গিরিশ। ওঁকে আপনি ছোঁড়া বল্‌ছেন! ওঁর 'দেশবন্ধু' নামের জয়ধ্বনি সমগ্র ভারতের গগনে বেজে উঠেছে! ওঁর মত আত্মত্যাগী দেশ-ভক্ত ধরায় কি কেউ আছে? ও যে মর্ত্ত্যের দধীচি ও হরিশচন্দ্রের একত্র সমাবেশ!

বঙ্কিম। গিরিশ, এই না তুমি আমায় জ্যেষ্ঠের সম্মান দিচ্ছিলে! ওঁর বড় জ্যেঠামহাশয় কালীমোহন দাশ ও আমি যে একই বৎসরে জন্মেছি—

গিরিশ। ওঃ, তাই। ওঁর সম্বন্ধে আমারও কিছু বলবার আছে।

আগে আপনি বলুন—ওঁর কথা শুনবার জন্য আমি বড়ই ব্যগ্র হয়েছি।

বঙ্কিম। গিরিশ, যখন 'সপ্তমীর দুর্গোৎসব' লিখি, দেশের চিন্তায় কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি। যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে লিখেছিলুম 'মা, মা, একা রোদন করিতেছি—মা, কাঁদিতে কাঁদিতে, চক্ষু গেল মা।" ঐ যে জীবনে কেঁদেছি, মরণে কেঁদেছি, সেই কান্নার আজ সুফল হয়েছে।

গিরিশ। বঙ্কিমবাবু, অনেক দিন চিত্তরঞ্জন আমার সঙ্গে মর্ত্তে দেখা করতে এসেছিল, তাতে আমি বুঝেছি বাল্য ও যৌবনের প্রারম্ভেই আপনার কথা ওঁর 'মরমে পশেছিল।' আমার লেখা অনেক কথাই ওঁর মুখস্থ ছিল বটে, কিন্তু মর্ত্তে ওঁর ন্যায় আপনার দ্বিতীয় ভক্ত আর নাই।

বঙ্কিম। গিরিশ, আমার কাঁঠালপাড়ার বাড়ীতে—কাল চিত্ত যখন কাঁদতে কাঁদতে বলে 'এস-মা গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি'—সে ক্রন্দন স্বর্গেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

গিরিশ। আপনি এখানেও মর্ত্তের চিন্তা করেন কি না তাই!—আমি ত এখন 'রামকৃষ্ণ' ছাড়া কিছুই দেখিনা।

বঙ্কিম। হাঁ ভাই, মর্ত্তের চিন্তায় এখনও আমি ব্যাকুল—দেখ চারিদিক দিয়ে সপ্তরথীতে আক্রমণ করেছে, আর চিত্ত ঐ রুগ্ন দেহখানি লয়ে সকলকে আহ্বান ক'রে বল্‌ছে—

"চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি! ভয় কি, না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"—

(আবেগভরে) গিরিশ 'আমার দুর্গোৎসব' লেখা, 'বন্দেমাতরম্' লেখা, 'আনন্দমঠ' লেখা সার্থক হয়েছে।

গিরিশ। দেব, আপনি ঋষি, মর্ত্ত্যে আপনি যে জন্মভূমির সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে তার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ ও ভক্তির কথা বলে এসেছেন, তাতেই এক সময়ে তারা জন্মভূমির শৃঙ্খল মুক্ত কর্ত্তে পার্ব্বে!

বঙ্কিমবাবু নীরব হইলেন—সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে অমৃতবাবু সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, রবীন্দ্রনাথকেও তো আপনি খুব উচ্চ সম্মান দিতেন। রমেশ দত্ত মহাশয়ের কন্যা কমলা বসুর বিবাহের সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। সাহিত্য-সম্রাট্ হিসাবে রমেশবাবু যে মাল্যে আপনার কণ্ঠ বিভূষিত করেন, আপনি তাই রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দেন। শ্রেষ্ঠ সম্মান ত আপনি তাঁকেই দিয়ে এসেছেন —এখন কি আবার অন্যের প্রতি এরূপ কৃপা শোভা পায়।

বঙ্কিম। ও, তুমি অমৃত বসু, না? আমার কয়েকখানা উপন্যাস তুমিও রূপান্তরিত করেছ। হাঁ তুমিও গুণী-লোক বটে, তবে আমি বলছি দেশাত্মবোধসম্পন্ন সর্ব্বত্যাগী ঋষির কথা। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগে কয়েকটী সঙ্গীত ও প্রবন্ধে সবাইকে মুগ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু নরওয়ে হতে এসে অবধি বড়ই ইবসেন ও মেটারলিঙ্কের ভক্ত হয়েছে। ইউরোপীয় আদর্শ ভারতে চলে না। আর 'বিশ্ব' নিয়ে সে এখন বড়ই ব্যস্ত। আমার দৃষ্টি "জন্মভূমি", সঙ্কীর্ণ হ'লেও ওই আমার মাথার মণি।

গিরিশ। মশায়, আপনার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওঁর একবার বড়ই বাদানুবাদ হয়েছিল না?

বঙ্কিম। গিরিশ, তোমার মনে আছে সে কথা? 'প্রচারের' প্রথম

সংখ্যায়ই (১২৯১, শ্রাবণ) আমি 'হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি। তাই নিয়ে ওরা দলবদ্ধ হয়ে আমায় জব্দ করতে চেয়েছিল !

অমৃত বসু। মহাশয়, আপনি গল্পটি আমাদের বলুন তো—

গিরিশ। ও, মনে পড়েছে ! আপনি বলেছিলেন 'রবির পেছনে একটি বড় ছায়া আছে'। হাঁ, তখন এই নিয়ে বড্ড হৈ চৈ হয়েছিল।

বঙ্কিম। দেখ আমি 'প্রচারে' দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছিলাম—হিন্দু কে ? একজন ছিলেন পূজা-সন্ধ্যা আহ্নিক-প্রিয় ; কিন্তু কিরূপে অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব নেবেন, বিনাপরাধে লোককে জেলে দেবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দেবেন, এই চিন্তায়ই রত থাকতেন। আর একজন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন না—অভক্ষ্যে আপত্তি নেই—ম্লেচ্ছের সঙ্গেও ভোজন করে থাকেন, কিন্তু কখনও মিথ্যা কহেন না, যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক লোক-হিতার্থে যেখানে মিথ্যা একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেখানেই কেবল মিথ্যা বলে থাকেন। নিষ্কাম হয়ে দান ও পরহিত সাধন করেন, যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়-সংযমী অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন, কাউকে যন্ত্রণা দান করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না, ইন্দ্রাদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা ক'রে সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন এবং পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা ক'রে আপনাকে বৈষ্ণব বলে পরিচিত করেন। হিন্দু-ধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি পুত্রকলত্রাদির সস্নেহে প্রতিপালন করে থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এই সব লিখে আমি জিজ্ঞাসু হয়েছিলাম যে উভয়েই কি হিন্দু ? একজন ধর্ম্মভ্রষ্ট, আর একজন আচারভ্রষ্ট।

তারপর আলোচনা করি যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি ? তারপর আমি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ উল্লেখ করে বলি সব সময়ে সব নিষেধই মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে কি কর্ত্তব্য ?—এক হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, নতুবা হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ যেটুকু অবলম্বনে সমাজ চলতে পারে বা উন্নত হতে পারে সেইটুকু আশ্রয় করা। আমি এও বলি যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকর, কেন না পৃথিবীতে যে কয়টি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আছে—বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তিন ধর্ম্মই—ভারতবর্ষে হিন্দু-ধর্ম্মকে স্থানচ্যুত ক'রে তার আসন গ্রহণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে-ছিল বটে, কিন্তু কেহই হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করতে পারে নাই—ইসলাম-ধর্ম্ম হিন্দু নামধারী কতকগুলি অনার্য্যজাতিকে অধিকৃত করেছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করতে পারে নাই —বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবর্ষ ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরে পলায়ন করেছে—আর খ্রীষ্টধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম হয়েও কদাচিৎ একখানি নমঃশূদ্রের বা পৌণ্ড্রের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন তখনকার দিনের কুক্কুট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছু ক'রতে পারে নাই। অতএব হিন্দুধর্ম্মের স্থান কোন ধর্ম্ম অধিকার করতে পারে নাই, পারবেও না,—আর ব্রাহ্মধর্ম্ম ? এতো হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র, বিশেষতঃ এর এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাতে মনে করতে পারা যায় যে ভবিষ্যতে এ সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হতে পারে।

গিরিশ। হাঁ, তখনকার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের এমন হুজুগ বেড়েছিল যে, আপনার এ লেখায় অনেক কাজ হয়েছিল—আমার "চৈতন্যলীলা"র অভিনয়ও ঐ বৎসরেই হয়—আর দর্শকগণও রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের

সঙ্গে হরিনাম করে উঠতো। শশধর তর্কচূড়ামণিও সে সময়ে খুব বক্তৃতা দিতেন না ?

বঙ্কিম। হাঁ হে, আমি তাঁকেও উপলক্ষ্য করে লিখেছিলাম। তার পর শুন, আমি আরও বলি যে—আচ্ছা সব কথাটাই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি—

"তবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখাইয়াছি যে শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখনও সমাজ চলিতে পারে না—এখনও চলিতেছে না। কিন্তু বোধ হয় কখনও চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আছে—তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দু ধর্ম্ম দ্বারা সমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম, যে, যেটুকু হিন্দুর প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার ; ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে এবং অজ্ঞ এবং নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস অথবা কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ-মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সে সকল

এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক মানসিক সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত; এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মে নাই। সেইটুকুই সার-ভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেইটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে,—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহা-ভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।

"এ কথায় দুইটী গোল বাধে, প্রথম বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম্ম আছে বা থাকিতে পারে একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। তাঁহাদের যা হোক একটা ধর্ম্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাঁহারা একথা অস্বীকার করিবেন না।

"আর একটী গোলযোগ এই যে, শাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্‌টুকু ধর্ম্ম কোন্‌টুকু ধর্ম্ম নয়? কোন্‌টুকু সার, কোন্‌টুকু অসার? উত্তর আপনাদের মীমাংসা করিতে হইবে। যেখানে সত্যের লক্ষণ আছে তাহা গ্রহণ করিব, আর যেখানে সে লক্ষণ দেখিব না তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প

লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।"

বঙ্কিমবাবু 'প্রচারে'র লিখিত প্রাচীন কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

গিরিশ। বঙ্কিমবাবু, এতদিনে আপনার 'আনন্দমঠে'র কথাগুলি লোকের বোধগম্য হইবে।

অমৃতবাবু। গুরুদেব, আনন্দমঠের কোন্ কথা ?

গিরিশ। ভূণী, তুই জানিস না—আনন্দমঠে যে লেখা আছে—

"প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে।"

"—তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে। সে একটা লৌকিক, অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে।"

বঙ্কিম। গিরিশবাবু, তুমি ঠিক আমার মনের কথাটি বলেছ। কিন্তু রবি কি করেছিল জান ?

গিরিশ। চল্লিশ বৎসরের কথা, সবটা ঠিক মনে নাই, আপনি নিবেদন করুন।

বঙ্কিম। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নীরব ছিলেন, কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে (১২৯১) "ভারতী"তে একটী প্রবন্ধে আমাকে বিস্তর গালাগালি দেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল "একটি পুরাতন কথা।" কিন্তু ইতিমধ্যে নব্যভারত ও সঞ্জীবনীতে রবীন্দ্রবাবুর দলস্থ বহুব্যক্তি আমাকে আক্রমণ করেন, তাই আমি তখন লিখেছিলাম "রবির পেছনে একটি ছায়া আছে।"

গিরিশ। রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছিলেন ?

বঙ্কিম। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় বলেন—

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এই কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে! আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের "মুখ্য" লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন ?" ভারতী, ১২৯১, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৩৪৭।

আচ্ছা গিরিশ, বক্তৃতার সময় শ্রোতারা এই 'মুখ্য' শব্দটা কি মূর্খের অর্থে গ্রহণ করে নাই ?

আর কবেই বা আমি স্পর্দ্ধা সহকারে লোক ডাকিয়া বলিয়াছি "তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও, মিথ্যার আরাধনা কর"—

গিরিশ। কেবল কি এইটুকুই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ?

বঙ্কিম। না হে না, তাঁর কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজে পাই।

গিরিশ। তা কি আপনার মনে আছে ?

বঙ্কিম। হাঁ, তিনি আমার বিষয়ে বক্তৃতায় বলেন—

"লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই-খানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্য্যন্ত, তারপরে তিনি বলেন, "কোনথানেই মিথ্যা সত্য হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

গিরিশ। এই কথায় এইরূপ বল্‌বার কারণ কি হতে পারে ? সবটা বুঝিয়ে বলুন—

বঙ্কিম। প্রথমে দেখ 'কল্পনা' শব্দটি সত্য নয়। আমি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করেছি, আমার লেখায় তা ছিল না। আমি কল্পনা করি নাই, আমি সত্য সত্য দুইটি জীয়ন্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তাঁরা তখনও বেঁচে ছিলেন। আমি লিখেছিলুম, 'আর একটি হিন্দুর কথা বলি', এতে কল্পনা বুঝায় না।

তারপর 'আদর্শ' শব্দটা আমার কথায় বা ভাবে মাত্রই ছিল না। যে ব্যক্তি কখনও কখনও সুরাপান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলে গৃহীত কিরূপে হতে পারে ? এই দুই কথাই "অসত্য"। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, লেখকের বাক্য-বলে হয়েছিল, অতএব 'যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়', এ কথার কোন অর্থ নাই।

অমৃত। আপনাকে ত এরূপ শ্লেষোক্তি ভাল—

বঙ্কিম। তারপর মহাভারত যাঁর পড়া আছে, তিনি কৃষ্ণোক্তি কথাটির আরোপ করিয়া শ্লেষ করিতেন না।

গিরিশ। হাঁ, হাঁ, মহাভারতে এরূপ কৃষ্ণোক্তির কথা আছে।

বঙ্কিম। হাঁ তোমার পড়া আছে জানি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করে শুয়ে আছেন, তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে কৃষ্ণার্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হলেন। অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠির অধীর-ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, "কর্ণ কি নিহত হয়েছে?" অর্জ্জুন প্রত্যুত্তরে জানান যে হয়নি। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ও তাঁহার গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে গাণ্ডীবের নিন্দা-কারীর তিনি নিশ্চয় প্রাণবধ কর্‌তে বিরত হবেন না। তিনি স্থির করেন আগে জ্যেষ্ঠের প্রাণবধ করবেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আত্মহত্যা করবেন। এখন জ্যেষ্ঠকে বধ না করলে 'সত্য'চ্যুত হ'তে হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বুঝান যে এরূপ সত্য রক্ষণীয় নয়, এখানে সত্যলঙ্ঘনই ধর্ম্ম। সুতরাং মিথ্যাই সত্য হয়। রবীন্দ্রবাবু truth সত্য falsehood মিথ্যা ইংরাজী অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমি ব্যবহার করেছি প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষে যেরূপভাবে ব্যবহৃত হয়ে আস্‌ছে সেই অর্থে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, কথা রাখা এও তো সত্য, সুতরাং 'সত্য' কথাটী 'truth' এর চেয়ে অনেক বিশাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর হত্যা করব, দস্যুতা করবো, পরপীড়ন করবো এইরূপ প্রতিজ্ঞা যদি কারও থাকে, তা না রক্ষা করাই ধর্ম্ম। এখানেও সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম, অর্থাৎ মিথ্যাই সত্য।

দেখ, গিরিশবাবু—রবীন্দ্রবাবুকে আমি বার বার বলেছি সত্য জিনিষটা

খুবই ভাল, সত্যের প্রতি কারও অভক্তি নাই। কিন্তু সত্যের ভাণের উপর আমার বড় ঘৃণা ছিল। যাঁরা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলেন, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভাণ বলেছিলুম। এজিনিষ এদেশে বড় ছিল না, কিন্তু বিলাত হ'তে ইংরাজীর সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানী হয়েছে। এটা বড়ই কদর্য্য। মৌখিক lie direct সম্বন্ধে যত আপত্তি—কার্য্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সেকালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, lie direct সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না। কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না। আমি 'দেবী চৌধুরাণী'তে তা দেখিয়েছি। তবে দুইটিই পাপ। এখন ইংরাজী শিক্ষার গুণে হিন্দু-পাপটা হ'তে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু ইংরাজী পাপটা বড় বেড়ে উঠেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু বোধ হয় এতদিনে বুঝেছেন। আমি সে সময় সাবধান করে দিয়েছিলুম যে সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে গিয়ে কেবল আন্তরিক সত্যের প্রতি অমনোযোগ না ঘটে। পথটি বড় পিচ্ছিল।

গিরিশ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আপনার কি এখনও একটু অন্যরূপ ভাব আছে?

বঙ্কিম। বল কি গিরিশ? অত বড় কবি ও সাহিত্যিক বাঙ্গলার ভাগ্যে জন্মেছে? তাঁকে তো এখান থেকেই পুষ্পবৃষ্টি করতে ইচ্ছে করে—সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, এখানে যেন শীগগির না আসে—তার প্রতিভা অসাধারণ, সর্ব্বতোমুখী। তবে এখনও সময় আছে, স্বদেশে উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিভাটুকু যেন কাজে লাগান্।

গিরিশ। হাঁ এতবড় কবি, নাট্যকার, গল্পলেখক একাধারে জগতে বিরল।

বঙ্কিম। গিরিশ কথায় কথায় বেলা হ'য়ে গেল—এদিকে যেজন্য এসেছিলুম সে কথাই ভুলে গেছি। দেখ চিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে দেশের মুক্তির জন্য কিরূপ পাগলের ন্যায় ছুটেছে।

গিরিশ। দেখুন আমি 'মীরকাশিম' নাটকে এইরূপ নেতারই পরিকল্পনা করেছি।

বঙ্কিম। কিরূপ ?

গিরিশ। দেখুন, মীরকাশিম তো যুদ্ধে বেশী জয়লাভ কর্‌তে পারেনি—তবে 'সিরাজদ্দৌলা' লিখবার পর এ নাটকখানি লিখতে অনুরুদ্ধ হই। কিন্তু তাতে আদর্শ জননায়ক এঁকেছি,—এই চিত্তই আমার কল্পনার খাঁটি বাঙ্গালী নায়ক।

বঙ্কিম। তাইতো আজ তোমার কাছে এলাম। চিত্ত বলছে, 'বঙ্কিম ও গিরিশ প্রতিভার সেতুবন্ধন দরকার হয়ে পড়েছে'। যেমন দুঃখ-সহনশীল ত্যাগী, তেমনি স্বদেশীয়দের জন্য একান্ত দরদী। এসো গিরিশ, উভয়ে প্রাণভরে ওকে আশীর্ব্বাদ করি।

(উভয়েই চক্ষু বুজিলেন। শঙ্খঘণ্টা বাজিল, দেবকন্যাগণ মর্ত্ত্যে চিত্তরঞ্জনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

(সকলেই চক্ষু মুদিয়া রহিলেন)

গিরিশ। দেব, সবই হবে কিন্তু ভারতের লোক যে অন্নাভাবে জর্জ্জরিত, দুঃখ, ঝঞ্ঝা, অসন্তোষ, অকালমৃত্যু স্বাস্থ্যাভাব যে ভারতবাসি-গণকে আচ্ছন্ন করেছে এর উপায় কি ?

বঙ্কিম । সে সম্বন্ধেও অবিলম্বে বাঙ্গালায় আশার বাণী শুন্‌তে পাবে। এ বিষয়ে আর একদিন আলোচনা করব। আজ বড় বেলা হয়েছে, গিন্নী ব'সে আছেন। তবে একথা বলি, খাঁটি সাহিত্যের প্রসার হ'লেই বাঙ্গলা খাঁটি বাঙ্গলায় পরিণত হবে। সাহিত্যিকগণের গুরু দায়িত্বের কথা তাঁহারা কখনও যেন বিস্মৃত না হন।

(বঙ্কিমের প্রস্থানকালে সকলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন)

রবির পিছনে একটী ছায়া

[ষাট বৎসর পূর্ব্বের একটী তর্কযুদ্ধ]

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদনায় "নবজীবন" নামে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা বাহির হয়*। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' নামে প্রবন্ধ লেখেন। গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহা রচিত হয়। ইহাই পরে 'অনুশীলন' বা 'ধর্ম্মতত্ত্বে' ইহা পুস্তকাকার ধারণ করে। উক্ত 'প্রচার' পত্রখানির সূচনায় অক্ষয়-চন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী' উভয় পত্রেরই প্রশংসা করেন, তবে বঙ্কিম-চন্দ্র বলেন,—"আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই

---

* ফাল্গুন মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে (১৩৪৬) "স্বর্গধামে বঙ্কিম ও গিরিশ" প্রসঙ্গ বাহির হইবার পরে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—

"আপনি বঙ্কিমবাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে বলিয়াছেন, রবির পিছনে একটী ছায়া আছে—এইটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন।"

এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন সংবাদপত্র এবং দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মহারথীর তর্কযুদ্ধের একটী আমূল ইতিহাস বিবৃত করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অধিকাংশ কথা আমরা স্বয়ং বঙ্কিমবাবু ও রবীন্দ্রনাথের উক্তি হইতেই বলিব।—লেখক। —বঙ্গশ্রী, ১৩৪৭, বৈশাখ।

ছিলেন আদি ব্রহ্মসমাজের প্রধান স্তম্ভ। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনা করিতেন আর রাজনারায়ণ বসু ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক এবং কৈলাশচন্দ্র সিংহ সহকারী সম্পাদক।

ইহার পর 'সঞ্জীবনী'তে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়: পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান লেখক ঐ পত্রের প্রণেতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি তিনি নিজে পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ ঐ সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।"

নবজীবন-সম্পাদক সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত এই পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু 'নবজীবনের' আর একজন লেখক চুপ করিয়া থাকা উচিত বিবেচনা করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় সুহৃদ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকম দেখিয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

ইহার উত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামী পত্র বাহির হইল। নাম ছিল না বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল "র"। কাজেই লোকে বলিল পত্রখানি রবীন্দ্রবাবুর লেখা। লেখক 'ইতর' শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পাল্টাইয়া বলিলেন।

ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন।

বঙ্গদর্শন* 'সসেমিরে' অবস্থায় চলিতেছিল। ১২৯০ সালের মাঘে ইহার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবার পরেই সান্‌কীভাঙ্গা লেন হইতে (২ নম্বর ভবানীচরণ দত্তের লেন) বঙ্কিমচন্দ্র "প্রচার" মাসিকপত্র বাহির করেন। সূচনায় (১২৯১, শ্রাবণ পৃঃ ১—৬) তিনি প্রকাশ করেন :

"আমাদের এই মাসিক পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখপত্র লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিকপত্র থাকিতে আবার একখানি অমন ক্ষুদ্র পত্র কেন ? সেই কথা লিখিবার জন্যই এই সূচনাটুকু লিখিলাম।"

"একথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে বল্মীকও আছে। সমুদ্রে জাহাজেও আছে ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেই স্থানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল—প্রচার-ডিঙ্গী, এ হাঁটুজলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে "

"আমাদের বিবেচনায় সভ্যতাবৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়.....এমন কি সাময়িকপত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয় তাহা হইলে সাময়িক-পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না।....."

"সত্য, ধর্ম্ম এবং প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভপত্র প্রচার করিলাম এবং এই জন্যই ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'।"

---

* 'বঙ্গদর্শনে'র বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত ইতিহাস পাঠক মদ্‌প্রণীত 'বঙ্কিমের বিস্তৃত জীবনী"তে শীঘ্রই পাইবেন।—লেখক।

"ভরসা করি 'প্রচারে' যাহা প্রকাশিত হইবে তাহা পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত সকলেরই আলোচনীয় হইবে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতবিদ্যব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা শুনিবে, তাহা পণ্ডিতের পড়িবার, শুনিবার যোগ্য নয়। আমাদের এ বিষয়ে অনেক সংশয় আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মূর্খে তুল্য মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শুনিয়াছেন। ভিতরে সর্ব্বত্রই মনুষ্যপ্রকৃতি এক। আমরা কিঞ্চিত জ্ঞান-লাভ করিলে অজ্ঞানীকে যতটা ঘৃণা করি, বোধ হয় ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান পাতিয়া শুনিতে পারেন, আজকার দিনে এ বাঙ্গলাদেশে এমন অনেক বলিবার কথা আছে।"

"এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কেননা পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ যাঁহারা বিদ্বান্, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক তাঁহাদিগের লিখিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করা, একাজ তিনি পারিবেন এমন ভরসা আছে। আমরা মনুষ্যের নিকট সাহায্যের আশা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাঁহার নিকট মনুষ্যশ্রেষ্ঠও কীটাণুমাত্র, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাঁহার প্রসাদমাত্র এবং সকল অসিদ্ধি তাঁহার কৃত নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।"

'প্রচার' বাহির হয় 'নবজীবনের' ১৫ দিন পরে (১২৯১, ১৫ শ্রাবণ)।

বঙ্কিম বলেন, "প্রচার আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম,—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। 'প্রচারে'ও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রহ্মসমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হই।" (১২৯১, অগ্রহায়ণ পৃঃ ১৭১)।

'প্রচারে' বঙ্কিম লিখিয়াছেন,—ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শাখামাত্র। তবে ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা পরে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে।"

বোধ হয় আক্রমণের ইহাও কারণ। বিশেষতঃ বঙ্কিম-প্রদর্শিত ধর্ম্মতত্ত্ব আদি-ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের মনঃপূত হয় নাই। ১৮০৬ শকাব্দের ভাদ্রের 'তত্ত্ববোধিনী'তে "নব্য-হিন্দু সম্প্রদায়" প্রবন্ধে বঙ্কিম রচিত 'নব-জীবনে' প্রকাশিত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা করেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রেনাথ ঠাকুর মহাশয়।

বঙ্কিমবাবু বলেন, "এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। তবে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা না শুনিয়া কেবল প্রথম সংখ্যার উপরে নির্ভর করিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তথাপি আমি দোষ নিতাম না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথবাবু অকারণে আমার উপরে নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপ করিয়াছেন। তথাপি বলিব সমালোচনা আক্রমণ নহে। আর তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।"

তত্ত্ববোধিনীর এই সংখ্যায়ই আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "নূতন ধর্ম্মমত" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'নাস্তিক' 'জঘন্য কোমত মতাবলম্বী' প্রভৃতি ভাষায় বিস্তর গালাগালি দেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন প্রচার (১২৯২, অগ্রহায়ণ পৃঃ ১৭২) "এই লেখক যিনিই হন বড় উদার প্রকৃতি। তিনি উদারতাপ্রযুক্ত ইংরাজেরা যাহাকে 'ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে' (cat is out of the bag) তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়ছেন, "যে ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞানে অধিক, সত্য উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে সকলই সত্য। ব্রহ্মোপসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্ম্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিতলোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহাতে সমস্ত বঙ্গদেশে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহার পর আবার নূতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম, 'নবজীবন' ও 'প্রচারের' ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।" [তত্ত্ববোধিনী' ভাদ্র ১৮০৬ শক পৃঃ ৯১]

দেখা যাইতেছে এ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-কার্য্য তিন দিক হইতেই চলিতেছিল। অন্যদিকে আবার শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছিলেন, স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ও আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। বঙ্কিমচন্দ্রও জাতীয়তার দিক হইতে মধ্যপথ অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব সপ্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়া লেখনী ধারণ করেন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা'ও এসময়ে বাঙ্গালায় ভক্তির উৎস প্রবাহিত করে, আর এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংস সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া প্রচার করেন "যত মত, তত পথ"। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বঙ্কিমের সহিত অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচারক-গণের অনৈক্য থাকিতে পারে, আর কাহার মত শ্রেষ্ঠ, এক্ষেত্রে তাহারও আলোচনা সময়োপযোগী নাও হইতে পারে, কিন্তু একথা ঠিক যে বঙ্কিমের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা তখনকার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দিনে হিন্দুধর্ম্মের দিক দিয়া উহার পক্ষে খুবই সহায়তা করিয়াছিল।

এইতো গেল ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের কথা। অন্যান্য প্রবন্ধেও বঙ্কিমকে অল্প আক্রমণ সহ্য করিতে হয় নাই। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিম "বাঙ্গলার কলঙ্ক" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হয়। বঙ্কিম বলেন,—

"মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলম-বন্দ করেন নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীচরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা কতকটা সত্য

বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

"এ নিন্দার কোনও মূল ইতিহাসে পাই না। সত্য বটে বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন জাতি পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ নর্ম্মানের অধীন হইয়াছিল, জার্ম্মানী প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি রোমকদিগের পর আর কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা, আটশত বৎসর মুসলমানদিগের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ-শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরাজ ইতিহাস লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার মূল্য নাই; বালক মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না।"

"বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতার এবং চিরভীরুতার আমরা কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বহুবলশালী তেজস্বী বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী মুসলমানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কীওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে সে কি এই বাঙ্গালীজাতি? কিন্তু সে সকল কাহিনী অনৈতিহাসিক,

তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।”

এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রমাণিত সত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সেন ও পালবংশীয় রাজাগণের সময়ের কথা বলেন এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেন—

“বাঙ্গলা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি—”

ইহার উত্তরে স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্তর গালাগালি দিয়া প্রকৃত কথার কোন ধার না ধারিয়া ভাদ্র মাসের (১২৯১) ‘নব্য-ভারতে’ একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (২১৯—২২৬ পৃঃ) এবং অন্যান্য উক্তির মধ্যে সিংহ মশাশয় লেখেন,—

“বঙ্গদর্শন” অনন্তধামে গমন করিয়াছে। ‘নব-জীবন’ও ‘প্রচার’ তাহার স্থান অধিকারের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ‘নবজীবন’ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় ‘প্রচার’ নীরবে আপন প্রাধান্য সংস্থানের জন্য প্রয়াস পাইয়াছে। প্রথম সংখ্যা প্রচারে ‘বাঙ্গলার কলঙ্ক’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের “ভারত কলঙ্ক” এই প্রবন্ধের আদর্শস্থল, ইহা তাহারই পরিশিষ্ট।

“আমরা বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট ‘দাতাকর্ণ’ ‘গুরুদক্ষিণা’ প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। সে সকল সেই সময়ে নিতান্ত উপাদেয় বোধ হইত কিন্তু এক্ষণে আমরা আর তাহার পক্ষপাতী নহি। এক সময়ে আমরা বঙ্গদর্শনের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পক্ষপাতী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাহার অধিকাংশই অনুবাদ, অনুকরণ ও চর্ব্বিত-

চর্ব্বণ মাত্র। "বাঙ্গলার কলঙ্ক" প্রবন্ধটা কেবল বালকের নিকট কেন, ঐতিহাসিক তত্ত্বানভিজ্ঞ অনেকের নিকটেই ভাল লাগিবে। কিন্তু আমরা তাহার কতকগুলি কথার প্রতিবাদ না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।"

সিংহ মহশয় বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস পান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাল বংশীয় ও সেন বংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়···গথ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেত ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেন পাল সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত মনে করি।"

উত্তরে সিংহ মহাশয় বলেন, আমরা 'বান্ধব' ও 'ভারতী' পত্রিকায় যে সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছি, দুই চারি জন প্রধান পণ্ডিত তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন; রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি ভ্রমসঙ্কুল এবং বঙ্কিমবাবু অন্যায় ভাবে তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গলার রাজা ছিলেন। তার পর সেনবংশীয়েরা রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এক কালে এক সময়েই পাল এবং সেন বংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তারপর সেন বংশীয়েরা পাল বংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন।"

রাজেন্দ্রলাল তাঁহার "পাল ও সেনরাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে বংশাবলী প্রচার করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু অতঃপর সিংহ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "নেত্রে অঙ্গুলী প্রদানপূর্ব্বক" মিত্র মহাশয়ের মত খণ্ডন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয় সফলকাম হইতে পারেন নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমরা ১২৯১ সালের ভাদ্রের 'নব্য ভারতে' সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু যুক্তি দ্বারা মত খণ্ডন করা অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রকে গালি দেওয়াই বোধ হয় সিংহ মহাশয়ের অধিকতর উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি লজ্জার মাথা খাইয়া মুখ্যতঃ বঙ্কিমচন্দ্রকেই উল্লেখ করিয়া অসঙ্গত ভাষায় লিখিলেন—

"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর! আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর, কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্সমূলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিংবা মিয়োর ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হণ্টার প্রভৃতি কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না, স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার, 'গুরুগিরি' করিও না।"

পাঠক এই 'গুরুগিরি' কথাটির উপরে একটু লক্ষ্য করিবেন। 'বাঙ্গলার কলঙ্ক' প্রবন্ধে "গুরুগিরি"র কিছুই নাই, তাই, বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন,—

"কৈলাশ বাবু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের ভৃত্য, নায়েব কি কি ঠিক জানি না, যদি আমার ভুল হইয়া থাকে ভরসা করি ইনি

আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। অন্যান্যবার "অসৌজন্য বা অসভ্যতা" দেখি নাই, কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা বড় নায়েবি রকম হইয়া উঠিয়াছে!···আমার বলার উদ্দেশ্য নয় যে প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষায় এই বিকৃতি। ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই বলিলাম।"

[অগ্রহায়ণ, ১২৯১ 'প্রচার')

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ একটী বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেন এবং অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী'তে (১২৯১) উহাই "একটা পুরাতন কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির হয়। ফাল্গুনের 'বঙ্গশ্রী'তে আমরা এই প্রবন্ধ সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কথার মধ্যে আরও বলেন 'যেখানে সকলেই বিজ্ঞ সেখানে উপায় কি?' তাহা ছাড়া বিজ্ঞতার সময় অসময় আছে। বারোমাসের বিজ্ঞতা কেবল বাঙ্গলা দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় আর কোথাও দেখা যায় না।"

তিনি একস্থানে বলেন, 'লোকহিতের জন্য যদি মিথ্যা প্রয়োজনীয় হয়—লোকহিত তুমিই বা কি জান আমিই বা কি জানি ইত্যাদি।" এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতী'র উক্ত প্রবন্ধের উত্তর দিয়া 'প্রচারে' (অগ্রহায়ণ, ১২৯১) বলেন—

"চতুর্থ আক্রমণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালি-গালাজে বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি

গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত, এখানে প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনামন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—'অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারে না।' আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এতদূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন না রবিবাবু তরুণ বয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

"রবীন্দ্রবাবু বলেন যে আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিবার প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন।" এই সব কথা ফাল্গুন মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর 'ভারতী'র প্রবন্ধ ও 'প্রচারে' বঙ্কিমের প্রবন্ধর সারটুকু আমরা ফাল্গুনের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রদান করিয়াছি। ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথ পৌষের ভারতীতে 'কৈফিয়ৎ' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবুর প্রত্যুত্তর দেন।

'কৈফিয়ৎ' আদ্যন্ত পড়িয়া তরুণ রবীন্দ্রের যুক্তির এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়ার সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রবন্ধটী খুব ধারালো হইলেও ভাষায় বিনয়ের কোন অভাব নাই। কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও প্রবন্ধটী বেশ জোরালো। তাই প্রবন্ধ পাঠে মনে হয় উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেও তখনও ভাবের কোনও মিলন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"সত্য বলিতে মানুষে লিখিত সত্যই বুঝায়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায় না। বঙ্কিম বাবুর প্রথম প্রবন্ধটা ভাল করিয়া বুঝা যায় নাই।"—ইত্যাদি।

দ্বিতীয়,—"বঙ্কিম বাবুর মতে কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দুষ্য হইয়া গেল তাহা নহে। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। এই দুইটা চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার উপর যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটাকেই সম্পূর্ণ না হউক অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিম বাবু একটা হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জাতীয় একটি আদর্শও হইতে পারে। যে কোনও একটা চরিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।"

তখনকার রবীন্দ্রনাথের এ কথার অর্থ দুর্ব্বোধ্য; কারণ মনীষীরা বলেন যে আদর্শ চরিত্র আদর্শ চরিত্রই, তাহার মধ্যে 'কিন্তু' নাই। রবীন্দ্রনাথ আরও লেখেন,—

"লোকহিত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বঙ্কিম যে বলিয়াছেন আমি বুঝি নাই, বস্তুতঃ সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞানতা দূর করিতে পারেন নাই।"

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "বঙ্কিম বাবু যে বলেন, ভারতীতে মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি বা বাড়াবাড়ি আছে, ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। লেখার প্রসঙ্গে আমি যাহা বলিবার

বলিয়াছি, কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, আমি তাঁহাকে ভক্তি করি। তাঁহার প্রথম সন্তান 'দুর্গেশনন্দিনী' বোধ হয় আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছো-হাটের ত কথাই নাই আঁশটে গন্ধটুকু পর্য্যন্ত নাই। যেস্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে আক্ষেপ উক্তি। মেছোহাটাই বল আর প্রার্থনামন্দিরই বল, আমি কোথা হইতে ফরমাস দিয়া কথা আমদানী করি নাই। আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারি না, হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইত না। যিনি বিশ্বাস করেন করুন না করেন নাই করুন।"

অতঃপরে শ্রাবণে প্রকাশিত কথার উত্তর অগ্রহায়ণে কেন দিয়াছেন সেই কৈফিয়ত খুবই গ্রহণযোগ্য। শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে উভয়ের মধ্যে অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে "কথা হয় নাই" বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, "দুর্ব্বলতাবশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে, বঙ্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে"—ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাটা শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটা দেখিয়াছি। আমিই তাঁহার লক্ষ্য।"

"ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে, রবীন্দ্রনাথ যখন ক, খ, শিখেন নাই তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে, আমার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত

কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে, না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক মহৎস্বভাব এবং আমার প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক, যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্ত্তব্য। তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম তাহার কারণ এই 'রবির পিছনে একটা বড় ছায়া' দেখিতেছি। রবীন্দ্রবাবুর আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, উহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।"

পূর্ব্বোক্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরে আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকদের প্রতি পাছে কিছু কটাক্ষ আসিয়া পড়ে, তাই বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে ত্রুটি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—

"আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এদেশে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব এমন আশা রাখি, কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখক-দিগের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি

ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারা বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি বিবাদ বিসম্বাদে স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে তাঁহারা যেন না যান। আমি এ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখনও এরূপ প্রতিবাদ করিব এরূপ ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় অবশ্য করিবেন।" *

এ পর্য্যন্ত বলিয়াই বঙ্কিম ক্ষান্ত হন। আমরা দেখিয়াছি তিনি বলিয়াছেন—

"রবীন্দ্রবাবুর কাছে অনেক ভরসা করি এই জন্যই বলিলাম, রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং আমার প্রীতি, যত্ন এবং প্রসংশার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গলার উজ্জ্বলরত্ন, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।"

এই কথায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিন্দুমাত্র অশুভাব ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনীয়তাবশতঃ তিনি উত্তর দিতে বাধ্য হন। বঙ্কিমের কথায় কোনরূপ অসৌজন্য, রূঢ়তা বা দম্ভ প্রকটিত হয় নাই, বরং তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সুশিক্ষিত সুলেখক এবং মহৎস্বভাব প্রভৃতিই বলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়তে বিনয়ের ভিতরেও বেশ ঊষ্মতা পরিলক্ষিত

---

* ১২৯১ প্রচার, অগ্রহায়ণ।

হয়, আর মনে হয় যেন তিনি বঙ্কিমের ক্ষোভমিশ্রিত কথাগুলি তাঁহাকেই পুনরায় প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবুর লেখার ভাব এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিম বাবুর মুখামুখী উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিম বাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়াই আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্ত্তব্য বিধায় আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না, ভরসাও হয় না। যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিম বাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণ মাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সকলের প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। .....তার পর গালিগালাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয় নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিম বাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই।

বিশেষতঃ "নব্যহিন্দু সম্প্রদায়" নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিম বাবুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কৈলাশ বাবুর প্রবন্ধের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের কোন যোগই থাকিত পারে না।···আমি যদি বলি বঙ্কিম বাবু 'নবজীবনে' অথবা 'প্রচারে' যে সকল প্রবন্ধ লেখেন তাহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের সহিত সবিশেষ যোগ আছে তবে সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোন গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি যে লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্ম সমাজের হইয়া লিখি নাই।

"বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর, সংক্ষিপ্ত ও তির্য্যক্ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত আহত হইব, আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকট বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনও তাহার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিমবাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের গৌরবের স্থান, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন, সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী-দ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সমাজ-প্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু হৃদয় বিসর্জ্জন দেন নাই; এজন্য চারিদিক হইতে ঝঞ্ঝা

আসিয়া তাহার শিখরদেশ আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু কখনও তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় নাই·····আজি সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

"বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি বয়সের ও প্রতিভার উদারতা গুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে করিবেন। আমার সবিশেষ নিবেদন এই যে আমি সরলভাবে যে সকল বলিয়াছি আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্যভাব গ্রহণ না করেন।"*

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কিছু লিখিয়া উত্তর দিতে পারিলেও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি নীরব থাকেন এবং কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লেখেন যে, উভয়েরই মধ্যে প্রীতিবন্ধন যেন এই সব সাময়িক বাদপ্রতিবাদে সামান্যরূপেও ক্ষুণ্ণ না হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পত্রখানির অস্তিত্ব আর এখন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি"তে এই তর্কযুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রচার পত্রে যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই। আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া

---

* ভারতী পৌষ, ১২৯১ পৃঃ ৪০০-৪০৮

বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখন এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার কতক পরিচয় আছে। তাহার কতকটা ব্যঙ্গ-কাব্যে, কতকটা কৌতুকনাট্যে, কতকটা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্রাকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

"সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার 'ভারতী' ও 'প্রচার'এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিম বাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতেন বঙ্কিম বাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত সেই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই এ বিষয়ে কি বাস্তবিকই উভয়ের পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল? পুনর্ম্মিলন আর বেশী কি হইবে; বঙ্কিম তো রবীন্দ্রনাথের উপর বীতশ্রদ্ধ হন নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভাবী সাহিত্যনেতা মনে করিয়া তাঁহার গলে বরাবরই জয়মাল্য পরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের উৎসাহ ও সমাদর বাক্য সাহিত্য-পথ-যাত্রায় মহামূল্য পাথেয় স্বরূপই মনে করিতেন, অধিকন্তু বঙ্কিমের মহাপ্রস্থানের পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া শোকসভায় যে বক্তৃতা দেন তাহা সত্যই শ্রদ্ধা-ভক্তি পরিপূর্ণ। তিনি এখানে বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তককে "সব্যসাচী"র সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

১২৯১ (১৮৮৪) সালের ঐ বাদানুবাদের পরে দশ বৎসর অতীত হইবার পরে ঐ শোকসভায় তাঁহার বক্তৃতা পঠিত হয়। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে রবীন্দ্রের লেখনী প্রসূত ব্যঙ্গকাব্যে, কৌতুকনাট্যে, 'সঞ্জীবনী' কাগজে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ যে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমরা ইতিহাসের খাতিরে তাহার একটু পরিচয় দিব।

দেখিতেছি, শোকসভায়ও রবীন্দ্রাথ বঙ্কিমের গুরুগিরির সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিতে বিরত হন নাই, অবশ্য এই ইঙ্গিত খুবই সতর্ক এবং ইহার অর্থ অন্যভাবেও লওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—

'যে বন্যার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে সেই বন্যার আকর্ষণে তাহাকে সর্ব্বদা সংযত করিতে হইলে বঙ্কিমের এই ক্ষমতা-সামঞ্জস্য ছিল। সেই জন্য মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ-পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন বঙ্গসাহিত্যের বড় আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না।

……যুক্তিবিচারকে প্রাধান্য না দিয়া বঙ্কিম যদি নিজেই গুরু সাজিয়া দাঁড়াইতেন, অনুসন্ধান দ্বারা সত্যের দিকে পথ নির্দ্দেশ না করিয়া যদি তিনি নিজেকেই ধ্রুবতারা বলিয়া প্রচার করিতেন, দেশের লোকের মনের গতি বুঝিয়া তিনি যদি অন্ধবিশ্বাস এবং অলৌকিকবাদকে আপন পক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন তবে এই দেবানুগৃহীত বঙ্গদেশে অনায়াসেই তিনি একজন নূতন অবতার হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন, তবে তাঁহার উন্মত্ত শিষ্যগণ এমন নিবিড় ব্যূহ রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া

থাকিত যে, আমরা সাহিত্য-ভক্তগণ আর সহজে আমাদের গুরুর সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতাম না।" *

"বাঙ্গালীর কলঙ্ক"এর প্রতিবাদ করিতে বসিয়া কৈলাশবাবুও বঙ্কিমচন্দ্রকে "গুরুগিরি" করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি রবীন্দ্রনাথ তখন কৈলাশবাবুর একটি কথারও প্রতিবাদ করেন নাই। এবারে আবার রবীন্দ্রনাথও গুরু-শিষ্যর কথার অবতারণা করিলেন। উভয়ের উক্তিতে কোন সংস্রব না থাকাই সম্ভব, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিম মণ্ডলের অন্যতম গ্রহ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত যে রবীন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ হয়, তাহাতেও 'গুরুগিরি'র কথা আসিয়া পড়ে কেন? চন্দ্রনাথ গুরু-শিষ্যের কথার অবতারণা করেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রই 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা'য় করিয়াছিলেন। তবে বঙ্কিমের দোষ ছিল যে, চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার সংযত যুক্তিতে বঙ্কিমকে দুই একটি বিষয়ে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। সমগ্র কাহিনীটী এখানে বিবৃত করিতেছি।

চন্দ্রনাথবাবু 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'আহার' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখেন (সাহিত্য, ১২৯৭)। ইহার উত্তরে 'সাধনা'য় (১২৯৮ সালের পৌষে) রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—

"গুরুর ভঙ্গিতে কথা বলা একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গ-সাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের আপমান করা হয় কারণ সত্য কোন লেখকের নামে বিকাইতে চাহে না। আপনার যুক্তি দ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ্য মাত্র।

---

* পৃঃ ৫৭ সাধনা বৈশাখ ১৩০১

"একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্ব-সাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্য স্বরূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনও হাস্যকর, কখনও উৎপাতজনক।"

পাঠক লক্ষ্য করিবেন 'গুরুর ভঙ্গীতে', 'গুরুর গৌরবধারণ' ইত্যাদি কথার প্রতি। যাহা হউক, অতঃপর ১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠে চন্দ্রনাথ বসু 'লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথও ইহার প্রতিবাদ করেন। চন্দ্রনাথ বসু শ্রাবণের 'সাহিত্যে' "আমার স্বরচিত লয়তত্ত্ব" সম্বন্ধে আবার একটি দার্শনিক প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ভাদ্রের 'সাহিত্যে' ইহার প্রতিবাদ করেন। উভয়ের প্রবন্ধই বিজ্ঞতাপ্রসূত। ঠিক এই সময়ে ১২৯৯ শ্রাবণের 'সাধনা'য় (১৯৩ পৃঃ) 'হিং টিং ছট্' রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে ক্ষীণ খর্ব্ব দেহ
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়,
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।

সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে কি লয়ে বিচার
শুনিয়ে বলিতে পারি কথা দুই চার
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্ পালট্।”

অনেকেই অনুমান করেন ইহা চন্দ্রনাথবাবুর উদ্দেশ্যেই রচিত। ‘সাহিত্য’ পত্রে এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যেই সমালোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, উহা চন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে। চন্দ্রবাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া তাঁহার পক্ষে গৌরব। *

রবীন্দ্রনাথকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। তবে ‘গুরুমারা চেলা’, ‘কি লয়ে বিচার’, ‘ব্যাখায় করিতে পারি উলট্ পালট্’ প্রভৃতি কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদি এই কৌতুকের নায়ক চন্দ্রনাথ বসু না হয়েন—তবে কে? আর এই কবিতাটিই কি রবীন্দ্র উল্লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে ব্যঙ্গকাব্য? বস্তুতঃ গুরুগিরি, গুরুগৌরব, গুরুশিষ্য, গুরুর ভঙ্গী প্রভৃতি কথার ছড়াছড়িতে বড়ই বিস্ময় আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ ‘যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলায়’ কৈলাশবাবুর প্রতিধ্বনি আসিয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “জীবনস্মৃতি”তে যেমন অনেকটা স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, জীবদ্দশায় এই সমস্ত কথার মীমাংসা করিয়া গেলে সাধারণের সংশয় দূর হইবে। শুনিতে পাই তিনি এখন পুরাতন রচনাগুলি উদ্ধার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। সমস্ত কথা উদ্ঘাটিত হইলে সকলেরই সংশয় দূর হয়। রবীন্দ্রনাথ ও উক্ত নিয়োজিত

---

* সাধনা ১২৯৯—চৈত্র ৪৫৪।

ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন কি ? বঙ্কিম-রবীন্দ্র মিলন যে ১৮৯৩ সালে জেনারেল এসেম্‌বলি ইনষ্টিটিউসনের সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সময়ে বা কিছু পুর্ব্বেই হইয়াছিল তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। কিন্তু তাহার ৮ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাবলী জানিবার বাসনা সকলেরই প্রবল হইয়া উটিয়াছে। সমস্ত বিষয়টা রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। আমাদের আশা কি পূর্ণ হইবে ?

গিরিশ ও চিত্তরঞ্জন

১৯২৪ সালে গিরিশ-স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মনোমোহন থিয়েটারে সভাপতির আসন হইতে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমরা তাহা পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি ঃ

"তিন বৎসর পূর্ব্বে ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে স্বরাজ-ছাড়া কোন কথা বলিব না, স্বরাজের কার্য্য ছাড়া কোন কার্য্য করিব না, স্বরাজের চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা করিব না, স্বরাজের সভা ছাড়া অন্য কোন সভায় যোগদান করিব না। তবে আজ কেন এই সভায় যোগদান করিলাম ? ইহার উত্তর, স্বরাজ কাহাকে বলে ? স্ব-রাজ নিজের মূর্ত্তি যাহাতে বিকাশ পায় তাহাই স্বরাজ। গিরিশের কথায় তাঁহার রচনার মধ্যে, তাঁহার কার্য্যে ও অভিনয়ে স্বরাজের কথা পাই, স্বরাজের আভাষ পাই, তাই আমি এই সভায় আজ সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমার সম্পাদিত 'নারায়ণ' মাসিক পত্রে একটি স্তব লিখিয়াছিলাম—'হে ভগবান তুমিই এক এবং তুমিই বহু ; তোমাকে নহিলে আমাদের চলে না, আবার আমাদের নহিলেও তোমার চলে না।' গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন ? যে কবিতায় ধর্ম্ম নাই—সে কবি অধিক দিন বাঁচে না। মহাকবি বলি কাহাকে ? যাঁহার রচনায়,

যাঁহার কবিতায়,যাঁহার সঙ্গীতে জাতীয়তা আছে, ধর্ম্ম আছে, মুক্তির সন্ধান আছে, তাঁহাকেই বলি—মহাকবি । ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে আমার আস্থা নাই । কলা—কলাই, ইহার অপর মহৎ উদ্দেশ্য নাই এই যাহাদের অভিমত—তাঁহার ঘোর জড়বাদী । ভারতবর্ষের কালচার সম্বন্ধে তাঁহাদের বলিবার অধিকার নাই । ধর্ম্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য । যিনি একের সহিত অপরের পার্থক্য করেন, তিনি উভয় দিকই হারাইয়া ফেলেন । এই অচ্ছেদ্যতার সন্ধানই গিরিশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য ।

চণ্ডীদাস হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত আমি আমার 'নারায়ণ' পত্রে দেখাইয়াছি, কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান ও পতন হইয়াছে । চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এইভাব বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল । তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা আবার জাগিয়া উঠে—আবার গিরিশচন্দ্রে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল । গিরিশবাবুর কবিতায়, গানে আমরা জাতীয়তা পাই, প্রাণ পাই, দেশের একটা স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাই । ইহাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য । তাঁহার কবিতা যাচাই করিতে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড জার্ম্মানীতে যাইতে হইবে না । তাঁহার কবিতায় বিলাতী ভাব নাই, বিজাতীয়তা নাই, ভাব ধার করিতে তাঁহাকে বিদেশে যাইতে হয় নাই । গিরিশচন্দ্র খাঁটি দেশী কবি । তিনি দেশী ভাবে খাঁটি বাঙ্গালীর মত দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন । দেশের প্রাণের কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এই জন্যই তিনি মহাকবি—দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি । এমন দিন আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে, যেদিন সমস্ত জগৎ ভারতের দ্বারে আসিয়া নতজানু হইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ন্যায় ভারতের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য নাটক

আলোচনা করিবেন ; আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবেন—আর তখনই গিরিশচন্দ্র স্বরূপ মূর্ত্তিতে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন এবং তাঁহারাই গিরিশের প্রকৃত পরিচয় পাইবেন, বুঝিতে পারিবেন গিরিশ কত বড়, কত মহৎ, কত দেশহিতৈষী। বন্দেমাতরম্।"

জাতি-ধর্ম্ম-সমন্বয়ে গিরিশচন্দ্র

বাঙ্গালা দেশে—তথা ভারতবর্ষে একজাতীয়ত্ব কি সম্ভব? অনেকেই মনে করেন, তাহা সম্ভব নয়। বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। তাহাদের ঐক্য একেবারেই সম্ভব নয়। আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষও এই অজুহাতেই ভারতীয়গণকে স্বাধীনতা প্রদানে পরাঙ্মুখ। তাহাদের কথা বিশ্বাস করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক দিনের কামনা "এক জাতীয়ত্ব কৈ? ঐক্য কৈ? মনুষ্যত্ব কৈ?" —আমাদিগকে অসম্ভব প্রলাপ বলিয়াই উড়াইয়া দিতে হইবে।

কিন্তু সত্যই কি তাই? তবে কি সাহিত্য সম্রাটের স্বপ্ন সফল হইবে না? তবে কি তিনি কেবল একা রোদন করিয়াই গিয়াছেন? আমরা বলি তাহা নয়। একজাতীয়ত্ব হইবে, ঐক্য আসিবে, মনুষ্যত্ব বাড়িবে, আবার আমরা সুসন্তান হইব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, মায়ের মুখ রাখিতে পারিব।

পারিব কি? কিরূপে পারিব? এ প্রশ্নের উত্তর নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র দিয়াছেন এই প্রবন্ধে আমরা সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিব। "মায়াবসান" নাটকে গিরিশচন্দ্র বলেন "ভারতে রিলিজিয়াস ইউনিটি সম্ভব নয়"। ইহার অর্থ কি? ইহার উত্তর রামকৃষ্ণদেব দিয়াছেন, বিবেকানন্দ দিয়াছেন, এবং গিরিশচন্দ্রের রচনায়ও সেই মহাভাবই

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা দুই প্রকারে সম্ভব। এক ধর্ম্মের ঐক্য, আর এক জাতির ঐক্যে।

(১) ধর্ম্মের ঐক্য। ভারতে নানাজাতি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান। সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্মে অপরের নরক ব্যবস্থা। কিন্তু কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত (যদি তিনি নাস্তিক না হন) সকলেই ঈশ্বর 'এক' বলিয়া মনে করেন। এইখানেই ঐক্যের ভিত্তি। যিনি যেই ধর্ম্ম ইচ্ছা অনুসরণ করিতে পারেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি এক, তিনিই বহুতে প্রকাশিত, এই ভাব যেন কাহারও মন হইতে অপসারিত না হয়। সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক, এই এক জ্ঞানেই ঐক্য সম্ভব। ইহাই রামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ"—ইহাই গিরিশ-চন্দ্রেরও রিলিজিয়াস-ইউনিটি। তাই তিনি বলেন—

"যথা জল, এককোয়া, ওয়াটার, পাণি
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড,
ঈশ্বর, যিহোবা, যিশু নামে নানাস্থানে
নানাজনে ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান লক্ষণ, ভেদবুদ্ধি কয় দূর,
বহুনাম প্রতিনাম সর্ব্বশক্তিমান—
যার যেই নামে প্রীতি ভক্তির উদয়,
প্রফুল্ল হৃদয়, যেই নামে মনস্কাম
পূর্ণ, সেই জন, সেই নাম উচ্চারণে—

তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও বৌদ্ধ বা খৃষ্টান হও যেই নামে তোমার

মনস্কাম পূর্ণ হয়, সেই নামে তাঁহাকে ডাকিও, কিন্তু ভেদজ্ঞান রাখিও না। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান,—তোমার ভাই। কাহাকেও ঘৃণা করিবার অধিকার তোমার নাই। এই ধর্ম্মের ঐক্যেই জাতীয়-ঐক্যের সম্ভাবনা অন্য কোন ভাবে ঐক্যের সম্ভাবনা নাই। আর ইহারই অর্থ রিলিজিয়াস ইউনিটি।

এই ভাবেই আমরা "বিল্বমঙ্গল নাটকে"ও দেখিতে পাই। "কালাপাহাড়ে"ও এই ভাবই পরিস্ফুট—

"এক বিভু বহুনামে ডাকে বহুজনে
মূঢ় জনে ভেদজ্ঞানে দ্বন্দ্বে পরস্পরে"

দ্বিতীয় ভাবে ঐক্য সম্ভব সেবাধর্ম্মে। তুমি হিন্দু, বেশ খুব ভাল। কিন্তু নরসেবা "একমাত্র ধর্ম্ম তুমি করো। এইখানে গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ প্রবন্ধে বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—

"নর-সেবা তোমার একমাত্র ব্রত করো। এই সেবা ধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত তিনি নরসেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবেনা এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়? এই সেবাধর্ম্ম অবলম্বনই ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। এই ভিত্তির

উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তিনি মনুষ্য; ব্রহ্ম তাহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবাদ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। ইহা যে কঠিন পন্থা নয়, আজ অসংখ্য সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও বিবেকানন্দ মিশন তাহার সাক্ষ্য দিবে।"

এই দুই ভাবেই ঐক্য সম্ভব, এক জাতীয়ত্ব সম্ভব, মনুষ্যত্ব সম্ভব। সুতরাং ভারতে উন্নতিও সম্ভব। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" তাই গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন—

যতদিন কামিনী কাঞ্চন
হিন্দুগণ করিয়ে বর্জ্জন
না করিবে দীন ভ্রাতৃসেবা,
ততদিন কামিনী-কাঞ্চন-সঞ্চালিত
স্বার্থপর বর্ব্বর নিকর
রবে সবে পরাধীন বিধর্ম্মী কিঙ্কর

—"সৎনাম"

এই ভাবই গিরিশচন্দ্র 'ভ্রান্তি' নাটকেও বিষদরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। নাটকের রঙ্গলাল এইরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া একাধারে হিন্দু মুসলমান—সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিব।

রঙ্গলালের দৃঢ় বিশ্বাস, জীব সেবাই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, তাই তিনি কোন পূজা, যাগ, তপ, নিষ্ঠার ধার ধারেন না। তাই তিনি বলেন—

"আমি অমন অন্ধকারে তীরন্দাজী করি না। আমার দেবতা প্রত্যক্ষ। মানুষ আমার দেবতা, যারে হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান বলে ভগবানের অংশ। আমার দেবতা প্রাণময় পুরুষ। যার সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা ক'রতে হয়না যে ভাল করেছি কি মন্দ করেছি। যে দেবতাপূজায় কোন শাস্ত্রে নিন্দা নাই, তর্ক বিতর্ক নাই। একবার মানুষের সেবা ক'রে দেখ, প্রাণ তর্ হয়ে যাবে। আমার দেবতার পূজা যদি কর, তাহ'লে মনে ক'রবে টাকা রোজগার করেছ সার্থক, ঠিকঠাক দেবতার পূজায় লেগেছ।" যারা মুখে বলেন "মা ব্রহ্মময়ী তুমি সর্ব্বভূতে আছ।" অথচ জীবজন্তু দূরে থাকুক, মানুষের বুকেই ছুরী দেন রঙ্গলাল সেরূপ মায়ের পূজা করেন না। তিনি মার কাছে প্রার্থনা করেন "যেন দু একটা ভুকো মানুষকে ভাত দিতে পারি, যে শীতে কাঁপছে তাকে একখানা কম্বল দিতে পারি, তা হলেই আমি চরিতার্থ হবো।" স্বর্গ কি ? এ সম্বন্ধেও রঙ্গালাল গঙ্গাকে বলিতেছে—

"দ্যাখ গঙ্গা একদিন একজনকে খুব ক্ষিদে পেয়েছে, চারটি খেতে দিও, খুব 'তেষ্টা' পেয়েছে, একটু জল দিও, খেয়ে ব্যাটারা আঃ করবে, শুনে তোমার যে সুখ হবে, কোন ব্যাটার চৌদ্দপুরুষের কল্পনায় স্বর্গসৃষ্টি করতে পারে না।" এই পরসেবাই প্রকৃত মনীষীগণ সারধর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিতেন 'জীব শিব'—বিবেকানন্দ কুলী-মজুর প্রভৃতি অস্পৃশ্যদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া বলিতেন "তোরা যে নারায়ণ আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও লোকসেবাকে দরিদ্রনারায়ণ সেবা জানিয়া জনসেবায় নিরত হইয়াছিলেন। এই লোক সেবাই আজ আমাদের প্রধান ধর্ম্ম হউক। এই লোকধর্ম্ম শিখিলেই আমরা বলিতে পারিব, আমরা আগে ভারতবাসী, তারপর হিন্দু বা মুসলমান। পরস্পর জনসেবায়ই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গিরিশচন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহাসত্য আবৃত্তি করিয়া আজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। দেশবাসীও গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করুন, তাহা ঐকান্তিক মনে প্রার্থনা করিতেছি।

নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিতেন "সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র এতদুভয়ের প্রতিভার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।" আজ গিরিশের শত বার্ষিকী উপলক্ষে আমিও দেশবাসীকে এই মহাকার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আজ বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' জাতির মহামন্ত্র। প্রথমে যখন সঙ্গীতটি প্রচারিত হয়, এই মন্ত্রের অর্থ কিন্তু দেশবাসী তখন বোঝেন নাই, সাহিত্যিকগণও উহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এমন কি কবিবর নবীনচন্দ্র, সাহিত্য রথী, বঙ্কিম সহোদর ঔপন্যাসিক সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইহার ভবিষ্য প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ একমাত্র গিরিশচন্দ্রই তখন মন্ত্রের শক্তি বুঝিয়া বজ্রনির্ঘোষ স্বরে বলিয়াছিলেন "মাতৃমন্ত্র কেবল ইউরোপেই ফলপ্রদ এমত নহে, বিপদ দীক্ষিত আকবর রাণাপ্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন। রাণা একজন মাতৃ উপাসক। ইতিহাসে শুনিতে পাই তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয় অধিক গৌরব মণ্ডিত। যখন সমস্ত রাজপুতরা আকবরের সিংহাসনতলে যুগল করে দণ্ডায়মান আরাবলী পর্ব্বত রাণার সিংহনাদ শুনিতেছে দুর্জ্জয় মুসলমান শক্তি সুরক্ষিত দুর্গ সকল একে একে রাণার পদানত হইতেছে, সভয়ে আকবর সন্ধির প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা কেবল মাতৃ মন্ত্রেরই ফল। শতদ্রু সলিল

বিশ্ব কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল পাণ্ডুগণ্ড ইংরাজ শুনিল, দেখিতেছি এ মন্ত্র হীন ভারতবর্ষেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। তবে কি নিমিত্ত আপনাকে হীন বিবেচনা করি? সিদ্ধমন্ত্র রহিয়াছে, হায় গ্রহণ করিবার কি কেহই নাই?"

আজীবন গিরিশ এই মাতৃমন্ত্রের সাধনা করিয়া গিয়াছিলেন। এই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই রাণা চণ্ড উল্লসিত কণ্ঠে বলেন—

"স্বর্গোপম গরীয়সী মম জন্মভূমি
পিতৃ পিতামহ দেবালয়, এবে
তথা বিহরে রাঠোর—"

এ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই প্রবীর কৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মুখীন হইতেও নির্ভয় হৃদয়—

"মাতৃনাম অক্ষয় কবচ আমার
কার সাধ্য রোধে মোরে"

এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই "সৎনামের" সোহিনী তেজোদীপ্তা

"যাগ যজ্ঞ তপজপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভূমি পূজা সম"

এ মন্ত্রেই 'সৎনামে'র বৈষ্ণবী এত শক্তিশালিনী—

"জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের হেতু"

আর এই জন্যই রঙ্গলাল মৃত্যু ভয়হীন অপার শক্তিমান। আবার এই শক্তিতেই সিরাজদ্দৌলা ও মিরকাশিম অপরিমেয় দেশভক্ত।

আজ অনেকে গিরিশচন্দ্রকে সেক্সপীয়রের সহিত তুলনা করিতে

চাহেন, আমার মতে এ তুলনা অপ্রাসঙ্গিক। কেননা বিজাতীয় আদর্শে আমাদিগকে গিরিশচন্দ্রের তারা জহরা জোবি হরমণি, পাগল, মন্মথ, করুণাময়, যোগেশ প্রভৃতি চরিত্রের রসাস্বাদ করিতে উৎসাহ দিতে পারে না। যে দেশভক্তি বা মাতৃমন্ত্রের কথা বলিলাম তাহা সেক্সপীয়রে প্রভূত পরিমাণে ছিল England shall never lie at the froud feet of the Conquerer, "ইংলণ্ড দেশ উদ্ধত বিজয়ীর কখনও পদানত হইবে না" এই মহাবাণী আজও ইংরাজের প্রাণে অপরিমিত শক্তি সঞ্চারিত করে। এরূপ দেশভক্তি গিরিশ সাহিত্যে বেশী কি কম আছে, তাহা বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের যাহা আছে সেক্সপিয়রে তাহা নাই। মনীষী, মনস্বী, পুঙ্খানুপুঙ্খ-তত্ত্ব-বিচারশীল হ্যামলেটের ও পিতার প্রেতাত্মা দর্শনে সংশয়ই উদয় হইয়াছিল—

"অজানিত দেশ পান্থ নাহি ফিরে যথা হতে"

কিন্তু পরলোক বিশ্বাস, হিন্দুর মজ্জাগত। ইহলোক সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জাতির সকল কর্ম্মের মূলে নীতি ও পুরষকার। আর আমাদের সকল কর্ম্মের মূলে ঈশ্বর বিশ্বাস, ভগবৎ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। হিন্দুর এই প্রকৃষ্ট জাতীয় আলোচনায় পাশ্চাত্য সেক্সপীয়র মূক, কিন্তু হিন্দু গিরিশ মুখর। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যেই। প্রাচ্য গিরিশ ও পাশ্চাত্য সেক্সপিয়রের পার্থক্য বুঝাইয়া দিবে। এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যেই গিরিশের বিশ্বামিত্র বলিতে পারেন---

"আকাঙ্ক্ষা আমার নহেক সম্পূরণ
আকাঙ্ক্ষা আমার নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানবে
নাহি জাতির বিচার

লভে নর উচ্চপদ তপোবলে
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে
প্রভাবে যাহার ঘুচে নীচ সংস্কার
জন্মে আত্মবোধ
ঘুচে তার জনম মরণ ভ্রম
উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে
লভে নর উচ্চপদ "তপোবলে"।

গিরিশের এ সাধনা আমাদিগকে আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত করুক, সর্ব্ব বিষয়ে জাতি আমাদের জাতি উন্নত হউক, জাতির আত্মবোধ জন্মুক, ইহাই আজ ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জনা ও বর্ত্তমান মহাসমর

ইউরোপের মহাসমরই বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। এই যুদ্ধে যে কত লোকক্ষয় হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যুদ্ধে কে জিতে, কে হারে ইহা বলা কঠিন।

হের হিটলারের ধ্বংস-নীতি কেহই সমর্থন করিতে পারে না, ইহাতে সমগ্র জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু হের হিটলার যে জার্ম্মান নারীগণকে যুদ্ধাদি পুরুষের কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া রন্ধন-শালায় ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই ভাবিবার বিষয়। রন্ধন কার্য্য ভারতীয় মহিলাগণের প্রধান পবিত্র কার্য্যরূপে পরিগণিত ছিল, কিন্তু সময় চক্রে আজ উহা পশ্চিম প্রদেশীয় ও উৎকল নিবাসী পাচকের উপরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। ফলে, ইহাতেও অস্বাস্থ্য ও অকাল-মৃত্যু ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ডিস্‌পেপসিয়া বা থাইসিসের রোগীর পক্ষে জাতির উন্নতিকল্পে কিছু করা দূরে থাকুক, প্রাণধারণই বিড়ম্বনা মাত্র।

হের হিটলার নারীজাতিকে যুদ্ধে পাঠাইতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু নারী-জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধ সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে তিনি সতত যত্নবান। ঘরে ঘরে মহিলারা স্বামীপুত্রকে দেশ রক্ষায় ও দেশে প্রাধান্য বিস্তারে উদ্বুদ্ধ করে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করে এবং কথায় ও কার্য্যে সর্ব্বদা তাহাদের প্রাণে আশা ও উৎসাহ জাগরিত করিয়া দেয়। জার্ম্মানরা জীবনাহবে পতঙ্গের ন্যায় অবলীলাক্রমে যে অন্তিম

বহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, তাহার মূলেও ঐ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। আর এই উদ্বোধন ও অনুপ্রেরণার জন্য জার্ম্মান দেশে একটী নারী-সঙ্ঘও আছে। তাহাদের কাজ যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণের অপেক্ষা কম দায়িত্ব-পূর্ণ নয় এই সঙ্ঘের নেতৃত্ব যিনি করেন তাঁহাকে লোকে ম্যাডেম ফুয়েরার বলিয়া থাকে। তাঁহার নাম "Frau Klink"। শুনিতে পাই তাঁহার নেতৃত্বাধীনে নাকি পাঁচ কোটি স্ত্রীলোক পরিচালিত হইতেছেন। প্রফেসার Peter Eangleman বলেন, "Frau Klink rules the lives of women in all things great and small. She tells women what they shall cook and how, what must be work and how what they shall say, laughing to their husbands and sons, marching to war. How they shall behave smiling when their men are killed. Hers is the responsiblity for the Home spirit, the very core of national morale.

Vide "Hindusthan Standard" July, 13, 1941.

বস্তুতঃ কোন দেশ বা জাতিই মাতৃশক্তির উদ্বোধন ব্যতীত এত বেপরোয়াভাবে মৃত্যু উপেক্ষা করিতে পারে না। সর্ব্বত্র মাতৃশক্তির উদ্বোধনেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, জাতির প্রাধান্য, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। জর্জ্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, অলিভিয়ার ক্রমওয়েল সকলেই মাতৃশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ভারতীয় কবিগণের লেখনীতেও মাতৃত্ব খুবই বিকাশ লাভ করিত। যশোদা ও সুভদ্রা, কুন্তী ও সুমিত্রা, সীতা ও

কৌশল্যা সকলে ছিলেন গরীয়সী মাতা। ইঁহাদের মাতৃশক্তি তাঁহাদের পুত্রগণকে যে শত্রু দমনকল্পে খুবই প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আধুনিক যুগে মহাকবি গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক জনা ও সুভদ্রা চরিত্রে যেরূপ মাতৃশক্তি প্রতিভাত করিয়াছেন অন্য কোন কবি বা লেখক তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

গিরিশচন্দ্র "অভিমন্যু বধে"ই এই মাতৃত্বের প্রথম আভাস দিয়াছেন। শিব-মন্দিরে সুভদ্রা ও অভিমন্যু পত্নী উত্তরা পূজার্থ গিয়াছেন, কেননা অভিমন্যু সমরে যাইতেছেন, যেন তিনি জয়ী হইয়া আসেন। কিন্তু উত্তরার অর্ঘ্য ভোলানাথের তুষ্টি সাধন করিতে পারিল না, উত্তরা কাঁদিয়া বলিলেন—

হা জননি!
পড়িল প্রমাদ হেথা,
দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল;
ভাঙ্গিল কি কপাল আমার।
আশুতোষ কি হেতু করিল রোষ
না জানি গো সতি!

সুভদ্রা—পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ অর্ঘ্য ঈরে।

উত্তরা—মাগো ভূতনাথে করিতে অর্চ্চনা,
প্রাণনাথে পড়ে মনে;
ঢালি জল ভাসি আঁখি-জলে!

দারুণ ক্ষত্রিয়-পণ,
যুদ্ধ নামে উন্মত্ত প্রাণেশ !
মাগো।
নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি আর।

সুভদ্রা—কর পুনঃ শিব আরাধনা ;
নহে বীরাঙ্গণা-রীতি
বীরকার্য্যে দিতে বাধা।
কুলকার্য্যে রহ কুলবতী ?

উত্তরা—বৃথা গঞ্জ গুণবতী মোরে ;
কিশোরে গো কে যায় সমরে—
ক্রীড়াস্থল ত্যজি ?

সুভদ্রা—জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয় নিয়ম,
শঙ্কট মরণ রণ-অঙ্গ-আভরণ ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতি-পুত্র যায় রণে
বীরাঙ্গণা সাজায় সমর-সাজে ;
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী,
সারথী হইয়ে রথে,
কাটে বেনী নিনাইতে গুণ।
কাঁদায়ে সন্তানে
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।
বাল্যাবধি জানি রণ-নীতি

যাদব-ঝিয়ারী পাণ্ডুবংশ-কুলবধূ।
ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল-রীতি স্মরি ;
মমতা ছেদিতে
শিখে মা ক্ষত্রিয় সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।

তবে মাতৃত্বের অভিব্যক্তি, জনা চরিত্রেই পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। অজেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথমে জনা বালক-পুত্র প্রবীরকে সম্মতি দেন পাই। তিনি বলিতেছেন—

বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি—
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমনি।

প্রবীর যতই বলিতেছেন—

মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে
সম্মুখ সমরে বিমুখ কে করে মোরে।

জনার ততই কেবল পুত্রের অকল্যাণ ভাবনায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। কিন্তু প্রবীর যখন মাতাকে বলিলেন যে, 'কাপুরুষ' অপবাদে তিনি প্রাণ রাখিবেন না, আর মাকে অনুযোগ করিলেন—

কে কোথায় ক্ষত্রিয় রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখে ?

অমনিই বীরজননী জনার হৃদয়ে মাতৃত্ব আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি পুত্রের হইয়া স্বামীর সঙ্গে বহু তর্ক করিলেন—অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—

"পুত্রবর চায় রণে যেতে
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে
মন্দ যদি তায় কভু হয় নরনাথ
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত ;
প্রফুল্ল নয়নে
নন্দনে হেরিব রণস্থলে ;
বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব
তুমিও না নিবার রাজন।"

কিন্তু রাজ্যের রাজা কিছুতেই শত্রুর সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক নহেন। কৃষ্ণার্জ্জুনের বিরুদ্ধে পুত্রকে অভিযান করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না—অধিকন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া যখন বলিলেন—

"রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গণা
যাও রণে নন্দনে লইয়ে
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।"

তখন জনা দৃপ্ত স্বরে উত্তর করিলেন—

"দেহ আজ্ঞা—যাব রণে নন্দন লইয়ে
আজ্ঞা মাত্র চাই ;
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।"

তখন তাঁহার কেবল জপ হইল "রণ, রণ, রণ," কিন্তু সম্মুখে বধূপুত্র নন্দনমঞ্জরীকে জনা তাহাকেও বীরজায়ার কঠোর কর্ত্তব্য বুঝাইয়া বলিলেন—

ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ
জয় পরাজয়
যুদ্ধে নাহিক নিয়ম
যদি শুনে থাক পাণ্ডব কাহিনী
দ্রুপদ নন্দিনী এলাইল বেণী
স্বামীগণে সমরে উৎসাহ দিতে।
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়ে
রন্ধন-শালায় পশি
ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে
শত ভাই কীচক নিধন তাহে।
উত্তর-গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রাজজয়ী ভীষ্মদেব সনে

পাঠাইল বীরাঙ্গণা ;
বীর-পত্নী নিরুৎসাহ ক'রনা পতিরে
বীর কার্য্যে ব্রতী তব পতি
নিজ কার্য্যে রহ গুণবতী।
ত্যজি ভয়, ক্ষত্রিয় তনয়া
উচ্চ কার্য্যে স্বামীকে উৎসাহ কর দান।

কিন্তু মদন মঞ্জুরী কোন রকমেই প্রবোধ মানিল না দেখিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে জনা বলেন—

"এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ কুল হ'তে ?
যুদ্ধ-কার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে সদা অমঙ্গল আশাঙ্কা সর্ব্বদা ;
কিন্তু তোর সম
শুনি দূর সমীরণ ধ্বনি
রোদনের ধ্বনি অনুমানি,
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে ?
অরে হীনমতি,
পতিভক্তি এই কি তোমার ?
কেবা সে অর্জ্জুন ? কেবা নারায়ণ ?
পতি [illegible] সমা হ'তে।"

এই ভাবেই বোধ হয় ম্যাডেম ফুরেহারের অনুবর্ত্তিনীগণ জার্ম্মাণ রমণী-

গণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, আজ হয়তো কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় চার্চ্চিল রুজভেল্টের সম্মুখীন হইয়া মহিষ্মতী সেনাবাহিনীর ন্যায় জার্ম্মান সৈন্য পরাভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু এই সমস্ত জার্ম্মাণ জননীগণের জনার প্রতিহিংসা-পরায়ণা সন্তানদের কার্য্যের কথাই কি মনে আসিতেছে না? জনা বলিতেছেন—

মমতা এস না বক্ষে মম!
জ্বল জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে!
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে
বীর অবতার
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা
পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো,
শোণিতের সনে বহ গরল প্রবাহ
বৈশ্বানর থের শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈরীরে নাশিতে।

চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট,—
হিংসা-তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর,
উঠরে প্রলয় ধূম বিশ্ব আবরিতে
পুত্রঘাতি অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈর-নির্য্যাতন
শোব শেষে তোরে ধরে কোলে।

এই রূপেই জনার ন্যায় প্রবল প্রতিহিংসা পরায়ণা নারীগণের পুত্র বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানগণ শত্রুর সম্মুখীন হইতে কোনরূপ ভয়েই ভীত হয় নাই, কেন না তাহারা পুত্রশোকাতুরা জননীগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইতেছে। মনে হয় ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ মাতৃপ্রভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে' নতুবা এই সমস্ত দেশই বা অজেয় কেন? আজ সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রেই বোধ হয় সর্ব্বদেশের এই সমস্ত মাতৃ-বাহিনী, চারণ-জননীগণের ন্যায় বলিয়া বেড়ায়—

দেখিবে জগতে— পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব, ফণিণীর গরল হরিব
শোক-বলে বজ্র-অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে।

মিষ্টার ইঙ্গলম্যানের কথা সত্য হইলে আজ এই মহাসমরে জার্ম্মান নারীগণ যে বিচিত্র অভিযান করিতেছে, ভারতের ইতিহাসে তাহা নূতন নয়। এখানেও রাজপুত রমণীগণ হাসিতে হাসিতে স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করাইয়া দিতেন। এই রূপেই জীজীবাই শিবাজীকে মহাকার্য্যে

উৎসাহিত করিতেন। এইরূপ অভিব্যক্তি আমরা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্রের লেখনীতেই পাইয়াছিলাম—গিরিশচন্দ্র জনার মাতৃত্ব-বিকাশ করিয়া অমর হইয়াছেন। 'জনা' আজ আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ। আজ এই ভাবে জনা চরিত্রের সমালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব মহাকবি গিরিশচন্দ্র কত শ্রেষ্ঠ জাতীয়তা-ভাবের অগ্রদূত ছিলেন! আজ তাঁহার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিই ও দেশবাসীকে 'জনা' নাটকখানির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, উহা যেন ঘরে ঘরে অধীত ও আলোচিত হয়।

———

ভক্তিমূলক নাটক ও শ্রীরূপ গোস্বামী

ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, রূপ-সনাতন, নসীরাম, জনা, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল প্রভৃতি নাটকের পরে ভক্তিরসমিশ্রিত নাটক আর দেখা যায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর হইত আসিয়া সমাধি-গ্রস্থ হইতেন, 'শঙ্করাচার্য্যে' বেদান্তদর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্বও উপলব্ধি হইত, 'তপোবলে' অহিংসা ও আত্মাশক্তির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম হইত, আর 'জনার' বিদূষকের প্রচ্ছন্ন ভক্তি দেখিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননীও বলিয়া উঠিয়াছিলেন "বিদূষক চরিত্রে গিরিশ নিজের জলন্ত ভক্তি-বিশ্বাসেরই প্রতিচ্ছবি দিয়াছে"। ইহার পরে এরূপ ভাবপ্রবণ নাটক আর বড় চোখে পড়ে নাই। শিবরাত্রির শলিতার মত অপরেশ চন্দ্রের 'রামানুজ' ও 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাটকে তবু একটু ক্ষীণরশ্মি দেখিতাম বটে, কিন্তু সে দীপও আজ নির্ব্বাপিত, এখন আর ভক্তিরস নাই, ভক্তিরস কেন, কোন রসই নাই, আছে কেবল পাশ্চাত্যের অনুকরণ। এই অনুকরণে আমরা নিজের সত্ত্বাই ভুলিয়া যাইতেছি। অথচ ইহলোক-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ আমাদের জাতীয় আদর্শ হইতে যে কত পৃথক্, তাহা আমরা একবারও ভাবিয়াও দেখিনা। পাশ্চাত্যজাতির সকল কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যমূলে আছে নীতি ও পুরুষকার, আর আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে ধর্ম্ম, পরলোক, ঈশ্বর নির্ভর। পুরুষকার পাশ্চাত্য-

জাতীর বৈশিষ্ট্য আর আমাদের বৈশিষ্ট্য ভগবানে ঐকান্তিক নির্ভরতা। এই উভয় বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য দিনরাত্রি, অথচ চলিয়াছি আমরা সেই ভুল পথেই। কোথায় সেই কবি বা নাট্যকার যিনি আমাদের খাঁটি পথের সন্ধান দিবেন? কোথায় সেই জ্ঞানীভক্ত শ্রীরূপ রায় রামানন্দ, জীবগোস্বামী গোবিন্দ দাস? কোথায় আজ পরমানন্দ সেন, কবিকর্ণপুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবি জয়দেব, সে রামপ্রসাদ কৈ? বঙ্কিমচন্দ্র কৈ? সে গিরিশ কৈ?

অবিদ্যার ছলনায় দুর্দ্দমনীয় ভোগবাসনা আমাদিগকে ভুলাইয়া ধর্ম্মবিমুখ করিতেছে, সুখের তৃষ্ণায় দুঃখের সাগরে আমরা সাঁতার দিতেছি, শান্তির কামনায় পর্ব্বতপ্রমাণ অশান্তি সৃষ্টি করিতেছি, আজ কামিনী, কাল কাঞ্চন পরশ্বঃ প্রতিপত্তি, পরদিন প্রতিষ্ঠা, কতইনা মায়ামুগ্ধ জীব আমরা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কে আজ আমাদিগকে সোজা পথে পরিচালিত করিবে। কোথায় সেই উদ্দীপনা, কোথায় এই প্রশ্নের উত্তর পাইব, আবার কবে সেই শ্রীচৈতন্য বা রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে! এই জাতি কি উঠিবে না? আবার কি বঙ্গভূমি প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইবে না? আবার কি ভ্রান্ত জীব ধর্ম্মপথ খুঁজিয়া পাইবে না?

এখন এ সব ভাবের বালাইও নাই। চিন্তাধারাও সেদিকে প্রধাবিত হয় না। তাই আমরা আর সেরূপ নাটকও পাইতেছি না। পাইতাম গৌরাঙ্গদেবের সময়ে, পাইতাম রামকৃষ্ণ আবির্ভাব-কালে। আজ এই অবিশ্বাসী সাহিত্যযুগে সেরূপ ভাবধারার একখানি নাটকের সামান্য পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব। পাঠক প্রগল্‌ভতা মনে করিবেন না।

বাঙ্গলার নাট্যকলা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে বিশেষভাবে

বিকাশ লাভ করিয়াছে। তিনি স্বয়ং অভিনয়াদি নবরস-রসজ্ঞ ও নৃত্যকলাবিশারদ ছিলেন। কি অভিনয়ে, কি নৃত্যে, তিনি অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চার করিতেন। তাঁহার নৃত্যে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় কঠোর বৈদান্তিকও তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া সকলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইত—

"আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে
হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে।"

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শান্তিপুর ও ছত্রভোগ হইয়া পুরীধামে যান, সেখানে নাট্যকলাও তাঁহার পরম সাধনার বস্তু ছিল—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ!
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

এই স্বরূপই ছিলেন নাটকের প্রথম পরীক্ষক। অর্থাৎ কোন নাটক যদি মহাপ্রভুর কাছে পড়িবার আবশ্যক হইত, পূর্ব্বে স্বরূপের কাছে উপস্থিত করিতে হইত। স্বরূপের অনুমোদন ব্যতীত মহাপ্রভুকে কেহ নাটক শুনাইতে পারিত না এবং নাটক যদি সিদ্ধান্তবিরোধী অর্থাৎ যুক্তিশূন্য-বিচার-সংযুক্ত হইত, তবে তাহা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইত।

"রসাভাস যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।"

একবার একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ চৈতন্যদেব সম্বন্ধে একখানি

নাটক লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইবার জন্য পুরীধামে ভগবান আচার্য্যের বাড়ী আসিয়া অবস্থান করেন। আচার্য্য নিজে নাটকের রচনা শুনিয়া প্রশংসা করেন, এবং স্বরূপকেও নাটকখানি শুনিতে অনুরোধ করেন। স্বরূপ বলিলেন—

"আচার্য্য, সকলেই নাটক লিখিতে পারেনা, রচয়িতার ব্যাকরণ অলঙ্কারজ্ঞান থাকা যেমন চাই, আবার ভক্তি থাকাও দরকার, সিদ্ধান্তবোধ থাকাও দরকার—

"রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার
ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার,
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক বাহার
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য বিহার।"

অনেক অনুরোধের পর স্বরূপ নাটক শুনিতে স্বীকার করিলেন। কবি প্রথমেই নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন—

"বিকচ কমল নেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনক-রুচি বিহাত্মন্যাত্মতাং অঃ প্রপন্নঃ
প্রকৃতে জড়মশেষঃ চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তল ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ।"

শ্লোক শুনিয়া সকলেই বাহবা দিলেন কিন্তু স্বরূপ কবিকে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলেন। কবি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

"কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর
চৈতন্য গোসাঞি তাহার শরীরী মহাধীর
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে,
নীলাচলে মহাপ্রভু হইল আবির্ভূতে।"

শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বরূপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং দুঃখিত মনে বলিলেন—

"আরে মূর্খ আপনারে কৈইলি সর্ব্বনাশ
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস
পরমানন্দ চিৎরূপ জগন্নাথ রায়
তাঁরে কৈল জড় নশ্বর প্রকৃতকায়
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান
তারে কৈল ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ সমান
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি
অ-তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি।
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ
দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ।
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ দেহী ভেদ
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥"

জগন্নাথ সর্ব্বশক্তিমান। তিনিতো কেবল কাষ্ঠ-প্রস্তর পুত্তলি নন, তাই স্বরূপ বলিলেন—

"জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্ম-স্বরূপ
কিন্তু ইহ দারুব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ"

অতঃপরে স্বরূপের উপদেশে সেই কবি কিছুদিন চৈতন্য-ভক্তদের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাদের কৃপায় রসাভাস, জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হন।

বস্তুতঃ নাটক রসাভাস যুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী প্রকৃত ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেন নাই। তাই বোধ হয় চৈতন্যদেব শ্রীরূপকে কৃপাদান করিয়া এই মহাকার্য্যে নিয়োজিত করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীই বাঙ্গলার প্রথম ভক্তি-নাটক-রচয়িতা। এই শ্রীরূপ গোস্বামী সম্বন্ধে একটু সামান্য পরিচয় আবশ্যক।

তখন হোসেন শাহ ছিলেন বাঙ্গলার স্বাধীন নরপতি। রূপ ও সনাতনের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার কথা অবগত হইয়া তিনি সনাতনকে প্রধানসচিব ও রূপকে রাজ্যের অন্য কোন উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপরে ভ্রাতৃদ্বয় চৈতন্যদেবের করুণালাভে ব্যাকুল হইয়া উঠিলে তিনি তাহাদিগকে অনাশক্ত হইয়া রাজ্যকার্য্য পরিচালন করিতে উপদেশ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপরে মহাপ্রভু রামকেলিতে তাহাদিগকে দর্শনদান করিয়া নীলাচল হইয়া অন্যপথে বৃন্দাবনে চলিয়া যান। ফিরিবার সময় প্রয়াগে রূপকে দর্শন দেন, রূপ তখন বৃন্দাবন পথ-যাত্রী হইয়া প্রয়াগে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থানেই মহাপ্রভু রূপকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসতত্ত্ব নির্জ্জনস্থানে বসিয়া শিক্ষাদান করেন।

"এই মত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া।"

পরম বিদ্বান ও ভক্তিমান পুরুষ নিজের এই সব রসতত্ত্ব কিছুদিন পূর্ব্বে রায় রামানন্দের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন—

"লোকভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধ যাঞা
রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রাপ্ত—
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল।"

মহাপ্রভু তখন রূপকে বলিয়া দিলেন "রূপ, তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখান হইতে গৌড়ে যাইবে, তারপরে আমার সঙ্গে নীলাচলে মিলিত হইবে"।

এবম্বিধ শিক্ষালাভ করণান্তর শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে নাটক প্রণয়ণ করিতে মনস্থ করেন—

"এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন।"

নাটকের নান্দীশ্লোক (মঙ্গলাচরণ) বৃন্দাবনেই রচিত হয়—

"বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল
মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল"

নাটক সম্বন্ধে শ্রীরূপ পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিলেন—

"পথি চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে—
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে।"

রূপ গৌড়ে আসিলেন এবং সেখান হইতে পুরী যাত্রা করেন। উড়িষ্যাদেশস্থ সত্যভামাপুরে রূপ গোস্বামী স্বপ্নে দেখিলেন 'এক দিব্য-রূপানারী' আদেশ করিতেছেন—

"আমার নাটক পৃথক করহ রচন
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ।"

ইতিপূর্ব্বে রূপ ব্রজপুর লীলা ও মাথুর লীলা এক সঙ্গে রচনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যভামার আদেশ পাইয়া এক নাটকে দুই বিষয়েরই বর্ণনা করিবেন স্থির করিলেন। রূপ নীলাচলে আসিয়া ভক্ত হরিদাসের বাড়ী অবস্থান করেন। ও প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হন। একদিন দুই জনই নৃত্যে মগ্ন হইলেন—

"প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা"

আর এক দিন দুইজনে বসিয়া আছেন, সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু যেন ভাবাবেশে বলিয়া উঠিলেন—"রূপ আমার কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিওনা"—

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে।"

রূপ এইবার দুই ঘটনা, দুই নান্দী লইয়া পৃথক্ দুইখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমখানির নাম দিলেন "বিদগ্ধমাধব নাটক" একদিন শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়ে প্রভু অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, নৃত্য করিতে করিতে কি বলিতেছেন, রূপ সবই বুঝিলেন এবং তদভাবাগত হইয়া রচনা করিয়া ফেলিলেন—

"প্রিয়ং সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্র
মিলিতস্তথাহং সা রাধা তদ্দিনমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং
তথাপ্যন্তঃ খেলমধুর মুরলী পঞ্চম জুষে
মনোমে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।"

"যমুনাতীরে কুঞ্জবনের সেই লীলাই আবার কেবল মনে আসিতেছে।" অল্পদিন মধ্যেই রূপ গোস্বামী তালপত্রে শ্লোক লিখিয়া চালার-বাতায় রাখিলেন ও সমুদ্রস্নান করিতে রওনা হইলেন। এমন সময়ে প্রভু রূপের সকাশে আসিয়া তাঁহাকে না পাওয়ায় চালের পত্রস্থ শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়িয়া প্রভুর আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রূপ আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, প্রভু "চাপড়" মারি কহিতে লাগিলা—

"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে
এত বলি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে।"

ক্রমে দুইখানি নাটক "বিদগ্ধমাধব" ও "ললিত মাধব" শেষ হইল ও প্রভুসকাশে এবং রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের সান্নিধ্যে পড়িবার

আদেশ হইল। রায়ের আদেশ পাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় নান্দীশ্লোক পঠিত হইলে প্রভু বলিলেন—

"শুনি প্রভু কহে এই অতিস্তুতি হৈল"

দ্বিতীয় শ্লোকটী প্রথমাপেক্ষাও মধুর ও কবিত্বপূর্ণ—

"অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণাবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং
হরি পুর্ব্ব সুন্দর দ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।"

ক্রমে সমগ্র নাটক পঠিত হইল, সকলেই ভাবগদ্‌গদ হইলেন, এবং পরম বিজ্ঞ রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন—

"এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের ধার—"

চৈতন্যদেবকে বলিলেন—

"প্রভু, তুমি সব পার
ঈশ্বর তুমি যে চাহ তা করিতে
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে
সেই রস দেখি এই ইহার লেখনে"

কিন্তু প্রভু মনে মনে তুষ্ট হইলেও, বাহিরে কিছু রোষ দেখাইয়া বলিলেন--"রূপ, তুমি কৃষ্ণরস কাব্য-সুধাসিন্ধু মন্থন করিয়া যে অমৃত উত্থিত করিয়াছ তাহা স্তুতিরূপ ক্ষারবিন্দুতে নষ্ট হইয়াছে।" কিন্তু রায় বলিলেন 'না প্রভু, ইহা কর্পূরের ন্যায় আরও রস বৃদ্ধি করিয়াছে--'

"রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পুর
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর।"

বস্তুতঃ মাধুর্য্যে 'বিদগ্ধমাধব নাটকের' তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন বিলাস, মদন লেখ, শ্রীরাধিকার সহিত মিলন, রাধা কর্ত্তৃক বেণুহরণ, রাধিকা প্রসাদন, শরদ্বার, বৃন্দাবনে মুরলী নিরসন প্রভৃতি লীলা বর্ণনায় এই নাটক পরিপূর্ণ।

কাশীতীর্থে নানা দিগ্দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে এই 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

এই নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন যদুনন্দন দাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোভাবের ৪ বৎসর পরে)। "বিদগ্ধমাধবের" সঙ্গে রচিত ভিন্ন নাটক "ললিত মাধব নাটক" ও সপার্ষদ মহাপ্রভুর সমক্ষে পঠিত হয়। রূপগোস্বামীর "দানকেলি নাটক" রচিত হয় ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে। যমুনার পারঘাটে 'দান' আদায়ের জন্য শ্রীরাধা এবং তাঁহার সহচরীবৃন্দকে অবরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কৌতুকক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাই এই রূপক নাটকখানির বিষয়।

নাটক রচনার উপযোগী শিক্ষা দীক্ষা না থাকিলে যে নাটক রচনা বিড়ম্বনা, এই প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষার হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' বাহির হয়, আর ইহাই বাঙ্গলার প্রথম সংবাদপত্র। ২৯শে জানুয়ারী তারিখে উহা বাহির হয়। কলিকাতা থিয়েটার ছিল তখন লায়নস্ রেঞ্জে ইহার নাম ছিল তখন থিয়েটার ষ্ট্রীট্। এই থিয়েটারের সমালোচনা বেঙ্গল গেজেটে তখন খুব বাহির হইত। প্রথম প্রকাশিত কাগজখানাতেই Beaux Stratagem নাটকাভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা বাহির হয়।

থিয়েটারের কথা ছাড়িয়া দিই। এই কাগজে রাজনৈতিক বিষয় বিস্তর থাকিত। কাগজখানি বাহির করেন হিকি (Mr. James Augustus Hickey) এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন প্রসঙ্গে মিঃ উইলকিন্সের নাম সকলেরই জানা উচিত। ইনিই বাঙ্গলার প্রথম ক্যাক্স্টন (Caxton). প্রবন্ধান্তরে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এই উইলকিন্সের পূর্ব্বেও একজন অক্ষর বিশারদ ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল বোলটস্ (Bolts)। তিনি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল গৃহে এবং অন্যান্য সাধারণ স্থানে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করিলেন যে যদি কেহ ছাপাখানা করিয়া কাগজ বাহির করিতে চাহেন, তবে তিনি অক্ষরাদি সরঞ্জাম জোগাইয়া এবং নানারূপ লিখিত ঘটনা ও কাহিনী দিয়া সহায়তা করিতে পারেন। দশ-বার বৎসর পর্য্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপরে এই হিকি আসিয়া কাগজখানি বাহির করেন। *

* See Busteeds Echœs of Calcutta-

হিকির গেজেট কেবল ভারতবর্ষেই প্রথম সংবাদ-পত্র নয়। বিলাতের টাইম্‌স ও ইহার ৮ বৎসর পরে বাহির হয়। ইহা সাপ্তাহিক পত্র ছিল এবং প্রতি শনিবার বাহির হইত। ৮ পৃষ্ঠার কাগজ ছিল এবং ইহার আকার ছিল ফুলস্কেপ কাগজের মত। ১৭৮০ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের কয়েকমাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এবং প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিত—রাজনীতি এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কীয় সাপ্তাহিক কাগজখানি সর্ব্ব দল ও সকল সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু ইহা কাহারও তাঁবেদার নয়। "A weekly Political and Commercial Paper open to all parties but influenced by none."

কাগজখানি কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ১৯২৪।১৯২৫ সালে আমরা ব্যবহার করিয়া Indian Stage Vol. Iতে অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ছাপা ও কাগজ মোটামুটি রকমের ছিল। London সহরের British Museum-এও ইহার এক কপি আছে।

বস্তুতঃ হিকি কাহারও তাঁবেদার ছিলেন না। তিনি স্বাধীন আলোচনায় কাহাকেও রেহাই দিতেন না, এমন কি গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকেও নয়। হেষ্টিংস এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পেকে তিনি নিঃসঙ্কোচে আক্রমণ করিতে দ্বিধা করেন নাই।

মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে জাল মামলা আনা হয় তাহাতে খুব দুর্ব্বল সূত্র ও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অনেকেই সন্দেহ করেন মহারাজা প্রকৃত পক্ষে জাল করেন নাই। হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রেই সেই দণ্ডবিধান হয়। প্রমাণের কথা যাহাই হউক, জাল নোকদ্দমায় ফাঁসি হওয়া বিস্ময়কর; বিশেষতঃ জাল করা সত্ত্বেও

ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু কাহার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে একথা তখন মুখব্যাদান করিতে পারিত? একমাত্র সাহসী হিকিই তাহা পারিয়াছিলেন। তিনি নির্ভীকভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন—

"Clive was made a peer in England though he Committed in Bengal the same crime for which we hanged Maharaja Nanda Coomer."

গত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুর New Town Press হইতে "Trial of Maharaja Nanda Kumar" নামে একখানি পুস্তকে বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় কথা বাহির হইয়াছিল। স্বদেশী-বীর প্রমথ মিত্র (Mr. P. Mitra) উহার ভূমিকা লেখেন। তাহাতেই হিকির এই উপরোক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এবং তাঁহার পত্নী সম্বন্ধেও হিকি আবশ্যক মত লিখিতে দ্বিধা করিতেন না। ফলে গভর্ণর জেনারেল তাহার উপর খুবই চটিয়া যান। কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারী সম্বন্ধেও কাগজে নানারূপ মন্তব্য বাহির হইত। তবে ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সম্বন্ধে খুব কম থাকিত।* এই ফ্রান্সিস্ ছিলেন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য, হেষ্টিংসের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক সময় আক্রমণে ঘরের খবর বাহির হইত বলিয়া কেহ কেহ হিকির উপর চটিয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা চটিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস্। তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর তারিখে ডাকঘরের সহায়তায় কাগজের প্রচার

---

* Busteed—"He almost alone amongst the official leaders of society is dealt gently with."

নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। অজুহাত হইল কাগজে অনেক ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকে বলিয়া ভারতীয় উপনিবেশের শান্তিভঙ্গ হইতেছে (Peaee is having disturbed.)

হিকি যে আক্রমণ করিত কতকটা নাটকীয় ভাবে ও ভাষায়। আর Dramatis Personiera অবতারণা করিয়া। হিকি এই আদেশ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি ২০জন হরকরা নিযুক্ত করিয়া নানাস্থানে কাগজ পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি প্রকাশ কবিয়া দেন যে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে তাহাকে কেহ বিরত করিতে পারিবে না। হোমার যেমন লোক সঙ্গীত প্রচার করিতেন, তিনিও পদ্য ও গদ্যে তাহা বাহির করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় তাহা ফিরিওয়ালার সহায়তায় বিক্রী ও প্রচার করিবেন।

হেষ্টিংস্‌ও তাঁহাকে ছাড়িলেন না। তাঁহাকে জেলে পুরিলেন এবং ভুগিয়া ভুগিয়া হিকি জেলখানায়ই মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই গ্রেপ্তারের পরেই ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হিকির কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।

হিকির বেঙ্গল গেজেটের পরে দি ইণ্ডিয়া গেজেট বাহির হয়, ১৭৮০ নভেম্বরে। দি ক্যালকাটা গেজেট এবং ওরিয়েণ্ট্যাল য়্যাডভারটাইজার (Oriental Advertiser) বাহির হয় ১৭৮৪, ফেব্রুয়ারীতে। কাগজ-খানি সরকারী কাগজের কাজ করিত। ইহা পাঠাইতে ষ্ট্যাম্প লাগিত না আর ইহার সম্পাদক ছিলেন Francis Gladwic. 'বেঙ্গল জার্নেল' বাহির হয় ১৭৮৫ ফেব্রুয়ারী, ওরিয়েণ্ট্যাল ম্যাগাজিন ৬ই এপ্রিল ১৭৮৫, দি ক্যালকাটা Chronicle ১৭৮৬ জানুয়ারী।

সংবাদপত্রের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বড় সুদৃষ্টি কখনও নাই। কোন

একখানি কাগজের মন্তব্যের জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস্‌ও একজন সম্পাদককে নির্ব্বাসিত করেন (deport). এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টেও অনেক আলোচনা হয়। তবে নির্ব্বাসন দণ্ডই বজায় থাকে (১৭৯৪)।

পাঁচ বৎসর পরে লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক (Censor) নিযুক্ত হল-। লর্ড মিণ্টোও সংবাদপত্রের বিষয়ে পূর্ব্ব দৃষ্টান্তই অক্ষুণ্ণ রাখেন।

লর্ড ময়রা (লর্ড হেষ্টিংস্‌) 'তত্ত্বাবধায়ক' উঠাইয়া দেন, তবে একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলেও ন্যায়সঙ্গত সমালোচনায় বাধা দেন নাই। তাঁহার আংশিক উদারতায় উৎসাহিত হইয়া ক্যালকাটা জার্নালের সুযোগ্য সম্পাদক বাকিংহাম (Mr. Jemes Silk Buckingham) আবাব স্বাধীনভাবে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোম্পানীর দ্বারাও যে যে অনাচার অনুষ্ঠিত হয় অসংকোচে তাহা প্রকাশ করেন। এই জার্নেল বাহির হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে।

লর্ড হেষ্টিংস এবং লর্ড আমহার্ষ্টের মাঝে মিঃ জন অ্যাডাম্‌ নামে একজন কাউন্সিলের মেম্বার অস্থায়ীভাবে গভর্ণর জেনারেলের কাজ করেন। ইনি প্রথমে আদেশ করেন প্রত্যেক প্রিণ্টারকে লাইসেন্স (অনুমতি পত্র) লইতে হইবে। বাকিংহাম্‌ এইরূপ আদেশ অগ্রাহ্য করেন। ফলে তাহাকে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। বাকিংহাম নিজের দেশে (ইংলণ্ডে) অবশ্য বিশেষরূপে সমাদৃত হন।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক সংবাদ পত্রের উপর যে সমস্ত আইন কানুন হইয়াছিল তাহা না উঠাইলেও কার্য্যতঃ তিনি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার মত কিছু পান নাই। তবে সংবাদ পত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

প্রদান করেন স্যার চার্লস্ মেটকাফ্। কোম্পানীর ডিরেকটারগণের ইহাতে রোষের কারণ হইলেও তিনি এদেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। হেয়ার ষ্ট্রীটে গঙ্গার ধারের বাড়ীটি 'মেটকাফ হল্' নামে অভিহিত এবং ইহাতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী অনেক দিন ছিল। এখানেই আমি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য-তত্ত্ব পণ্ডিত ডক্টর ভ্যানম্যানের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার্জ্জন করিতে সক্ষম হই।

উদারনীতিক মেটকাফ ১৮৩৫ সেপ্টেম্বর হইতে সংবাদ পত্রের যে স্বাধীনতা প্রদান করেন, তাহা প্রায় ৪০।৪২ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী ডিস্‌রেলির অনুগত ভাইস্‌রয় লর্ড লীটন আসিয়া Vernacular Press Act প্রবর্ত্তন করিয়া দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন (১৮৭৮) ইতিপূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও লর্ড ক্যানিং সংবাদ পত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নাই।

উদার নীতিক লর্ড রীপন এই আইন উঠাইয়া আবার দেশবাসীর হৃদয় জয় করেন। অতঃপর সেই স্বাধীনতা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পর হইতেই আবার ১৯০৮, ১৯১০ হইতে এবং পরবর্ত্তী কড়াকড়ি নিয়মে সংবাদ পত্রের এখন কোন স্বাধীনতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিকির কথা হইতে আমরা অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি। এই হিকির আক্রমণ ও সমালোচনায় সত্যের অংশ খুব বেশী থাকিত। হিকি তেমন সুশিক্ষিত ছিলনা, সাধারণ শ্রেণীর লোক মাত্র। 'তাই লেখায় মাঝে মাঝে শ্লীলতা অতিক্রান্ত হইলেও, বাংলাদেশের প্রথম সংবাদ পত্রখানি যে নির্ভীকভাবে পরিচালিত হইত এবং হেষ্টিংস্ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একমাত্র হিকিই যে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিয়াছিলেন ইহা কম শ্লাঘা ও

আনন্দের কথা নয়। এই বিষয়ে "Original Inquiry" নামক পুস্তকেও এইভাবে বিধিবদ্ধ আছে—

"Though a free Press never for a moment existed in India since the Local Governments were armed with the powers of deportation, by the Act of 1793, yet at different times before the imposition, and since the discontinuance of a Censorship at Calcutta, individual editors of newspapers have ventured, at their own peril, and to their own ruin, to try how far they might gave publicity to facts and opinions respecting public affairs and public men. That any evil of a peculiar and local nature ever resulted from such attempts we have no evidence whatever, nor the slightest grounds of presumption for believing. Of the great disorders produced by conflicting laws and jurisdiction in 1780 for instance, we have incontestible proof; but of the serious evil which Sir John Malcolm supposes to have been occasioned by the circulation of Hikey's Bengal Gazette, he can not produce one instance. On the otherhand it can not be doubted that the files of that paper must throw singular light on the nature of the contentions which then agitated the public mind and the character of the men who then held the highest stations; nor without access to such can a just view of that period ever be obtained."

এই "Original Inquiry"র গ্রন্থকারের মতামত পাঠ করিলে হিকির প্রতি নিগ্রহের কারণ নির্দ্দেশ করা সহজ হয়। তবে হিকির আক্রমণ যে লোককে ব্যতিব্যস্ত করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। Bon Ton Intelligence নামে একটি বিভাগ থাকিত এবং তাহাতে যাবতীয় বিষয়ের সমালোচনা হইত। হিকির কাগজের পরে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' নামে

উহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একখানি কাগজ বাহির হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ উহার পরিচালকদ্বয় মেসিঙ্ক এবং পিটার রীডকে সহায়তা করিতেন। এই মেসিঙ্ককেই ক্যালকাটা থিয়েটারের ষ্টেজ ম্যানেজার করিয়া ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিক তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। রীড সাহেব নিমকের সাহেব ছিলেন বলিয়া তাহাকে হিকির বেঙ্গল গেজেট Peter Nimuk এবং মেসিঙ্ককে "Barnaby Grizzle" আখ্যা দিয়া রহস্য করিত।

এই কাগজখানিকে কিছু সুবিধা দেওয়ায় হিকি লেখেন হেষ্টিংস-পত্নীকে খুসী করিতে পারিলে আমরাও এরূপ সুবিধা পাইতাম। তাহার পর হইতেই ওয়ারেন হেষ্টিংস হিকির উপরে চটিয়া যান।

"Trim" কল্পিত নামে একজন সমালোচক সেকালের স্ত্রীজাতির পোষাক বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা প্রকাশ করে। প্রথমেই লেখা ছিল—

On the present mode of dress humbly inscribed to a certain fair damsel—

তারপর কবিতাটি লিখিয়া শেষ ছত্রে মন্তব্য করেন—

By the devil once tempted.
They now tempt the devil.

এই মহিলাটি ছিল চুঁচুড়ার খুব সাজসজ্জাপরায়ণা কলাভিজ্ঞা Miss Emela Wrangham পরে মিঃ ব্রিষ্টো নামক একব্যক্তির সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। ইনি ১৭৮৯ খৃঃ একটী থিয়েটার করেন এবং তাহাতে নিজেও অভিনয় করেন। ভারতের ইনিই সর্ব্বপ্রথমা স্ত্রী অভিনেত্রী।

তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। Trim তাহাকে কখনও বলিত Beauty কারণ ইনি সুন্দরী। কখনও The Chinsura Belle কখনও

St. Helena Felly কারণ ইহার পিতা সেণ্ট হেলেনায় কাজ করিতেন। তাহার ব্যর্থ প্রণয়ী মিলটনকে ঠাট্টা করিয়া লেখেন Jack Paradise Lost আর একজনকে লেখেন Counseller Feeble (তাহার নাম ছিল Counsel Davis)

Livius নামধেয় আর একজনকে Idea George অথবা Titus বলিয়া উপহাস করিতেন।

আর একটি বিভাগের নাম ছিল Poet's Corner. এক নব্য যশ-প্রার্থী কবি যেন তাহার প্রণয়িণী Sueকে উদ্দেশ করিয়া লিখিতেছে :—

"O lovely sue
How sweet art thou (thoo)*
Than sugar thou art sweeter
Thou dost as far
Excel sugar
As sugar does.
Salt petre.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিকি যাহাদিগকে উপহাস বা ব্যঙ্গ করিতেন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণায়। যেমন—

A Tragedy
Tyranny in Full Bloom
Sir T. Wronghead—By the Grand Trunk
(Mr. Hastings).
Judge Jeffhreys—By Ven'ble Poolbundy (Impey).
Judas Iscariot counting 40 pieces—Rev. Tally Ho
(Rev. William Johnson).
Cato the True Born Englishman—Mr. Hiekey.

বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্রের নামও "বেঙ্গল গেজেট।" ১৮১৬

---

* Scotch Pronounciation 'হু'

খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হুগলী জিলাস্থ বড়া গ্রামের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। ইহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য ছবিসহ ছাপা হইত।

পাদ্রি মার্সম্যানের চেষ্টায় ১৮১৮ খৃঃ শ্রীরামপুর হইতে যেমন ইংরাজী **The Statesman and Friend of India** (এপ্রিল) কাগজ বাহির হয়; বাঙ্গলা 'সমাচার দর্পণও' ঐ সাল হইতেই বাহির হয়। সমাচার দর্পণেরও পূর্ব্বে 'দিগদর্শন' নামে মাসিক পত্র বাহির হয়। তবে একমাস বাহির হইয়াই উহা স্থগিত হয়। সমাচার দর্পণ বহুদিন পর্য্যন্ত চলে। 'দিগদর্শনে' সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালী পরিচালিত "সংবাদ কৌমুদী"ই প্রথম খাঁটি সংবাদপত্র। এই কাগজখানি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। আর উহার সম্পাদক ছিলেন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিচ সমাচার দর্পণ উহার পূর্ব্বের কাগজ কিন্তু সংবাদ কৌমুদীতেই দেশীয় সংবাদ দেশীয় ভাবেই সমধিক পরিমাণে থাকিত। কাগজ পাওয়া যায় নাই ; তবে উহার কতকটা পরিচয় "ক্যালকাটা রিভিউ" কাগজে পাওয়া যায় ১৮৫০, ১৩ খণ্ড ১৬০ পৃঃ।

শ্রীরামপুরের মিশনরীরা "গস্‌পেল ম্যাগাজিন' নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধে কটাক্ষপাত এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মের সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি বাহির হইত। ইহার উত্তরে বাহির হয় রামমোহন রায় সম্পাদিত "ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন।". ইহা মাসিক পত্রিকা, ইংরাজী বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইত। বাঙ্গলায় লিখিত অংশ 'ব্রাহ্মণ সেবধি'

নামে বাহির হইত। রামমোহন রায় ছিলেন 'বেদান্তবাদী হিন্দু, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক। তিনি স্বীকার করিতেন না যে পিতা (গড) Holy Ghost ও পুত্র যীশু তিনজনে একত্রে বা পৃথকভাবে ঈশ্বর হইতে পারেন। তাই তিনি গস্‌পেল ম্যাগাজিনের মতবাদ ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিনের সহায়তায় খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে শ্রীরামপুরের মিশনরিদের প্রভাবে তখন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাইত। এই হিসাবেও রামমোহন এবং "সংবাদ কৌমুদি" দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের সহকারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আর একখানি কাগজ বাহির হয়। ইহার নাম "সমাচার চন্দ্রিকা"। ইহা সাপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে "তিমির নাশক" নামে আর একখানি কাগজ বাহির হয়।

সর্ব্বোপরি "সংবাদ প্রভাকরই" শ্রেষ্ঠ কাগজ। ইহা ১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে বাহির হয়। প্রথমে ইহা ছিল সাপ্তাহিক, পরে দৈনিকে পরিণত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে এই কাগজে কবিতা লিখিয়াই কবিবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন কবিগুরু এবং দীনবন্ধু ও বঙ্কিম তাঁহারই উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন।

আমরা এই প্রথম জাতীয় পত্রের প্রবর্ত্তক কবিগুরু ঈশ্বর গুপ্তকে আজ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি।

পানিহাটীতে শ্রীচৈতন্যদেব*

গত দীপান্বিতার দিনে পানিহাটির শ্রীগৌরাঙ্গ মহোৎসব দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অনেক দিন কলিকাতার বাহিরে যাই নাই, বেশী দিন সহরে থাকিলে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে, তাই কলিকাতার নিকটস্থ এই উৎসবটী দেখিবার জন্য খুব আগ্রহ হয়। মনে হইল, কয়েক ঘণ্টার জন্য হইলেও একটী নূতন জায়গা দেখা হইবে, আর ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিবারও সুবিধা হইবে। ফলে আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইয়াছে। নিশ্চয়ই তাহা মহাপ্রভুর কৃপায়।

অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের কন্যা ও জামাতা পাণিহাটিতে থাকেন। তিনি আমাকে রবিবার সেখানে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিজে শনিবারই চলিয়া আসেন। জামাতা শ্রীমান সুশীল পাণিহাটীতে বেঙ্গল কেমিকেলের প্রধান কেমিষ্ট। সকালে ৭টা হইতে আমার জন্য গেটে অপেক্ষা করিতেছিল। বেঙ্গল কেমিকেল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ঠিক উপরেই।

---

* বঙ্গশ্রী, ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ।

প্রভাতে উঠিয়া কাগজ পড়িয়া আসিতে একটু দেরী হইল বটে, তবে শ্যামবাজার আসিয়া ৩২ নম্বরের বাস্ ধরিয়া এবং বারাকপুরের ৮ নম্বর বাসে আসিয়া. পাণিহাটিতে পৌঁছিতে প্রায় ৯টা হইল। কারখানার সম্মুখে নামিতেই শ্রীমান সুশীলের নিয়োজিত লোক বাসায় লইয়া গেল। বাসাখানা খুব খোলা যায়গায় ; বসিয়াই চেঞ্জের প্রভাব অনুভব করিলাম। জলখাবার খাইয়া শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িলাম।

বিপিন বাবু বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তিনি রাস্তায় আমাকে গৌরাঙ্গের কথা বলিতে বলিতে চলিলেন। পাণিহাটি সহরটি বড় পুরাতন, দেখিয়া তৃপ্তি পাইলাম না। ক্রমে আমরা শ্রীযুক্ত অমূল্য ভট্টের বাড়ী আসিলাম। ইঁহারই বাড়ীতে গৌরাঙ্গদেবের ছবি সুরক্ষিত আছে। সেখানে কিছু কিছু যাত্রীও দেখিলাম।

অতঃপরে আমরা গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে আসিলাম। স্থানটির মনোহরত্ব দেখিয়া প্রাণ জুড়াইয়া গেল। কত ভক্তের পদরেণু স্থানের পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! বিশাল বটবৃক্ষতলে একখানি মন্দির, পশ্চাতে গঙ্গা আর সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। নিকটে আবার কয়েকটী বটগাছ উহার বেষ্টনী ও ছায়াতে স্থানটীকে আরও স্নিগ্ধ ও মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমে একটী ঘাট, এই ঘাট দিয়াই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দদেব এই গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের উত্তর এবং দক্ষিণেও দুইটী প্রকাণ্ড ঘাট আছে।

অতঃপরে আমরা রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী গেলাম। সেখানে দেখিলাম, একটি আপাদমস্তক গেরুয়া পরিহিত ভক্তকে ধরিয়া কয়েটী স্ত্রীলোক

রাঘবের সমাধির ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। ভক্তটির স্ত্রীবেশ, তাঁহার বর্ণ অতিশয় গৌর। আমার নিকটে তিনি স্ত্রী-ভক্তরূপেই অনুমিত হন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, নবদ্বীপের ললিতা-সখার ন্যায় তিনি স্ত্রীবেশ ধারিণী ভক্ত।

রাঘবের বাড়ী হইতে আসিয়া আমরা গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে নামিলাম। শরতাবসানে জল খুবই স্বচ্ছ, আর বড়ই স্নিগ্ধ, শীতল। অবগাহন স্নানে বড়ই তৃপ্ত হইলাম। আমরা যখন হেলাইয়া দুলাইয়া স্নান করিতেছি, পূর্ব্বদিকের বাড়ী হইতে মধুর কীর্ত্তনের ধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। একটু পরে কে আসিয়া বলিল, "লেডী গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন শুনিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন।" স্নান সমাপন করিয়া পরে গিয়া দেখিলাম, অনেক ভক্ত এবং সেই গৌর-অঙ্গ স্ত্রীবেশ ধারিণী ভক্তটী বসিয়া কীর্ত্তন উপভোগ করিতেছেন। 'ইঁহাকেই রাঘর পণ্ডিতের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম, ইনিই লেডী গৌরাঙ্গ। অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। শুনিলাম বাড়ীখানি অমৃতসমাজের বাবু হরিদাস মজুমদারের।

সেখান হইতে ঐ বটবৃক্ষতলায় আবার আসিলাম। অনতিকাল পরে, প্রায় দেড়টার সময় গৌরাঙ্গের ঘাটে বড় ভীড় হইল, এবং বাদ্য-ভাণ্ড বাজিতে লাগিল, সকলে সতৃষ্ণভাবে কোন্ এক পরমারাধ্য পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দক্ষিণ দিক হইতে একখানি ডিঙ্গী নৌকায় গৌরাঙ্গদেবের সেই অমূল্য বাবুর বাড়ীর ছবিখানি সহ কয়েকজন লোক আসিতেছেন। বিপিনবাবু সেই ভীড়ে পুষ্পডালি হস্তে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ঠাকুরকে

উঠাইয়া দোলায় চড়াইয়া প্রথমেই বাদ্য-ভাণ্ড সহ রাঘবের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখান হইতে পুনরায় আবার শোভাযাত্রা করিয়া উহা বটবৃক্ষতলস্থ মন্দিরে স্থাপিত করা হইল। শুনিলাম, ঠিক এই তিথিতেই নাকি শ্রীচৈতন্যদেব পানিহাটিতে আসিয়াছিলেন। সে আজ চারিশত বৎসরের উপরের কথা। যাহা হউক, অতঃপরে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আবার বেঙ্গল কেমিকেলে গেলাম। পথে কংগ্রেস নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের সঙ্গে দেখা হইল। শুনিয়াছি ইনি শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

পাণিহাটির দ্রষ্টব্য সবই দেখিলাম, এইবার আহারান্তে কলিকাতা ফিরিয়া যাইব ভাবিতেছি কিন্তু শুনিলাম শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন গান। ইহাপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? বহুদিন পূর্ব্বে একবার দেশবন্ধুর প্রাঙ্গণে তাঁহার গান শুনিয়াছিলাম। স্থির করিলাম বৈকালে নিশ্চয়ই আসিব।

বেঙ্গল কেমিকেলের বাসায় প্রায় আড়াইটার সময় ফিরিয়া আসিলাম। আহার্য্য সবই তৈরী হইয়া গিয়াছে। কেবল গরম ভাত দেওয়ার জন্য চাউল চড়ান হইয়াছে। খাওয়ার জিনিষেরও অভাব ছিল না, গৃহকর্ত্রীর যত্নেরও অবধি ছিল না। চব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় আহার করিয়া আবার শীঘ্রই বিপিন বাবুর নির্দ্দেশ মত বাহির হইয়া পড়িলাম।

কম্পাউণ্ডের বাহিরে আসিতেই দেখিলাম কয়েকটী ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামদাস বাবাজী কি আসিয়াছেন?" উত্তরে শুনিলাম, "হ্যাঁ তাঁহার কীর্ত্তন হইতেছে, প্রায় শেষ হইয়া গেল।" তাঁহাদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাইলাম;

তিনি 'দেশ'-সম্পাদক বঙ্কিম চন্দ্র সেন; রাঘবের বাড়ীতে বক্তৃতা করিয়াছেন।

উভয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলিলাম। কারণ রামদাস বাবাজীর কীর্ত্তন শুনিতে বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল। মনে খেদ হইল, এতদিন পরে কাছে পাইয়াও তাহা শুনিতে পারিলাম না। আসিয়া দেখি, গঙ্গাতীরে সেই মন্দিরের সম্মুখেই কীর্ত্তন এখনও চলিতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাবাজী এক একটী পদ গাহিতেছেন, আর তাঁহার গণ্ড বাহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। তিনি গাহিতেছেন, সঙ্গের লোকও গাহিতেছে, আর এক গভীর ক্রন্দনের রোলে পবিত্র স্থান প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গানের শেষ পদটী এই—

"ওহে পানিহাটী বাসী বন্ধুগণ, আমরা বহুদূর হ'তে এসেছি, তোমরা গৌরধনে ধনী, দয়া ক'রে আমাদিগকে গৌরকে দেখাও, তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাক্‌বে। আমরা নিয়ে যাব না, দয়া ক'রে একবার আমাদের দেখাও, আমরা কেবল এই ভিক্ষা চাই।"

গান চলিতে লাগিল আর এক অপূর্ব্ব ভাব-তরঙ্গে সমগ্র স্থানটী প্রবাহিত হইল, ভক্তগণ যেন আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ইঁহাদের সরল ও অকৃত্রিম ভক্তিতে আমাদেরও প্রাণ দ্রব হইল। অনেক দিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র একটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সরল ভক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আজ সেই কথাটী মনে পড়িল।

গিরিশচন্দ্র তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তবে ভগবদ্‌কৃপা লাভের জন্য মন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার

"চৈতন্যলীলা" নাটক তখন অভিনীত হইবে, তিনি কয়েকখানি চিত্রপট আঁকাইয়া লইতেছেন। চিত্রকর একজন গৌরভক্ত বৈষ্ণব। আলাপ করিতে করিতে সেই সরল বিশ্বাসী ভক্তটী একদিন বলিল, "পতিতপাবন গৌরচন্দ্রের মহিমার কথা আপনাকে আর কি বলিব? আর এ অধমের প্রতি তাঁর করুণাই বা কত? আমি সারাদিন পরিশ্রমের পর দিনান্তে রন্ধন করিয়া যখন তাঁহাকে ভোগ দিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে থাকি, তখন সত্য সত্যই দেখিতে পাই, গৌর আমার সেই ভোগের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কখনও রুটি লুচিতে দাঁতের স্পষ্ট দাগ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।" গিরিশ লিখিয়াছেন, "এই ব্যক্তির কথায় আমার চক্ষে জল আসিল।" বস্তুতঃ গৌরভক্তগণের এরূপ অকৃত্রিম সরল ভক্তির কথা অনেক শুনিয়াছি। পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু আজও ভক্তমণ্ডলীর কি অনুরাগ! যে যে স্থানে তাঁহার পদরজঃ পড়িয়াছে সেই সেই স্থান তাঁহারা কত পবিত্র মনে করেন!

অতঃপরে দেখিলাম, কীর্ত্তনের পরে রামদাস বাবাজী রাঘবের বাড়ীর দিকে রওনা হইতেই অসংখ্য লোক কলিকাতা যাইবার জন্য ঘাটের দিকে গেলেন। দক্ষিণের ঘাটটিতেই সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক নৌকায় প্রায় বিশ পঁচিশ জন করিয়া বাগবাজার ও আহিরীটোলার ঘাটে যাইতে লাগিল। ভাড়াও মোটে জনপ্রতি ছয় পয়সা।

ঘাটের উপরে আসিয়া পশ্চিম গগনের বিচিত্র শোভা দেখিলাম। খরস্রোতা গঙ্গার উপরে অস্তাচলগামী সূর্য্যদেবের রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হইল যেন, গলিত রজতরাশি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ওপারে

বৃক্ষরাজি ও ছায়া, গঙ্গাবক্ষে অগণিত তরী আর এপারের বটবৃক্ষ, ভক্ত-সমাগম ও উৎসব। কি অপরূপ দৃশ্য!

সুশীলের বাসা হইতে বিদায় হইয়া আসিবার সময়, আবার সেখানে বৈকালের চা খাইয়া 'বাসে' উঠিবার অনুরোধ ছিল। আমারও তাহাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসী, অতিশয় জলপথপ্রিয়। তাই নৌকার লোভ ছাড়িতে পারিলাম না, বিপিনবাবুকে অনেক অনুরোধে রাজী করাইয়া সেখান হইতেই নৌকা-যাত্রা করিলাম। ছাদের উপর বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতে দেখিতে স্রোতের সঙ্গে চলিলাম। পশ্চিম গগনের কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই তপ্তকাঞ্চন রূপরাশির মধ্যে সূর্য্যদেব যেন অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। গগন শূন্য হইল, তপন বিহনে ক্রমে উহা মলিন হইয়া আসিল ক্রমে তমসাচ্ছন্ন নিশীথের কোলে উহার বিরাট দেহখানি ছাড়িয়া দিয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। এই ভাবেই আমরা বাগবাজার ঘাটে আসিয়া পঁহুছিলাম।

পাণিহাটী এত নিকটে, অথচ এই তীর্থস্থানটি আমার নিকটে এক রকম অজ্ঞাতই ছিল। এইবার পাণিহাটিতে মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিবার সৌভাগ্য হইল।

মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপধামে। চব্বিশ বৎসর বয়সে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। অতঃপর কয়েক দিন অদ্বৈত গোস্বামীর বাড়ী থাকিয়া ছত্র ভোগ হইয়া পুরীধামে চলিয়া যান। দুই এক মাস থাকিয়া তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হয়েন এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আবার নীলাচলে আসেন। গোদাবরী তীরে

রায় রামানন্দের সহিত এই সময়েই মিলন হয়। ষড়দর্শনাভিজ্ঞ বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ-রুদ্রও মহাপ্রভুর বিশেষ অনুগত হইয়া পড়েন।

ছয় বৎসর অনুমান ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার অভিপ্রায়ে নৌকাযোগে গৌড়দেশে আসেন। প্রথমতঃ তিনি পাণিহাটিতে পদার্পণ করেন এবং এক রাত্রি রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে থাকেন। এখানে অনেকেই মহাপ্রভুকে দেখিতে আসেন—

"সেই নৌকা চলি প্রভু আইলা পানিহাটি,
নাবিকে পরাইল প্রভু নিজ কৃপা শাটি।
প্রভু আইলা বলি লোকের হৈল কোলাহল,
মনুষ্য ভরিল সব কিবা জল স্থল।
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা,
পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্টে সৃষ্টি আইলা।
একদিন তথা প্রভু করিয়া নিবাস
প্রাতে কুমারহট্ট আইলা যাহা শ্রীনিবাস॥"

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ।

পাণিহাটী, কুমারহট্টের পর শিবানন্দের বাড়ী ও বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, ফুলিয়া হইয়া মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ী আসেন। এখানেও শচীমাতাকে প্রণাম করেন। তৎপর রামকেলি গ্রামে যান। রামকেলি গৌড়ের সন্নিকটে এবং এখানেই নিশীথে রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সনাতন বলেন, "এইরূপে বৃন্দাবনে যাইবেন না।—

"যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবনে যাবার এ নহে পারিপাটী।"

—মধ্যলীলা, প্রমথ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু কানাইয়ের নাট্যশালা পর্য্যন্ত আসেন এবং

"মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে
কিছু সুখ না হইবে হৈবে রসভঙ্গে।"

বলিয়া পুনরায় শান্তিপুরে আসেন। এখানে রঘুনাথ দাস আসিয়া প্রভুর কাছে মিনতি জ্ঞাপন করেন। এই রঘুনাথ খুব ধনীর পুত্র। সপ্তগ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামে দুইজন মহাধনী সহোদর বাস করিতেন—

"সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।"

এই রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। পূর্ব্বে যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া কাটোয়া হইয়া শান্তিপুরে আসেন, তখনও রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার পদ সেবা করেন—

"আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত,
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত।
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল,
তিঁহ ঘরে আসি হৈল প্রেমেতে পাগল।"

এই রঘুনাথ দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রেমাবিষ্টভাবে কাল যাপন করিয়া এবার আবার মহাপ্রভুর চরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়া "সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু

সঙ্গে রহে"। কিন্তু প্রভু তাহাকে কিছুদিন অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে আদেশ করিয়া পরে পুরীতে যাইতে বলিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল,
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া,
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ।

ফিরিবার সময়েও মহাপ্রভু শ্রীবাস আলয় কুমারহট্ট হইয়া আবার পাণিহাটিতে আসেন। এখানেও রাঘবের ভক্তি উথলিয়া উঠিল এবং মহাপ্রভুও তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া অপার শক্তি পাইলেন—

"কথোদিন আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে,
তবে গেলা পাণিহাটী—রাঘব মন্দিরে!
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ চরণ,
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন।
প্রভুও রাঘব পণ্ডিতেরে করি কোলে,
সিঞ্চিলেন অঙ্গতান নয়নের জলে।"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

একদিন প্রভু রাঘবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"রাঘব, তোমাকে দেখিয়া আমার সব দুঃখ দূর হইল, তোমার বাড়ীতে আসিয়া গঙ্গাস্নানের তৃপ্তি অনুভব করিলাম"—

প্রভু বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া
গঙ্গায় মজ্জন দৈতে যে সন্তোষ হয়
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয়।"

অতঃপরে রাঘবকে আদেশ করিলেন "রাঘব, শীঘ্র তুমি কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিৎ"।

মহাপ্রভু এখানে নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য সকলকে লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন এবং তৃপ্তির সহিত রাঘবের সাত্ত্বিক রন্ধনের ও সর্ব্ব-ব্যঞ্জনের প্রশংসা করেন—"সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত"।

"প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।
রাঘবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিয়া
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া"

—অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এইরূপে—

"পাণিহাটী গ্রামে হৈল পরম-আনন্দ
আগন সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র।"

এই যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ছয় বৎসর পরে তিনি পাণি-হাটিতে দুইবার পদার্পণ করিয়া পাণিহাটী গ্রাম পবিত্র করিয়া দিয়াছেন, আজও সেই পবিত্রভূমি ভক্তগণ আসিয়া ভক্তি-পুষ্পে সুশোভিত করেন, ভক্তি অর্ঘ্যে পূজা সমাপন করেন আর ভক্তি-বিরহাশ্রুতে বিধৌত করিয়া থাকেন। তাই রামদাসবাবাজী প্রতি বৎসর আসিয়া কাঁদিয়া গাহেন—

"একবার দেখাও গো
তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে
একবারটি দেখাও।"

আর তাই এখানে এত ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে।

পাণিহাটিতে মহাপ্রভুর প্রথম পদার্পণ হয় কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে। এই উৎসবও হয় সেই সময়ে। পাণিহাটিতে আর একটি উৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে, সেই সম্বন্ধে পরে বলিব।

মহাপ্রভুর ভোজনপ্রীতি সম্বন্ধে তাঁহার সহচরবৃন্দ ও ভক্তগণ খুবই জানিতেন। তাই তিনি যেখানে যাইতেন ভক্তগণ আহারের সুব্যবস্থাই করিতেন। এবার ভোজন বিলাস সম্বন্ধে একটী চিত্র প্রদান করিব। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নিত্যানন্দসহ যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আসেন, নিম্নলিখিত রন্ধনদ্রব্যে আচার্য্যাণি ভগবদ্ সেবা করেন।

"বত্রিশ আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভাল মতে।
মধ্যে পীত ঘৃত সিক্ত শালন্যের স্তূপ
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ।
বাস্তুক শাক পাক বিবিধ প্রকার
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর।
চই মরিচ সূক্তা দিয়া সব ফলমূলে
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।

কোমল নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্ত্তকী
ফুলবড়ি ভাজা আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি।
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর
মোচাঘণ্টা দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর।
মধুরান্ন বড়া আম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়।
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট
ক্ষীরপুলী নারিকেল পুলী যত পিটা ইষ্ট।
বত্রিশ আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দৃঢ়।
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পুরিয়া
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া।
সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখয়ে ধরিয়া।
দুগ্ধ চিড়া দুগ্ধল কলকী* কুণ্ডিভরি
চাঁপাকলা কলাদধি সন্দেশ কহিতে না পারি।
অন্নব্যঞ্জন উপর তুলসী মঞ্জরী
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জলভরি।"

এত খাদ্য দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "আমাকে অল্প কিছু দাও, এত খাদ্য সন্ন্যাসীর উপযোগী নয়—"

---

* দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক বিশেষ।

"প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ।
আচার্য্য কহে ছার তুমি আপনার চুরি
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥"

কিন্তু প্রভু যদিও বলিলেন, "এত অন্ন খাইতে না পারি," কিন্তু তথাপিও আচার্য্য বার বার ব্যঞ্জনাদি পরিবেষণ করিতে ছাড়িলেন না—

"নানা যত্ন কৈল্যে প্রভু করান ভোজন
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য লীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ॥

এইরূপে পরে রাঘব পণ্ডিত যখন মহাপ্রভুর দর্শনে নিত্যানন্দ বসুদেব দত্ত, মুরারী প্রভৃতি সহ নীলাচলে যান, তিনি (রাঘব) একটী প্রকাণ্ড ঝালি সাজাইয়া মহাপ্রভুর জন্য নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া যান। এই সব জিনিষ রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন—

"রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥"

এই ঝালির নামই বৈষ্ণব সাহিত্যে "রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার।"

অনেক পরিপাটি দ্রব্যে এই ঝালি সাজানো হয়। কেননা, প্রভু এক বৎসর ধরিয়া ইহা উপভোগ করিবেন—

"আম্র কাশন্দি আদা ঝাল কাশন্দি নাম,
নেম্বু আদা আম্র কলি বিবিধ সন্ধান।
আমসি আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা,
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকতা।"

সুকতা অবজ্ঞার জিনিষ নয়। কারণ "সুক্তায় যে সুখ হয় নাহি পঞ্চামৃতে"। দময়ন্তী সুকুতা দিয়াছেন, গুরুভোজনে উদরে আম জন্মিতে পারে তাই—

"সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।"

তারপরে আরও কত দিয়াছেন, তাহার তালিকা এই—

"ধনিয়া মৌরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া,
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া।
শুন্ঠিখণ্ড নাড়ু আর আনপিত্ত হর।
পৃথক পৃথক বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর,
কোলিশুণ্ঠি কোলি চূর্ণ কোলিখণ্ড আর,
কত নাম লব আর যতপ্রকার আচার।
নারিকেল খণ্ড নাড়ু গঙ্গাজল,
চিরস্থায়ী ক্ষীর সার মণ্ডাদি বিকার,
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার।
শালিকাঁচুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি,
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি।"

কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া,
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ কৈল চিনির পাক দিয়া।
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস,
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।
শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া,
চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
ফুট-কলাই চূর্ণ করি ঘৃত ভাজাইল,
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল।"

এইরূপ নানা সামগ্রী তৈয়ার হইল—রাঘব ও দময়ন্তী শ্রদ্ধা করিয়া প্রভুর জন্য সব প্রস্তুত করিলেন—

"রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী,
দুহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি।"

কেবল রাঘবই যে সব জিনিষ আনিয়াছিলেন তাহা নয়। আচার্য্য আনিয়াছিলেন, শ্রীবাসও আনিয়াছিলেন—

"আচার্য্যের এই পেড়া পানা সরপুড়ী,
এই অমৃতমণ্ডা এইত কর্পূর কুপী।
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার,
পিঠা পালা অমৃতমণ্ডা পদ্ম চিনি আর।"

এই সব ও বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত ও বুদ্ধিমন্ত খাঁন আনীত নানা প্রকার জিনিষ সবই—

"শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।"

তারপরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।"
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল,
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল।
সকল দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল
স্বাদ সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া
ভোজন কালে স্বরূপ পরিবেশ যসাইয়া।"

বস্তুতঃ, রাঘবকে মহাপ্রভু খুবই ভালবাসিতেন। ছয়বৎসর পরে যে এখানে আসেন সেই ফিরিবার পথে পানিহাটিতে মহাপ্রভুর মনে একটী প্রবল ভাবের উদয় হয়। তিনি মনে করিলেন, তিনি তো নীলাচলে থাকেন, সকলেই নীলাচলে যাইতে উদ্‌গ্রীব, সন্ন্যাস গ্রহণে সকলেই উৎসুক। সংসারী পাপীতাপিতগণ কিরূপে উদ্ধার হইবে এই চিন্তাই তখন তাঁহার প্রবল হইল। তিনি রাঘবকে নিভৃতে সম্বোধন করিয়া বলেন, "রাঘব, নিত্যানন্দকে তোমরা আমারই ন্যায় জ্ঞান করিবে"—

"রাঘব ! তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই
মহাযোগেন্দ্রয়ো যাহা পাইতে দুর্লভ
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা হইবে সুলভ॥
এতেক কহিয়া তুমি মহাসাবধান
নিত্যানন্দ যে হেন ভগবান।"

তারপরে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার পরে কিছুদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে সুখে বাস করিয়া একদিন বলিলেন, "দাদা, আমি তো নিজ সুখ লইয়া কাল কাটাইতেছি। দেশের সকলে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহাদের জন্য বড় আকুল, তুমি নবদ্বীপে গিয়া সেখানে মহাকার্য্য কর—

প্রভু বলে
শুন নিত্যানন্দ মহামতি
সত্বরে চলহ তুমি গৌড় দেশপ্রতি
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আছি নিজমুখে
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব' প্রেমসুখে

তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে
তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।"

অতঃপরে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ গৌড়দেশে গিয়া প্রথমেই পাণিহাটি আসিলেন—

"হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রী অনন্তধাম
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রাম।
রাঘব পণ্ডিত গৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয়া
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈঙা।"

সেখানে সকলে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন এবং পরে

"খট্যায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ।"

তারপরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু মালা চাহিলে রাঘব অক্ষমতা জানাইলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন এবং সেখানে রাঘব

জম্বীরের বৃক্ষে কদম্ব পুষ্প দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সিংহাসনে বসিতেন, আর—

"যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান
সভাতে হইল সর্ব্বশক্তি অধিষ্ঠান।"

জ্ঞানচক্ষে তাঁহারা নৃত্যসময়ে গৌরাঙ্গদেবকে দেখিতে পাইতেন। এইরূপে তিনমাস কালপর্য্যন্ত পাণিহাটী গ্রামে ভক্তির স্রোত বহিয়া গেল।

"এই মত পাণিহাটি গ্রামে তিনমাস,
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস।"

অতঃপরে তিনি খড়দহ, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, শান্তিপুরে নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সপ্তগ্রামে উদ্ধরণ দত্ত ও অন্যান্য সুবর্ণগণকে তিনিই কৃপা করেন।

নিত্যানন্দ প্রভু যখন পাণিহাটিতে লীলাপ্রকট করিতেছিলেন, আমাদের পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথ দাসের মহাপ্রভু দর্শনের জন্য ক্রমেই ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু পিতামাতা, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়েন না। তারপরে রঘুনাথ পাণিহাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বেদীর উপরে বসিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে সূর্য্যকিরণ উদ্ভাসিত হইতেছে, ভক্তগণ উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপদেশাবলী শুনিতে শুনিতে যেন ভক্তিরসামৃত পান করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ

"দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা কতদূরে।"

নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন—

"নিকটে আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥
দধিচিড়া ভক্ষণ করাহ মোরগণে
শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথ মনে।"

রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ লোকজন সপ্তগ্রামে পাঠাইয়া ভক্তমণ্ডলীর জন্য নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনাইলেন। অচিরে চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ ও কলাতে স্থানটী ভরিয়া গেল।

"চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর কলা
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা।"

এদিকে মহোৎসবের নাম শুনিয়াও চতুর্দ্দিক হইতে জনসঙ্ঘ আসিয়া গঙ্গাতীরে সমাগত হইল। মহোৎসবে অসংখ্য লোক আসিল, গঙ্গাতীরে ভুরিভোজন হইতে লাগিল এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ধ্যানে মহাপ্রভুকেও মহোৎসবে আনাইলেন। ইহাই রঘুনাথের দণ্ডোৎসব বা চিড়া মহোৎসব।

এই রঘুনাথই অবশেষে পরম বৈরাগী হইয়াছিলেন।

এই মহোৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় নিম্নলিখিত ভাবে পাণিহাটি গ্রামের এই মহোৎসব কীর্ত্তন করিয়াছেন ঃ—

"মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন
আসিতে লাগিলা লোক অসংখ্য গণন

আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল
শত দুইচারি দোলনা তাহা আনাইল
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচসাতে
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা।"

তারপরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উচ্চ বেদীতে উপবিষ্ট হইলেন, আর আর প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই উপরে বসিলেন। তন্মধ্যে রামদাস, সুন্দরানন্দ দাস, গদাধর, মুরারী, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জুর, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস, গৌরীদাস হোড়, কৃষ্ণদাস, উদ্ধরণ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। আর নিত্যানন্দ মহাপ্রভু—

"গুণি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র পাইলা
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা
দুই দুই মৃৎ-কুণ্ডিকা সবার আগে দিল
একে দুগ্ধ চিড়া আর দধি চিড়া কৈল
আর যত লোক সব চৌতারা দালালে
মণ্ডলী বন্ধনে বসিলা নাহিক গগনে

একেক জনারে দুই দুই দোলনা দিল
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া হইতে ভিজাইল
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া
দুই হোগলায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া
তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন
জলে নামি দধি চিড়া করয়ে ভক্ষণ।
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে
বিশজন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে।
হেনকালে আইলা তথায় রাঘব পণ্ডিত
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত
নিস্‌কড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা
প্রভুকে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা॥
প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল
ইহা উৎসব কর ঘুরে প্রসাদ রহিল
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুকে আনিল
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা
সকল কুণ্ডী হোগলার চিড়া একেক গ্রাস
মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঙা
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া

কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন প্রভাগ্যবানে।”

এই দুইটি মহোৎসব গৌরাঙ্গলীলার অপরূপ প্রতীক। গৌড়জন পাণিহাটী তীর্থস্থানের মহোৎসব দুইটিতে যোগদান করিলে গৌরাঙ্গলীলায় কতক আভাস পাইবেন। আজ আমরা ইহা বর্ণনা করিয়া ধন্য হইলাম।

পাণিহাটী দুইবার আসিবার পরে গৌরাঙ্গদেব অতঃপরে আর বাঙ্গলা দেশে আসেন নাই। সম্বলপুরের রাস্তায় তিনি একবার কাশী, প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন থাকিয়া নীলাচলেই চলিয়া আসেন এবং অবশিষ্ট ১৮ বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়াই লীলা প্রচার করেন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু গোপীনাথের মন্দিরে অন্ত্যলীলা সাঙ্গ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন।

গিরিশচন্দ্র *

গিরিশচন্দ্রকে যে দিক দিয়া দেখি সেই দিকেই তাঁহার বিশালত্ব উপলব্ধি হয়। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন কিরূপ সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ উত্থানপতন, সুন্দর ও কুৎসিতের ভিতর দিয়া ক্রমে তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদপ্রান্তে সমর্পিত করিয়াছিল, এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্যক্ বলিতে পারেন—তিনি এখনও জীবিত। শেষ জীবন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দানীবাবু ও তাঁহার ভাগিনেয় দুর্গা বাবু ও অন্যান্য বন্ধুগণ অবগত আছেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণই সবিশেষ বলিবার অধিকারী এবং এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত স্বামী অভেদানন্দ মহাশয় এখনই আপনাদিগকে অনেক কথা শুনাইবেন। তাঁহার নটজীবন সম্বন্ধে আমি কোন বিষয় অবগত নহি, তাঁহার সঙ্গী ও বন্ধু, নর-কুল-শেখর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ই তাঁহার অভিনয়-কুশলতা ও রঙ্গজীবন সম্বন্ধে বলিবার সম্যক্ অধিকারী। কেবল এইটিই আমার মনে হয় বরণীয় নাট্যকলাকে দেশবাসীর নিকট আদরণীয় করিবার জন্য ও রঙ্গমঞ্চকে জাতীয়-মন্দিরে পরিণত করিবার জন্যই, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-পরিজন, মান-অপমান, নিন্দা-কুৎসা সব তুচ্ছ করিয়া

---

* গিরিশ স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বক্তৃতার মর্ম্ম।

তিনি ধ্যাননিষ্ঠ তাপসের ন্যায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি রঙ্গমঞ্চের এক কোণে 'নটো গিরিশ ঘোষ' ভাবে পড়িয়া থাকিলেও তাঁহার নাট্য প্রতিভায় যে বাংলা আজ গৌরবান্বিত ও বাংলার জাতীয়তাগঠনকর্ত্তাদের মধ্যে তিনিও যে একজন, সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বিবৃতি করিবার দিন আজ নয়। কেবল তাঁহার জাতীয়তার দিকটা যাহা আমার মনে আজ সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের নিকট অবতারণা করিব।

আমার খুব মনে আছে স্বদেশীর সময়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই মহা-নগরীতে নৌরজী পরিচালিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়া সেই মহাসম্মিলনীর প্রভাব প্রথমে অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কিন্তু এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সেই সময়েই 'উপেক্ষিত' রাজনীতি-সংসর্গ বিরহিত রঙ্গমঞ্চ হইতে নাট্যকারের 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' অভিনয় দেখিয়া আমার জাতীয়তা শিক্ষার হাতে-খড়ি হয়। মনে হইয়াছিল পঁচিশ বৎসর যাহা শিখিয়াছি, তার আসল ফেলিয়া নকল আলেখ্যে ভুলিয়াছি; আর আজ যাহা দেখিলাম ইহাই খাঁটি সত্য। ইহার পর জাতীয়তার দিকে যদি কিছু অগ্রসর হইয়া থাকি বা জীবনে যদি কিছু করিবার সৌভাগ্য হইয়া থাকে তবে তাহা এই শিক্ষারই ফলে রঙ্গমঞ্চ হইতে সিরাজউদ্দৌলার সেই উক্তি "বাংলার সিংহাসনে আমার পরিবর্ত্তে হিন্দু কি মুসলমান অপর কাহাকেও উপবেশন করান্ কিন্তু নিশ্চয় জানবেন বিদেশী বাংলার দুষমন" আজও যেন সেই কথা আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। স্বদেশী যুগের তিনখানি নাটকেই কেবল সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তি-সাধনের জন্য জাতীয়তা মূলক

কথার অবতারণা করা হয় নাই। পূর্ব্বাপর সাহিত্যেও এই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। তখনও জাতীয় মহাসঙ্ঘ বা কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বাঙ্গলায় রাজনৈতিকগণ তখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন নাই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মাতৃ-দাসত্ব-মোচনকারী গরুড় শীর্ষক প্রবন্ধে মাতৃমন্ত্রের বীজ প্রথমে উচ্চারিত হয়। "মাতৃমন্ত্র কেবল ইউরোপেই ফলে এমন নহে বিপদ্-দীক্ষিত সম্রাট আক্‌বর ও রাণা প্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন —রাণা একজন মাতৃ উপাসক। ইতিহাসে শুনি তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয়ই অধিক গৌরবজনক। শতদ্রুসলিল কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল, পাণ্ডুগণ্ড ইংরাজ তাহা শুনিল, দেখিল এ মন্ত্র, হীন ভারতবর্ষেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই কেহই ঈদৃশ হীন নাই যিনি মনে করিলে এ মন্ত্র গ্রহণ না করিতে পারেন; তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাদিগকে হীন বিবেচনা করি? সিদ্ধমন্ত্র রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কি উহা গ্রহণ করিতেছে?" জাতীয় উদ্বোধনে এই মন্ত্রের আরম্ভ এবং 'ছত্রপতি শিবাজীতে' ইহার অভিব্যক্তি এবং এই দীর্ঘ পঞ্চ-বিংশবর্ষব্যাপী স্বদেশী প্রচারে নাট্যকার খাঁটি হিন্দুভাবেই জাতীয়তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু, অন্যের অনুকরণে নিজের স্বাতন্ত্র্য কখনও নষ্ট করেন নাই। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে 'মায়া-বসানে' তিনি সতর্ক করিয়া বলেন, আমি ইংরেজের অনুকরণের বিরোধী, ইংরেজের উপযোগী, ভারতের পক্ষে অহিতকর। ইহার পরে বিজাতীয় ভাবে দেখিলে ব্যথিত হইয়া তিনি অক্ষেপ করিতেন। "বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন। হিন্দুর হিন্দু পরিচ্ছদ নাই, হিন্দুর অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দুভাবে সদালাপ নাই।" আজ যে মহাত্মা

গান্ধী ভারতবাসীকে এই কুশিক্ষা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সম্মুখে এইরূপ জাতীয়তা ও আড়ম্বরশূন্য জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গবাসীকে তিনিও কিন্তু বিশেষ কিছু নূতন শুনাইতে পারেন নাই। কি স্বদেশী প্রচার কি আদালত-বর্জ্জন কি তাঁহার প্রেম, সত্য ও অহিংসা বাঙ্গালীর কাছে কোন শিক্ষাই একেবারে নূতন নহে। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর পত্রে পত্রে এ আদর্শ আমরা জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই। "মায়াবসানের" নিম্নলিখিত ছত্রে এই ভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়—

মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন, বড়লোকেরা একত্র হয়ে, যে মদ খাবে তাকে সামজিক শাসন করুন। নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপর দেখছেন দীন দরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজি চালে চলে আয় অনুসারে ব্যয় কর্‌তে পারে না, তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। এমন কুটির নাই যেখানে মদের বোতল সাবান এসেন্স নাই। যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন—সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন। পরিমিতাচারী হতে বলুন। বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে সেই টাকায় দীন দরিদ্রের সাহায্য করুন।"

উকীল এবং আদালত সম্বন্ধেও গিরিশচন্দ্রের অভিমত মহাত্মা অপেক্ষাও কম তীব্র নহে। মায়াবসানে কালীকিঙ্করের মুখে গিরিশ দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন "গ্রাম পল্লী সহর মোকর্দ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোক একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়েৎ ক'রে মোকদ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন। তাতে বিস্তর জাজের মাইনে কমে যাবে, কোর্ট-ফি বেঁচে যাবে, কৌন্সিলীরা যে কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে সে টাকা দেশে থাক্‌বে।

চরক বলেন 'যে দেশে উকীল প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহার-জীবির সংখ্যা-বৃদ্ধি মারীভয়ের অন্যতম কারণ। এই ব্যয় আপনাদের হাতে আছে এইটে আগে করুন।"

স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি সমানেই স্পষ্ট। দেশীয় শিল্প কেন বিনষ্ট হইয়াছে, কি উপায়ে আবার উহার পুনরুত্থান হইবে পূর্ব্বে শিল্পের জন্য এই দেশ কত সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল ছিল, কেন আমরা আত্মনির্ভরতা শিখিতেছি না সেই করুণ-কাহিনী কবি "মহাপূজায়" গাহিয়াছেন—

"কিন্তু এই দুঃখ মনে ভারত সন্তানগণে
কোনমতে শিখিল না আপন নির্ভর
শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে' তব শ্বেত পুত্র দ্বারে
পরিধেয় বস্ত্রতরে অধীন সকলে
শ্বেত পুত্র শিল্প বলে গৃহে দ্বীপ জলে।
লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন
তব পুত্র হতে তারা ক্রয় করি আনে
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে।
প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী নানা বিদ্যা দিল সতী
করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন পুর?
সুজলা-সুফলা বামা, ফলে ফুলে সাজে শ্যামা
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্ব্বল।"

কি কারণে দেশীয় শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া দীন প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে গিরিশ চন্দ্র তাহাও প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—

বৃটোনিয়া—

"বল সতি, কি কারণে, ভারত সন্তানগণে
এতদিন শিল্পবিদ্যা করনি প্রদান
চিরদিন শিল্পে জান উন্নতি সোপান ?"

সরস্বতী—

"অনুমতি মম প্রতি, কর নাই ভাগ্যবতী
রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়
সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।
ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত শিল্প তেজ হত
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ
ভারতসন্তানে দেহ আশ্বাস বচন।"

১৬৯৭ খৃঃ অব্দের হীরক জুবীলিতেও এই ভাবের সুস্পষ্ট আভাষ দেখিতে পাই—"ভারতে কিছুরই অভাব নাই কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব, **লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিভারপুলের ভিক্ষুক।** যে ভারত-প্রস্তুত কাপড় জগদ্বিখ্যাত, পূর্ব্বতন রোমে যাহা বিক্রয় হয়েছে সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন"।

মহাপূজায় এই কথা পাই—

"চিকণ বসন তবে, রোম আসি তব ঘরে
জানাইতে বরদে তোমায় প্রয়োজন।"

জাতিভেদ ও হিন্দু মুসলমান অনৈক্যের সম্বন্ধেও নানাস্থানে তাঁহার উক্তি দেখিতে পাই। "জাতি ভেদ বুদ্ধি শত্রুর বাহু বলবান করে। স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্যমাত্রেই একজাতীয় স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। **যে স্বাধীন-চেতা—তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই।** ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করে।" এবং এই সঙ্কীর্ণতাই ভারতের অবনতির যে একমাত্র কারণ তাহা "সৎনামে" গিরিশ বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামবাসীগণকে রণেন্দ্র বলিতেছে "মেরু শর, উপত্যকা ও বিশাল প্রান্তরে হিন্দুর বীরত্বগাথা অঙ্কিত রহিয়াছে" কিন্তু—

"হিন্দুর পতন
অনৈক্য কারণ
দ্বেষহিংসা পরস্পরে
উচ্চ নীচ জাতি অভিমান।"

অথচ "সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্যজ্ঞান"। সামান্য আচারভ্রষ্ট হইলেই হিন্দুত্ব যায় না। এই প্রকার জাতীয়তা মূলক কত অসংখ্য উক্তি গিরিশ চন্দ্রের বিরাট গ্রন্থরাশির পত্রেপত্রে, তাহা লেখনীতে শেষ করা কঠিন। কিন্তু—গিরিশচন্দ্র কি কেবল কতকগুলি নীতিকথার আবৃত্তি করিয়াই দেশপ্রীতি জানাইয়াছেন? তিনি বলেন "হিন্দুর মর্ম্মস্পর্শ না করিয়া

জাতীয়তা বিস্তারে দেশনায়ক কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। হিন্দুর বৈশিষ্ট্য—ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া না হইলে হিন্দুর জাতীয়-জীবন উন্নত হইবার কোন আশা নাই। জাতীয়তা ধর্ম্মেরই এক অঙ্গবিশেষ হিন্দুকে তাহা না বুঝাইতে পারিলে জাতীয়তার উদ্বোধন অসার হইবে দেশবন্ধুও বলেন Nationalism is another form of Religion ...দৃষ্টান্ত স্বরূপ গিরিশচন্দ্র ফকিররামের মুখে যে ধর্ম্মাশ্রিত জাতীয়তার আরোপ করিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিতেছি "এমন হিন্দু বিরল যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না আত্মরক্ষা স্বদেশ রক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করে না, কিন্তু যখন দেখে মুসলমানেরা দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন কর্‌ছে তখন হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা করে দেবদেবী লয়ে পলায়ন করে ; দেখা যায় সে সময় তাহাদের মুসলমান ভয় দূর হয়। তুমি যদি উপদেশ ও আদর্শ দ্বারা বোঝাতে পার যে মাতৃভূমির নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা—অপঘাত নয় ; কাশীতে মৃত্য অপেক্ষা শ্রেয়, বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যে অস্ত্রধারণ ক'র্ত্তে প্রস্তুত হয়।"

পুনরায় স্বদেশভক্ত চরণ দাসের মুখে তিনি বলিতেছেন—

"মৃত্যুভয় হিন্দুর নাই, বাঙ্গালী বলে' একজাতি হিন্দু আছে, জগৎ জুড়ে যাদের ভীরু ব'লে জানে, তাদেরও দেখছি মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাহ্নবীতীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জান ? পাছে অপঘাত মৃত্যু হয়। হায়, হায়, যদি এই সংস্কার দূর হয়, যদি গীতার প্রকৃত মর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা হ'লে বুঝতে পারবে যে আত্মরক্ষার জন্য স্বজন রক্ষার জন্য যুদ্ধেক্ষেত্রে প্রাণ দিলে কোটি কোটি জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায় হায় এ ধারণা হিন্দুর

হৃদয়ে স্থান পেলে ভারত অজেয় হ'তো। অযথা, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় দেশ উৎসন্ন গেল।"

হিন্দুর জাতীয় জীবন কিরূপ ত্যাগ, সেবা ও ধর্ম্ম-শিক্ষার উপর নির্ভর করে গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথানুসরণ করিয়া ভ্রান্তি, বলিদান শান্তি কি শান্তি ও মিরকাশিমে তাহা দেখাইয়াছেন। আবার সমস্ত জাতীয়তার মূলই ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম ও পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত নাটকে কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন, পূর্ণচন্দ্র, কালাপাহাড়, নসীরাম, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল ও অশোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

"গিরিশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকার, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি এ যুগের আদর্শ নহেন। মহৎ কবি সেক্সপিয়রের ধারা হিন্দুজাতির ধর্ম্ম স্পর্শ করে নাই। ইহলোক-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্ত্য জাতির সকল কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের মূলে নীতি ও পুরুষকার। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে ধর্ম্ম, পরলোক, ঈশ্বর-নির্ভর প্রভৃতি এবং ইহাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। যেখানে অতীন্দ্রিয় জগৎ, সেক্সপিয়র সেখানে মূক, গিরিশচন্দ্র সেখানে মুখর। এইজন্যই গিরিচন্দ্রের প্রায় মুখ্যনাটকেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ঈশ্বর-বিশ্বাস, নির্ভরতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং মুক্তির কথা। হিন্দুর জাতীয় ভাবের দিক হইতে গিরিশচন্দ্রের আলোচনা করিলে তাঁহাকে ঠিক বুঝা যাইবে।"

অসামান্য গুরুভক্ত একান্ত নির্ভরশীল গিরিশচন্দ্রই গাহিতে পারেন।

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে
যেখানে যাই সে যায় পিছে

আমায় ব'ল্‌তে হয় না জোর ক'রে
মুখখানি সে যত্নে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে
রাখে কত আদরে
আমি জান্‌তে এলেম তাই
কে বলেরে আপন রতন নাই
সত্যি মিছে দেখ না কাছে
কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে।"

আবার—

ভগবানের রূপ কল্পনা করিতে করিতে তদ্‌গদ চিত্ত হইয়া কখনও 'এক' কখনও বা 'বহু'র উপাসনা করিয়াও তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে পারেন—

"চিন্তামণি কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয় করা, ভক্ত মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা
কভু ধরে বাঁশী, ব্রজবাসী
বিভোর সে তানে
কভু রজত ভুধর
দিগম্বর জটাজুট শিরে

নৃত্য করে বম্ বম্ বলি গানে
কভু রাস রসময়ী প্রেমের প্রতিমা
সে রূপের দিতে নারি সীমা
প্রেমে চলে বনমালী গলে
কাঁদে বামা কোথা রাধাশ্যাম ব'লে
একা সাজে পুরুষ-প্রকৃতি—
বিপরীত রতি কেহ শব কেহবা চঞ্চলা
কভু একাকার
নাহি আর কালের গমন
নাহি হিল্লোল কল্লোল—
স্থির স্থির সমুদায়—
নাহি নাহি ফুরাইল বাক্
বর্ত্তমান বিরাজিত।"

শেষোক্ত অবস্থা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা—আমি আমার নাই, তুমি তোমার নাই, ভবিষ্যত নাই, দিক্ নাই দেশ নাই, রূপ নাই, নাম নাই, সব স্থির, যেন শিব শব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন—কেবলানন্দরূপং আনন্দং, আনন্দং সর্ব্বত্রমানন্দনং।

———

সমাজ সংস্কারে শরৎচন্দ্র*

(১)

মুন্সীগঞ্জে বিগত সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে সন্দেহ হওয়ায় বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। "সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির আবেগেও বাণীর মন্দির-পথ সমাচ্ছন্ন হ'তে পারে", শরৎবাবুর এই অনুশাসন সত্ত্বেও আমি যে লেখনী ধারণ করিলাম, শরৎবাবুর সহজ সরল ভাষা বুঝিতে না পারার জন্য, তাঁহাকে কটূক্তি করিবার অভিপ্রায়ে নহে। শরৎবাবু নিজে না বলিলেও আমরা অস্বীকার করি না যে তিনি "প্রাচীন, তাঁহার চুল ও বুদ্ধি উভয়ই পাকিয়া গিয়াছে," তাই ভরসা হয়, তিনি আমার ন্যায় অর্ব্বাচীনের অপরাধ লইবেন না।

শরৎবাবু বলেন, বঙ্কিম প্রভৃতি সহিত্যিকগণ তাঁহাদের কাজ সারিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন ও এখন নবীন সাহিত্যিকগণের দিন আসিয়াছে। তাহাদেরই অগ্রণীস্বরূপ শরৎবাবুর "অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের" দ্বারা তিনি মনে করেন, নবীনের দল আজ জয়যুক্ত, আর তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেন "তাদের যাত্রাপথ যেন উত্তরোত্তর সুগম ও সাফল্যমণ্ডিত হয়"।

---

* ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে সাহিত্য-শাখার সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস অভিভাষণ।

এই প্রসঙ্গে শরৎবাবু প্রাচীন ও নবীনের পার্থক্য দেখাইয়া আরও স্পষ্ট-ভাবে বলিয়াছেন "উভয়দলের অনৈক্য ঘটিতেছে এখন ভাষা, ভাব ও আদর্শে"। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই চেষ্টায় তৎকালীন সাহিত্যিকগণ সহানুভূতি প্রকাশ না করায়, সেই নবোদ্গত ভাবধারা আজ প্রায় এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তা যদি না হ'ত এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন সকলই তাঁহাদিগকে সহ্য ক'রতে হ'ত সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক অবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। কিন্তু যাঁরা (অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি প্রাচীন সহিত্যিকগণ) এখন বিগত, যাঁরা সুখ দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড় ? আর যাঁরা (শরৎবাবু প্রভৃতি নবীন সাহিত্যিকগণ) জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জ্জরিত তাদের কামনা কি কিছুই নয় ? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ ক'রে থাক্‌বে ? তরুণ সাহিত্য শুধু এই কথাটাই বলতে চায়। তারা না বল্‌লে বল্‌বে কে ? আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হ'তে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অতি অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। গতি তার ভবিষ্যতের পানে। আজ যাকে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌছায় নি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তার কাছে তার সম্বর্দ্ধনার পথ আছে।"

শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস করিব না; কারণ কোন জিনিষই চিরন্তন প্রথা মানিয়া কাঁটায় কাঁটায় চলিতে

পারে না। প্রতি অনুষ্ঠানেই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী এবং 'সময়' কেহই অমান্য করিতে পারে না। (কিন্তু এই বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গেই শরৎ-সাহিত্যের কোথাও ত নবীনের নির্ভীকতা দৃষ্ট হয় নাই। স্পষ্টভাবে বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে কোথাও যুক্তি নাই, সংস্কার প্রয়াস কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না এবং সমাজ ভয় অতিক্রম করিয়া তিনি আমাদিগকে নূতন কোন সত্যই দিতে পারেন নাই।) অথচ তিনি আরম্ভ করেন ভীষণ কশাহস্তে, এবং গতি তাঁর অপ্রতিহত—ভবিষ্যতের পথে! কিন্তু ক্ষুব্ধ আমরা 'শতকোটি-বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগে ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রাপথের সীমা আজও তেমনি সুদূরে।' * দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি চরীত্রহীনে সাবিত্রী সতীশকে সেই মেস্ হইতে ভালবাসিয়াও বিবাহ করে নাই, বিধবা কিরণ্ময়ীর অন্তরের গুরু উপেন্দ্র যাহাকে প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়া সে তাহাকে সর্ব্বদা ধ্যান করিত; 'শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা মানুষ হইয়া যাহা পায় নাই, কিন্তু কিরণ্ময়ীর রত্ন যে উপেনের তুলনা নাই, এবং যে দুটী নরনারীর যে গোপন সম্বন্ধ কিরণ্ময়ীর স্পষ্টোক্তিতে ঝাপ্সা জ্যোৎস্নার ইঙ্গিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, হাওয়া উঠিয়াছে মেঘ দ্রুত সরিয়া যাইতেছে' * ... ... — অথবা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া যে দিবাকরকে লইয়া কিরণ্ময়ী সধবা সাজিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, সাধারণের নিকট যাহাকে স্বামী বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা করে না, বাহু জড়াইয়া নিভৃতে একশয্যায় শয়ন করিতে কিছুমাত্রও সঙ্কোচ নাই, অথবা যে সতীশ, কিরণ্ময়ীর অপেক্ষা সুন্দরী আর কাকেও দুনিয়ায়

---

* এই কথাগুলি শরৎবাবুর অভিভাষণ হইতেই উদ্ধৃত।

দেখে নাই, সামান্ত পরিচয়েই "এক সঙ্গে বসিয়া লুচি বেলিতেছেন ও ভাজিতেছেন, থালিবাড়ীতে রান্নাঘরে গিয়া প্রথমে এম্‌নিধারা ঠোকাঠুকি ও সংঘর্ষের উত্তাপটা শীতল হইয়া গেল," * ইহাদের কাহারও সহিত কিরণ্ময়ীর বিবাহ হয় :নাই। হয়ত তিনি বলিতে পারেন উপেন্দ্রনাথ কৃতদার, সতীশ অন্যাসক্ত, দিবাকর নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া তাহার উপর কিরণ্ময়ীর শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু 'পল্লীসমাজে' রমেশ ও রমার বিবাহ হওয়াতে ত কোনই বাধা ছিল না। আবার "বড়দিদি"তে একনিষ্ঠ প্রেমিক সুরেন্দ্র রায় ও তদানুরক্তা মাধবীর মিলনেই বা দোষ কি হইত? বরং আমরা দেখিতে পাই "পথনির্দ্দেশ" গল্পটিতে, যদিও বা বিধবা হেমের বিবাহ দিতে হেমের মা ও গুণী উভয়েরই ইচ্ছা ছিল, গুণী নিজেও সমাজের বড় ধার ধারিত না, এবং হেম ভিন্ন তার অপর আর কেহ আপনার ছিল না, সেখানেও তিনি উপসংহারে 'অতৃপ্ত বাসনার' এক লম্বা .বক্তৃতা আওড়াইয়া একটা মূল্যবান জীবনকে মারিয়াই ফেলিলেন। বক্তৃতায় আদর্শের ধারা নির্দ্দেশ করিলেও শরৎবাবুকে কার্য্য কালে কিন্তু আমরা কিছুই করিতে দেখি না, অথচ ঐ প্রাচীন ভ্রান্ত, "আর্টের গুরুমহাশয়" বঙ্কিমবাবু, সেই যুগেই বিষবৃক্ষে বিধবা কুন্দকে সমাজের কোন বাধা না মানিয়া সপত্নীক নগেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন; উত্তর হইতে পারে—বিষবৃক্ষে কবি বিধবা বিবাহের কুফলই দেখাইয়াছেন। কিন্তু অভূতপূর্ব্ব সংস্কার কার্য্যে পরিণত করা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আর কাহার সৎসাহসে কুলায়? সংস্কার একটা পথ দেখাইয়া দেয় মাত্র কিন্তু সেই সূত্র ধরিয়া অবস্থান্তরে পরিণাম হয়ত সর্ব্বত্র কুন্দের মত বিষময় নাও হইতে পারে। আর বঙ্কিমবাবু অন্যদিকও ত

উল্লেখ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয় ত প্রমাণ করিয়াছেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। সমাজ? যে গ্রামে আমিই সমাজ সেখানে আমাকে কে সমাজচ্যুত করিবে? এই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধও নয়, কারণ যাহা অধিকাংশ লোকের অহিতকর—তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তবে সূর্য্যমুখী? সেইই ত এই বিবাহের ঘটক।" অতঃপর উপন্যাসে বিবাহের পরিণাম বিষময় হইলেও, ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই জানিতেন যে সর্ব্বত্র কুন্দের মত মুখচোরা মেয়েরই বিবাহ হইবে না। কেবল বঙ্কিমবাবুই নহেন, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সংসার ও সমাজ নামক উপন্যাসদ্বয়ে বিধবা বিবাহের অনুকূল যুক্তি তর্ক ও তাহার সুখের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রাচীনের মধ্যে আরও একজন তাঁহার নাটকে বিধবা-বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। হয়ত নূতন দলের অনেকে তাঁহার নামে বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন না, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব এতই প্রসার লাভ করিতেছে, যে আমরা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দেখিব বাংলার সাহিত্য-গগণে তিনি একদিন 'একচ্ছত্রের' প্রাধান্য লাভ করিবেন। গিরিশচন্দ্র "শাস্তি কি শাস্তি"তে প্রমদার বিবাহ সংঘটন করিয়া বিধবা বিবাহের দোষগুণ আলোচনা করিয়াছেন। নাটকখানিতে তিনি বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য প্রমাণিত করিলেও অন্যদিকেও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন নাই। প্রসন্ন কুমার বলিতেছেন "হৌক শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, হৌক দেশাচার বিরুদ্ধ, বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীনে থাক্‌বে, ভ্রূণহত্যা হবে না, কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবে না একেবারে ঘৃণিতা হবে না।" প্রসন্নকুমারের স্ত্রী পার্ব্বতী জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধসংস্কারে যদিও তাতে বাধা দিয়া বলিতেছেন—

"কেন বিধবাদের মধ্যে কি সতী নাই ? ইন্দ্রিয় কি এতই দুর্দ্দম যে নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণে দমিত হয় না ?"

তিনি এইরূপ আদর্শ সাধারণে প্রযোজ্য নয় বলিয়া তৎক্ষণাৎ সমাজের স্বরূপ অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছেন—

"শিবপূজার যোগ্য নির্ম্মল ধুতুরা বিলাস সজ্জিত সংসার উপবনে সর্ব্বদা ফোটেনা। স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয়। আর ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কিনা, তোমার সন্দেহ আছে ? পুত্রশোকাতুরা নারী বৎসর না ফিরিতে আবার পুত্র প্রসব করে, ইন্দ্রিয় তাড়নায় উপপতির দাসী হয়, শোণিত সম্বন্ধ বিচার করে না।"

প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই সাহিত্যের পবিত্র ভিত্তি রক্ষা করিয়া প্রাচীনেরা সর্ব্বদাই সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন আর প্রাচীনের প্রতি সতত আক্রমণে যে নবীন শতমুখ, সেই নবীনের মুখপাত্র শরৎচন্দ্র সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ভয় করিয়া, সমাজ-সংস্কারে কোনরূপে প্রাচীন গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কারে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া, প্রাচীনের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া নিজে পরিস্কার থাকিতে সর্ব্বদাই সতর্ক। অথচ খেয়ালমত শরৎবাবু যে কিছু নূতন বিপ্লব ঘটাইতে পারেন এমনও ত অনেক সময়ে দেখা যায়। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিব।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আজকাল সর্ব্বত্রই এককথা শুনিতে পাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে কেবল সমাজই যে বিরোধী আমাদের তাহা মনে হয় না। হিন্দুসমাজ যেরূপ উদার তাহাতে বিধবা-বিবাহে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অন্ততঃ গত বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ সমাজচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে

হয় না। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। বর্ত্তমান সময়েও আর্য্যসমাজ, বিধবা-বিবাহ-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসরেই অনেকগুলি বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিও অচল আছে বলিয়া জানা নাই। একদিন নবম বৎসরে যে সমাজ গৌরীদানের ব্যবস্থা করিত, সময়ের আবর্ত্তনে আজ সেইখানেই পঁচিশ বৎসরে বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে সমাজের কোন সঙ্কীর্ণতা দৃষ্ট হয় না। তবে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলি অনতিক্রমনীয় বাধা আছে। প্রথম, পবিত্র ভারতভূমে আজও ব্রহ্মচারিণী বিধবার সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে। আমাদের এই দেশ কেন, যে সব দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, সেখানেও ব্রহ্মচারিণী বিধবারই গৌরব অধিক। তবে একথাও ঠিক, সকল অবস্থায় এই নিয়ম সমাজে চলে না। আজ সে আদর্শ নাই, সে পবিত্র শিক্ষা নাই, সে একান্নবর্ত্তিতা নাই। বিধবার অবস্থা পরিবারে আজ বড়ই হেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় যদি কোন বিধবা নববিবাহিত জীবনযাপন করিয়া উহা সার্থক করিতে চায়, কাহারও তাহাতে প্রতিকূলতা করিবার অধিকার নাই, কারণ তাহাতে সমাজেরই মঙ্গল; কিন্তু বিধবার নিজের ইচ্ছায়ই কি জীবনে সর্ব্বদা সফলতা লাভ হয়? অনেক সময়ে দেখা যায়, বিধবাকে দরদ দেখাইয়া, ভালবাসিয়া, সহানুভূতি করিয়া অনেক কলির চেলাই তাহার সম্মুখীন হয় কিন্তু কার্য্যোদ্ধার হইলে পলায়ন করিতেও বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে তাহারাই পথ খোঁজে; স্বামীভ্রমে যে বিধবা দুইদিন পূর্ব্বে যে প্রেমাস্পদকে দেহদান করিয়াছিল বিবাহপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেই সেই পাষণ্ডই বিপন্না বিধবাকে লাথি মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া

নিজেকে লোকের কাছে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে না। এইজন্যই দেশে এত ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা প্রভৃতি পাপের ভীষণ প্রবাহ। এইত বিধবার শোচনীয় অবস্থা ; ইহার উপরে আবার বয়স্থা কুমারীকন্যাও একটা ক্ষুদ্র সমস্যা নয়। তবে যদি বাস্তবিকই দৃঢ়চিত্ত কোন খাঁটি মানুষ বিধবাকে যথার্থ ভালবাসিয়া বিবাহ করে, তবে তাহা শ্লাঘার কথা। কিন্তু তাহাতে অল্প ত্যাগস্বীকারের আবশ্যক হয় না। যতদিন এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রেমের যুগ না আসিবে ততদিন বিধবা বিবাহ অবাধভাবে চলিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রেম ও ত্যাগ স্বীকার "পঙ্কতিলকে" গোবিন্দ ও সন্ন্যাসী চরিত্রে পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার এই উচ্চ কল্পনা ও নির্ভীকতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

কিন্তু পরিণাম যাহাই হউক্ ; বিবাহ, সংখ্যায় যত অল্পই অনুষ্ঠিত হউক্, বিধবাবিবাহের পাত্রাপাত্রী সমাজের চক্ষে নীতির দিক্ হইতে কখনও হেয় হয় না। বিবাহ যেরূপই হউক্ কস্মিন্‌কালেও উহা নীতিবিরুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে সম্বন্ধ যতই দৃঢ় হউক্ না কেন, উদ্বাহ-সংস্কার না হইলে প্রেমিক প্রেমিকার একত্রাবস্থান কোন সমাজই অনুমোদন করে না। ইহা যে কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর ধারণা তাহা নহে, পরন্তু সমস্ত সভ্যজাতিই এই নীতির অনুমোদন করেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শরৎবাবু আজ বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াও, কখনও নির্ভয়ে সে কথা ফুটিয়া ব্যক্ত করেন নাই, অথচ প্রয়োজনবোধে সমাজ ও নীতি বিগর্হিত যৌন সম্বন্ধের সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা "শ্রীকান্তের" রোহিণী-অভয়া প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি। অভয়ার স্বামী বর্ম্মা-স্ত্রী লইয়া

বাস করিত, অভয়াকে পত্রও দিত না, স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থও পাঠাইত না। অনন্যোপায়া অভয়া রোহিণীকে লইয়া রেঙ্গুনে আসে। নৃশংস কদাকার স্বামী অভয়াকে যে ভাবে গ্রহণ করে, অভয়া তাহা নিজের দক্ষিণবাহু অনাবৃত করিয়া শ্রীকান্তকে দেখাইল—বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া বসিয়াছে। তারপরে বলিল "এমন আরও অনেক আছে যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।" ইহার পরে অনেক দুঃখ জানাইয়া অভয়া বলিতে লাগিল "একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই কি একেবারে মিথ্যা ? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে ব'লেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই ? এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছু আর আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকলেই কি আমার জীবন ফলে-ফুলে ভরে উঠে সর্থক হতো শ্রীকান্ত বাবু ? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারাজীবন ব'য়ে বেড়ান কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা ?" এই পর্য্যন্ত কোন সমদর্শী লোকই অভয়ার প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া পারে না, এবং এই পর্য্যন্ত বিষয়টি যেরূপ জাজ্জ্বল্যভাবে বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্য শরৎবাবু সকলের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অভয়ার গণিকা ব্যবহার কোন দেশেরই সামাজিক নীতি বা বিধান সমর্থন করিতে পারে না। স্বামী-গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়া আসিয়া রোহিণীকে ভালবাসিবার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই অভয়া বলিতেছে "রোহিণীবাবুকে আপনি দেখে গেছেন ? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই ? এমন লোকের

সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিন্‌তে চাই না শ্রীকান্ত বাবু, একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকেই জোর করে সারা জীবন সত্য ব'লে খাড়া রাখবার জন্যে এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দিব?" কোন সভ্যদেশের আইন এইরূপ মিলন সমর্থন করেন না বলিয়াই বোধ হয়। আইনের ডাক্তার নরেশচন্দ্রকে "শুভা"য় একটা বিবাহ ব্যাপারে অত আইনের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু সমাজনীতি বা বিধিব্যবস্থা অনুমোদন না করিলেও অভয়ার যুক্তিতে শ্রীকান্তের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল। কাঠের মূর্ত্তির মত সে স্থির হইয়া রহিল, কেননা "সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব, যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে, যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে, নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে "চুপ করে, মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিও না"।

দেখা যাইতেছে শরৎচন্দ্র যাহা সত্য মনে করেন, ইঙ্গিতে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। এই রোহিণী ও অভয়ার মিলন সংঘটন করিয়া তাহাদের জীবন সার্থক করিতে তিনি মুসলমান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রাচার করিতেও ত্রুটী করেন নাই, এবং উহাদিগকে সেই ধর্ম্মেই দীক্ষিত :করিবার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন, তবে করেন নাই, কেননা হিন্দুরা যখন দিন দিন তুচ্ছ ও হীন হয়ে যাচ্ছে, তখন অভয়ার ইচ্ছা, সমস্ত কলঙ্কের দুর্ভাগ্য মাথায় লইয়া সে নাকি চিরদিন হিন্দু হইয়াই থাকিবে।" কোন হিন্দুই অভয়াকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে না, তবে কথা এই যে কোন সভ্যদেশের সমাজই যাহা নীতিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করেন না

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তাহা ডাক্ হাঁক্ করিয়া লিখিলেও, বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি এরূপ নির্ব্বাক কেন? আর নিজে কিছু না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিকে অযথা আক্রমণ করিতেছেন কেন? তবে কি আমরা এই বুঝিব এই বিষয়ে তাঁহার চারুবাবুর মত নির্ভীকতা নাই, অথবা তিনি নিজের মনের কথাও বুঝাইতে পারেন নাই, অথবা প্রাচীনকে দোষারোপ করাই এখন কর্ত্তব্যবোধ করিয়াছেন?

অতঃপর শরৎবাবু, বোধ হয় নিজের দোষ স্খালন করিবার জন্যই বলিয়াছেন "তাই ব'লে আমরা সমাজ সংস্কারক নই, এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই"। আমার মনে হয় এই কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে কেবল আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য, ইহা সত্য নহে। শিল্পী কি স্রষ্টা নহেন? সত্য বটে তিনি সৃষ্টি করিব বলিয়া সৃষ্টি করেন না, কিন্তু তাঁহার কার্য্যই তাঁহার সৃষ্টি। আপনার ছায়াকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, মাকড়সা যে জাল বুনে সে তাহারই ভিতরকার জিনিস।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারা যদি খুব প্রবল হইত, তবে তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি একথা নিজেই বলেন "বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হবে।"

যাহা হউক্—ইহার পর স্পষ্টই শরৎচন্দ্র বলিতেছেন "কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজে উল্লেখ করি, অবিনয় মনে করে আপনারা অপরাধ নেবেন না। পল্লী-সমাজ ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা, বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব'লে, আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও ক'রেছিলেন এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে কেউ আর বিধবা থাকবে

না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয় হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্ম গ্রহণ করে না উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকু পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন বেশী কিছু করবার আমার নেই"। আমি যাহা বলিতে-ছিলাম শরৎবাবু নিজেই তাহা প্রমাণ করিতেছেন। যদি তিনি স্রষ্টা বা সমাজসংস্কারকই না হইবেন, তবে "বেদনার ঐ বার্ত্তাটুকুই পৌঁছে দিতে" চান কেন? নতুবা তিনি নিশ্চয় জানিবার আশাই বা করেন কেন যে "ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবেনা"। আর স্পষ্টভাবে না বলিয়া কেবল পৌঁছাইয়াই বা দিতে চাহেন কেন কারণ কিরণ্ময়ীর মুখে ত তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন "সত্যকে সত্যের মত ক'রেই বল্‌তে হয়। তবে মানুষ যে যার বুদ্ধির পরিমাণে বুঝতে পারে"!

যাহা হউক উদ্ধৃত কথাগুলিতে নিজের ওকালতি করিলেও ইহা যে খাঁটি সত্য নহে, একটু তলাইয়া দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। আর যদি পাঠকের এই ধারণাই হয় তবে ইহাও বিবেচনার বিষয় যে শরৎ-বাবুর নিজের উক্তি "সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে অনেক মিথ্যাকেই

হয়ত সত্য ব'লে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত ক'রে তোলার মত পাপ অল্পই আছে" এস্থলে প্রযোজ্য কিনা ?

শরৎবাবু রমেশ ও রমার ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া যে একটি গর্হিত অন্যায় করিয়াছেন, তাহা আমরা বলি না বরং মনে হয়, শরৎবাবুর এই পরিকল্পনা প্রকৃতই স্বাভাবিক, কারণ রক্তমাংসের দেহে এইরূপ ভালবাসা কখনও অস্বাভাবিক নয়, তাহা গ্রামেই হউক্ বা সহরেই হউক। তবে উভয়ের পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনার সমাধান যে হিন্দু সমাজে ছিল না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই সমাধান দুই প্রকারে হইতে পারিত (১) পরিত্রভাবে মহান্ আদর্শে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া উভয়েই সমবেত সাধনায় পল্লীর উন্নতি সাধন করিয়া,—রমেশ নিজে যাহা চাহিত ; অথবা (২) উভয়ে পবিত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমবায় শক্তি ও সাধনায় গ্রামে শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া।

দুইটী সমাধানের কোনটিতেই বিন্দুমাত্র বাধা ছিল না। ইহা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা ত আমার কল্পনায় আসে না। ঝগড়া করিয়া বা বাধা দিয়া রমার সাধ্য ছিল না, যে কর্ম্মবীর রমেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছু করিতে পারে। অন্যত্র আবার পবিত্র উদ্বাহ ব্যতীত একত্রাবস্থান গ্রাম্য-সমাজ কেন, কোন সভ্যসমাজই অনুমোদন করিত না। কোঁয়াপুর গ্রামে সঙ্কীর্ণতা, দলাদলি পরস্পরবিদ্বেষ প্রভৃতি আবর্জ্জনার বিষাক্ত বায়ুতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিলেও রমেশের কর্ম্মদক্ষতা ও ত্যাগসাধনায় (শরৎ-বাবুর এ কল্পনা নিশ্চয়ই অতি মহৎ) সেই গ্রামেই একটি নূতন সমাজ গঠিত হইতেছিল, এই পল্লী-সংস্কারে রমেশ হিন্দু-মুসলমান, মাষ্টার, ছাত্র, সকলেরই হৃদয়জয়ে সমর্থ হইয়াছিল। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী,

পরাণ হালদারের বিষ দাঁত ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল এবং স্বয়ং বিশ্বেশ্বরী ছিলেন তাহাদের প্রধানা উৎসাহদাত্রী। এই অবস্থায় রমা তাহার বুদ্ধি, আদর্শ ও অর্থবল লইয়া রমেশের পার্শ্বে আসিয়া যদি শান্তির নিশান বহন করিত তাহা হইলে কোঁয়াপুর স্বর্গে পরিণত হইতে পারিত। বিবাহেও দোষ হইত না অথবা বিবাহ না করিয়া উভয়ে পবিত্র আদর্শে গ্রামের উন্নতি করিলেও কোন মিথ্যা কলঙ্ক তাহাদিগকে কলুষিত করিত না। বিশেষতঃ একদিকে রমেশ যেমন অল্পসময়ের মধ্যে সকলের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, রমার প্রভাবও সমাজে নিতান্ত অল্প ছিল না। এই উভয়বিধ সুবিধা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র উভয়ের পবিত্র সম্মিলনে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া কেন যে নবীনের মাহাত্ম্য বাড়াইলেন না আমাদের তাহা বোধগম্য হয় না; বরং আমাদের মনে হয় রমার সমস্ত বাসনার সহিত ঐ বয়সে তাহার রমেশ, তাহার গ্রাম ও জমিদারী ছাড়াইয়া কাশীবাসের ব্যবস্থা করায় তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উপন্যাস-স্রষ্টার।

আরো একটি বিষয় ভাবিবার আছে। উভয়ের জীবন সার্থক করিতে রমা বা রমেশ কি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। বরং রমেশ উল্লেখযোগ্য দুই একটি ঘটনায় রমার জন্য কিছু স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রমাকে ত দেখিতে পাই বাল্যবন্ধু রমেশকে প্রতিপদে অপদস্থ করিতে তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। রমেশের মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, রমা পরামর্শ করিতেছে, "আচ্ছা বড় দা, এমন কর্‌তে পারনা যে কোন ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ী যায়।" রমেশ স্বয়ং আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেও রমা সে বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, বেণী ও রমা নিজের নিজের ভাগ লইতে লোকসহ হাজির হইয়াছেন, রমেশের চাকর

ভজুয়া সসম্ভ্রমে আসিয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা-জী বাবুজী বলিয়া দিলেন মা-জীকে জিজ্ঞাসা করে আয় ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কিনা, মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুট্ বাত বার হবে না" কিন্তু রমা স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক বা জেদ্ বজায় রাখিবার জন্যই হউক, উত্তর করিল, "তোর বাবুর এতে কোন অংশ নাই, যা পারে তাই করুক সে।" ভজুয়ার নামে রমাই পুলিসে ডায়েরী করায় রমেশের বাড়ীতে পুলিস ঘেরাও করে, আবার রমার মিথ্যাসাক্ষ্যেই কর্ম্মবীর রমেশের ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ব্যবস্থা হয়। শরৎবাবু বলিতে পারেন কলঙ্কভয়ে রমা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। মিথ্যাচরণে রমার মত গরীয়সী নারীর কলঙ্ক ভয় দূর হয় না, সৎসাহসেই মিথ্যাকলঙ্কের বিষ শীঘ্র শীঘ্র নিঃশেষিত হয়। তবে রমা কেন কাশী চলিয়া গেলেন? যদি রমেশের হিতার্থেই তাহাকে ছাড়িয়া কাশীবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তবেই বা তাহার জীবন পঙ্গু বিফল বা ব্যর্থ হইবে কেন? কারণ তাহার কাছে রমেশের চিন্তাই ত স্বর্গ। বিশেষতঃ তাহার কনিষ্ঠ যতীন, তাহার কার্য্য ও তাহাদের জমিদারী সবই ত রমেশের হস্তে ন্যস্ত। রমেশই বা শেষাশেষি রমাকে এইরূপ বনবাসে রাখিবেন কেন, নির্ভীক রমেশ কাশীতেই বিশ্বেশ্বরী ও রমার পরামর্শ লইতে মাঝে মাঝে যাইবেন না কেন? আমরা শরৎবাবুর যুক্তির সার্থকতা কিছুই বুঝিলাম না। আর শরৎবাবুর রচিত উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সময়ে সময়ে যেরূপ মারাত্মক হইয়া উঠে, তাহাতে বিবাহই যে একমাত্র সমাধান তাহাও ত মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বিরাজবৌর উল্লেখ করিতেছি। নীলাম্বর ও বিরাজের দাম্পত্যপ্রণয় সাধারণতঃ দুর্ল্লভ; অথচ স্বামীর একদিনের অনিচ্ছাকৃত দুর্ব্বলতাহেতু মুহূর্ত্তমধ্যে

বিরাজের তাহাকে পরিত্যাগ ও লম্পট জমিদারের পানসীতে গমন, হিন্দুসমাজে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতঃপর শরৎবাবু বলেন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নাকি সতীত্বের চেয়ে বড়, যেন স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব মনুষ্যত্বের অঙ্গ নয়! যাহা হউক এই বিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমাজ সংস্কারে শরৎচন্দ্র*

(২)

আমার গত প্রবন্ধটি পাঠেও অনেকের অনেক পাঠক সাগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া ধন্যবাদ লাভ করিয়া আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। সমালোচনাটি যে অনেক পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে আমি কৃতকৃতার্থ। কতিপয় পাঠক আবার শরৎবাবুকে সমর্থন করিয়া দু'এক বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। আমি এই দ্বিতীয় প্রবন্ধের সহায়তায় তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনে প্রয়াস পাইতেছি। অন্য বিষয়ের অবতারণা করিবার সে ইচ্ছা ছিল, মনে হয় আপাততঃ ইহাতেই তাহা বলা শেষ হইবে।

শরৎবাবু যে বাঙ্গলাদেশের শ্রেষ্ঠও শক্তিশালী ঔপন্যাসিক তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার কল্পনায় সৃষ্ট যাহা ভাল, তাহার সুযশ সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাপ্য এবং তাহাতে কাহারও ক্ষোভ না করিয়া আনন্দ লাভ করাই উচিত। আবার আর্টের নামে যাহা কদর্য্য সৃষ্টি, তজ্জন্য প্রতিবাদ করিবার সকলেরই ন্যায্য অধিকার আছে, অবশ্য যদি তাহা দায়িত্ববিহীন বা যুক্তি-বর্জ্জিত না হয়।

বর্ত্তমানে আর্ট সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই মত; একদল বলেন, যাহা কিছু সংঘটিত হইতে পারে, সে সৃষ্টিই সর্ব্বদা আর্ট নয়। আর্ট যেমন সুন্দর ও

---

* নবযুগ, ১৩৩২।

হৃদয়গ্রাহী হইবে, যেরূপ সত্য হওয়া উচিত, সেইরূপ মঙ্গলজনক না হইলে তাহা আর্টের প্রকৃত পরিকল্পনা নহে। সত্য, শিব ও সুন্দর যে শ্রেণীর লেখকগণের নিকটে আর্টের আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্ত্তী নাটকাবলীও এই অদর্শে রচিত। অন্য সম্প্রদায় বলেন সমাজের ধার না ধারিয়া, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী না হইয়া শিল্পী রচনা করিয়া যাইবেন পাঠকের চিত্তাবনোদনের জন্য, কি হওয়া উচিত, না হওয়া উচিত তিনি দেখিবেন না, ঘটনাস্রোত তাঁহাকে যেভাবে চালিত করিবে তিনি সেইভাবেই লেখনী সঞ্চালন করিবেন, বিচার করিবেন না, ফুল কেন সুগন্ধ বিতরণ করে, কেন না ফুলের সুগন্ধই আর্টের পরিকল্পনা, কেন সুগন্ধ দেয় তাহার কারণানুসন্ধান নহে; রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাবলীও এই ধারান্তর্গত। এই বিভিন্ন মতের কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টী মন্দ, সে বিচারের স্থান ইহা নহে, তবে একথা ঠিক যে স্বীয় পরিকল্পনায় শরৎবাবু কোন কোন পুস্তকে যে আর্ট সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সৌন্দর্য্য ও চিত্তবিনোদনের হিসাবে শতবার প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সমাজের ভালমন্দ হিসাব করিতে গেলে তাঁহাকে সমর্থন করিবার কিছু পাই না। বাস্তবিক পক্ষে প্রধানতঃ আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে হিন্দুসমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায় এই মীমাংসার দায়িত্ব যখন শরৎচন্দ্রের নাই, উদ্দেশ্য নিয়া লেখা যখন সাহিত্যিকের কাজ নয়, তখন তিনি ব্যাথাবেদনায় জর্জ্জরিতহৃদয়ে বিধবার বেদনার বার্ত্তাটুকুই শুধু সমাজের নিকট পৌছাইতে ব্যস্ত কেন? যদি সামাজিক বিধানে মুখাপেক্ষী হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া লিখিয়া রোহিণী ও শৈবলিনী চরিত্র খর্ব্ব করিয়া থাকেন, তবে শরৎবাবু সেইরূপ

উদ্দেশ্য নিয়া লিখিয়া সমাজকে শাস্তি দিবার জন্য রমাকে কাশী পাঠাইয়া আর্টের খর্ব্ব করিয়াছেন কিনা? যদিও আবার উদ্দেশ্য নিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া নিজেই স্বীকার করেন, এবং আশা করেন যে "ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর শাস্তিভোগ কিছুতেই মঞ্জুর হবে না" কিন্তু আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করি যে, এক অভয়া-রোহিণী প্রসঙ্গ ব্যতীত কোন সমাজিক বিষয়েই কেন তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই, এবং কোনও খাঁটি সিদ্ধান্তে কেন উপনীতও হয়েন নাই। নিশ্চয়ই এই অভয়া-রোহিণী প্রসঙ্গ কোন সামাজিক বিষয়ের অন্তর্গত নয়, কারণ কোনও সভ্যদেশের সমাজই স্বামী বর্ত্তমানে পরস্ত্রীর সহিত অবাধ-মিলন সমর্থন করে না। তবে যাহা সমাজ-অন্তর্গত নয়, তাহাতে শরৎবাবু যথেচ্ছ হইলেও, বিধবা-বিষয়ক সামাজিক প্রশ্নে সমাজকে তিনি বরাবর ভয় করিয়াছেন কেন? কেন যে তিনি নির্ব্বাক, তাহার কারণও আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছি। "গৃহদাহে" আদর্শ হিন্দুপত্নী মৃণাল, ব্রাহ্ম-সমাজের শিক্ষিতা মহিলা অচলাকে বলিতেছে "বিয়ে জিনিষটা তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম্ম, এ বস্তুটী সকল বিচার তর্কের বাইরে। তাই এটী নিত্য—জীবনে নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য, তাকে আমরা বদলাতে পারি না।" অভয়া সম্বন্ধে একবার স্পষ্ট হইয়াও পুনরায় আজন্মের অন্ধসংস্কারই তাহাকে বিবাহের নিত্য-সম্বন্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে যে বারম্বার বাধা দিয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, নতুবা বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি বরাবর কেন নির্ব্বাক থাকিবেন। আবার শরৎবাবু একবার স্পষ্টভাবে অবাধ-মিলনের পক্ষাবলম্বন করিয়াই সমাজের অনুশাসন চিরকালের জন্য যে অতিক্রম

করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাও ঠিক নহে, কারণ ঐ অভয়ার কথায়ই অবশেষে শ্রীকান্ত সমাজের ভয়ে উত্তর দিতেছে। "প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে সমাজের কাজকর্ম্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।" অতএব দেখিতে পাই স্বীকার না করিলেও এক সমাজ-ভয়েই তিনি সামাজিক কোন বিষয়ে স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে কিছুই বলিয়া যান্ নাই, এবং যেখানে অস্পষ্ট প্রয়াস দৃষ্ট হয়, সেখানেই হয় সত্য নতুবা আর্ট খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ বলেন বিবাহ না দিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়াই তিনি বিধবা-বিবাহের উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি, এইরূপ সৃষ্টি করাও সাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য নয়, কিন্তু রমা বা কিরণ্ময়ীর, মাধবীর বা হেমের বিবাহের স্বপক্ষে প্রকারান্তরে কোন যুক্তিই যে শরৎবাবু দিয়াছেন অথবা ট্রাজেডি আঁকিয়া বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন, পুস্তক কয়খানি ভাল করিয়া পড়িয়াও আমরা সেরূপ কিছু পাই নাই। রমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের মর্ম্ম ইহাও হইতে পারে যে গ্রন্থকার "শ্রীকান্তে" স্পষ্টভাবে অসঙ্গত সম্বন্ধের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়া "পল্লী-সমাজে" ইঙ্গিতে সেই জিনিষটিরই পুনরায় সমর্থন করিতেছেন। রমা যদি রমেশকে বিবাহ না করিয়াই লাভ করিত তবেও ত অভয়ার মত তাহার জীবন পঙ্গু বিফল ও ব্যর্থ হইত না। যদি সমাজ বিধবা-বিবাহের সমর্থন না করে, দোষ কি, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বিবাহ না দয়াও নরনারীর অবাধ মিলন যখন সংঘটন করেন, সমর্থনও করেন তবে ঐ ট্রাজেডি সৃষ্টি যে অবাধ মিলনের উদ্দেশ্যেই নয়, পরন্তু বিবাহের উদ্দেশ্যে, কিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব? অথবা রমার কলঙ্কঘোণার

জন্য সমাজের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদানও কি ট্রাজেডির উদ্দেশ্য হইতে পারে না? ঐরূপ ট্রাজেডি যে বিধবা-বিবাহ সমর্থনের জন্যই হইয়াছে, এরূপ কিছু উহার মূলে নাই। সুযুক্তি-সহকারে কেহ দেখাইতে পারিলে আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিব। আর যদি ইঙ্গিত দেওয়াই ঔপন্যাসিকের কার্য্য হয়, তবে শরৎবাবু কেন বলেন "সত্যকে সত্যের মত করিয়াই বলিতে হয়, তবে যে যার বুদ্ধির পরিমাণে বঝিতে পারে।" এবং সেই জন্যই বোধ হয় অভয়া-প্রসঙ্গও ইঙ্গিত না দিয়া এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন?

কেহ কেহ বলেন সাবিত্রী সতীশের মিলনের ছবি কোন দম্পতির জীবন অপেক্ষা ম্লান হইতে পারে না। আমরাও স্বীকার করি পরিণয়-হীন বাসনা-গন্ধ-বিরহিত নিঃস্বার্থ প্রেমের কল্পনা বিবাহ অপেক্ষাও মহত্তর এবং এইজন্যই আমরা বলিয়াছিলাম রমেশ ও রমার পক্ষে এইরূপ মিলনই অধিকতর শ্লাঘনীয় হইত। বিবাহ এইরূপ অপার্থিব প্রেমাপেক্ষা অনেকটা নিকৃষ্ট অবস্থা সন্দেহ নাই। শরৎবাবু যদি সাবিত্রী ও সতীশের এইরূপ পরিণয়হীন পবিত্র প্রেম ও অভয়া রোহিণীর বিবাহ ব্যতীত ঐরূপ অবাধ যৌনমিলনের সর্ব্বদা পক্ষপাতী তবে মনে হয় তিনি বিধবা বিবাহের কোন আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। এবং যদি তাঁহার মতে "মন্ত্র-পড়া বিবাহ দিলে স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়," এবং "পাড়াগাঁয়ে বিধবা-বিবাহের পুরোহিত যোগাড় করাও যদি শক্ত হয়", তবে আমরা ভুল করি নাই যে শরৎবাবু বাস্তবিকই বিধবা-বিবাহের প্রতিকূল।

অনেকে যে বলেন সমাজের ভয়ে বিধবাবিবাহ সম্ভব নয়—ইহাও সুযুক্তি নয়। বিবাহের মূলে যদি নিঃস্বার্থ প্রেম থাকে তবে তাহাতে

সমাজভয় কোথায় সম্ভব? প্রকৃত প্রেম সত্যই সামাজিক বিধানের অনেক উচ্চে। যাহাকে ভালবাসা যায়, যাহাকে লইয়া সংসার করা আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তাহার গৌরব ও সম্মানরক্ষার জন্য, ভাবী সন্তানের সম্ভ্রমের জন্য সেই প্রেমাস্পদাকে সম্মান দিতে যিনি পশ্চাদপদ, তাহার প্রেম কি বাস্তবিকই গভীর ও নিরাবিল? হয়ত দশজনের সঙ্গে একত্রে প্রীতিভোজনও তাঁহারা করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি আসে যায়? এমনও দেখা যায় যে সঙ্কীর্ণ হিন্দুসমাজই এইরূপ বিবাহের পাত্রপাত্রীকে কিছুদিন পরে ক্রোড়ে নিয়া উদারতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে সমাজে গ্রহণ করা হইত না, কিন্তু যাহারা শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করিতেন, সমাজের ব্যবহারে তাহারা প্রায়ই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ক্রমে এখন বিলাত-প্রত্যাগত কোনও ব্যক্তিই আর সমাজে অচল নাই। সমাজ গ্রহণ না করিলেও রমেশ ও রমা সমাজের কল্যাণে সর্ব্বদা আত্মনিয়োগ করিতে কি বাধা পাইত? বিশেষতঃ যেখানে গ্রামের তিনজন জমিদারের মধ্যে দুইজনে এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, তৃতীয় জমিদারের গরীয়সী মাতা তাহাদের সহায়, এবং সেখানকার সমাজ, বিশ্বেশ্বরী বলেন "যে এতই কৃপার পাত্র যে রমেশকে তাহারা চায়না বলিয়াই গ্রামে তাহার থাকা উচিত" সেখানে সমাজ-ভয়-বিরহিত উদার, স্বাধীন, বীরহৃদয় রমেশকে যে সমাজ কিছু করিতে পারিত আমাদের তাহা মনে হয় না। 'বৃষবৃক্ষে'র সমাজ ও 'পল্লী সমাজে'র সমাজ অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধান। বস্তুতঃ সমাজের কল্পিত বাধা ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে রমেশ ও রমা কোন বাধা পাইয়াছে বলিয়া পুস্তকখানিতে কিছুই

নাই, বরং নিজেরা ইচ্ছা করিয়াই তাহারা মিলিত হয় নাই, এইরূপ ইঙ্গিতই দেখিতে পাই।

প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ ত্যাগ স্বীকার কিন্তু রমা রমেশকে পাইতে বা তাহারা ভালবাসা সার্থক করিতে কিছুই করে নাই। অনেকে মনে করেন যে রমেশকে না পাইয়া রমার অতৃপ্ত বাসনার প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সে রমেশের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বাস্তবিক ইহাঁরা রমার চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই। রমা কলঙ্ক ভয়েই অনিচ্ছায় রমেশকে সর্ব্বদা আঘাত করিয়াছে। আর অতৃপ্ত বাসনার পীড়নে রমেশের প্রতি প্রতিহিংসা, প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ নহে, উহা কামজ ভালবাসা, অতি ক্ষণস্থায়ী এবং বিবাহ হইলেও ফল বড়ই বিষময় হইত, যাহা বঙ্কিমবাবু কুন্দ চরিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরিকল্পনা, পাঠক দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা চরিত্রে ও গিরিশচন্দ্রের কালাপাহাড়ের ইমান চরিত্রে পরিস্ফুট দেখিতে পাইবেন। উভয় নায়িকাই মুসলমান রাজকন্যা, দুই হিন্দু যুবককে ভালবাসিত, কিন্তু যখন বুঝিতে পারে যে প্রেমাস্পদকে কাছে পাইবে না, তাহাদের হিতসাধনই ইহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

রমা ত পুকুরে মাছ ধরিবার সময় ভজুয়ার কথাতেই বুঝিয়াছিল তাহার প্রতি রমেশের কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস! বিশ্বেশ্বরীও এই কথা অনেকবার জানাইয়াছে, আর বাস্তবিকই রমা কি জানিত না যে রমেশ তাহাকে কত ভালবাসে? তারকেশ্বরে রমা বুঝিয়াছিল যে তাহার আতিথ্যটুকু রমেশের নিকট নিন্দা সুখ্যাতির কত বাহিরে এবং রমেশ নিজে মুখ ফুটিয়া রমাকে জানাইয়াছে "ভেবেছিলাম, রমা কোন কথা তোমাকে

না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় ব'সে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে ক'রে যাব।" রমা কি ইহা বুঝিত না? বাস্তবিক এই ভালবাসাটা জানা ত শিশু ও নারীর সহজ জ্ঞান (instinct)। প্রেমিককে কাছে পাইবার যেটুকু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন ছিল সেটুকু ত শরৎবাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহার ভিতর আরও কিছু ছিল। রমা যে রমেশকে ভালবাসিত নিজের কাছে তাহা সে স্বীকার করিতে চাহে নাই। রমেশের প্রতি তাহার সমস্ত অত্যাচারই তাহার এই অন্তর্নিহিত, অস্বীকৃত, দমিত প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রমার চিত্ত যে রমেশের দিকে ধাবিত, এ চিন্তার অঙ্কুর মনে না উঠিতে উঠিতেই প্রবল আঘাতে তাহাকে দমিত করিত, কারণ পরক্ষণেই মনে হইত সে স্ত্রিবা। কাশী যাইবার সময়ও রমা, রমেশকে বলিতেছে "বিদায় দাও, রমেশদা, আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার স্বামীর কাছে যেতে পারি।" রমার ভালবাসায় নিঃস্বার্থতা নাই, ত্যাগ নাই, সহানুভূতি নাই, আছে সর্ব্বদা বিদ্রোহ। বাল্যবন্ধুর কার্য্যে সময় সময় প্রীতি একনিষ্ঠ প্রেম নহে, আর রমেশকে বিপদাপন্ন করাও প্রকৃত ভালবাসার লক্ষণ নহে।

শরৎবাবু এখানে অযথা সমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। ত্যাগনিষ্ঠ প্রেমিক রমেশ যখন বিশ্বেশ্বরীর কথায় রমার হৃদয়ের গোপন ব্যথা বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন তাহার পক্ষে রমার জীবন সার্থক করিতে কি বাধা ছিল? রমেশ যদি ইচ্ছা করিয়া তাহা না করিয়া থাকে, তাহাই কি সমাজের "খেয়ালের খেলা"? গ্রামে যদি পুরোহিত পাওয়া শক্ত হইত কাশীতে অথবা কলিকাতায় বিবাহ হইতে কি বাধা হইত? এবং তাহাদের একনিষ্ঠ ভালবাসা সার্থক করিতে অন্যত্র একজনে বিবাহিত

জীবন যাপন করিতেই বা কি বাধা হইত ? বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে অনেকেই নিজ নিজ কল্পনায়, "পল্লী সমাজ" না পড়িয়াও, অল্পাধিক পরিমাণে ভাবিয়া থাকে। কিন্তু যে সমস্ত অবস্থায় বিবাহ হওয়া উচিত, সেখানে গ্রন্থকর্ত্তা যদি রমার ন্যায় একটা মহাপ্রাণ নারীকে স্বামীর কাছে নিশ্চিন্তে যাইবার জন্য তাহার কাশীবাসের ব্যবস্থা করেন, অথবা অন্যত্র একটা মূল্যবান জীবনকে মারিতে মারিতে অতৃপ্ত বাসনার লম্বা বক্তৃতা আওড়ান, তবে স্বতঃই মনে হইবে যে তিনিও এইক্ষেত্রে নির্ভীকতা না দেখাইয়া সমাজ-স্রোতেই গা-ভাসাইয়া দিয়াছেন। শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমাদের ইহাই একটি প্রধান অভিযোগ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কি পরিকল্পনা করিয়াছেন আমরা পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা ঠিক যে বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে তাহাদের প্রতিকূল মত না থাকিলেও রূপজ মোহ তৃপ্তির জন্য অথবা অর্থলোভে সমাজনীতি-উল্লঙ্ঘনকারী স্বার্থপর ব্যক্তি যেখানে বিবাহ করিবে, তাহার ফল বিষময় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহারা সেই সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করিয়াছেন। স্বার্থত্যাগী নিঃস্বার্থ প্রেমিক ব্যতীত (কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বলেন বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি), এইরূপ বিবাহে কাহারও অধিকার নাই। এইজন্যই আমরা বিধবা বিবাহের সম্পূর্ণ অনুকূল হইলেও, যেখানে ফল বিষময় হওয়া অবধারিত, সেইখানে বিবাহের কখনও সমর্থন করিতে পারি না।

তাহার পর অভয়ার কথা। যেস্থানে অভয়ার নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আমরা শরৎবাবুর কল্পনার প্রশংসা করিয়াছি কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে নারীর কোন মূল্যই নাই। দুর্নীতির দিক্ বাদ

দিলেও অভয়ার একনিষ্ঠতার দিক্ দিয়াও। বস্তুতঃ একনিষ্ঠ প্রেম যদি সতীত্বের চেয়ে বড় হয়, তবে এদিক দিয়াও অভয়াকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। শ্রীকান্তবাবুর মুখে সে স্বামীর সমস্ত কীর্ত্তি শুনিয়াও, বার্ম্মা-স্ত্রীদের অবস্থা ও স্বভাব জানিয়াও—রোহিণীর প্রতি তাহার একনিষ্ঠতা বলি দিয়া সে যে কি করিয়া ঐ কদাকার, কদাচরী, মিথ্যাবাদী স্বামীর আশ্রয়ে নিজের সতীত্বটুকু বজায় রাখিতে গিয়াছিল, আমরা তাহা ভাবিয়া পাই না। সেই কদাকার স্বামী যদি তাহাকে আশ্রয়ই দিত—অন্ততঃ অভয়া ত সেই আশায়ই সেখানে গিয়াছিল, তবে তাহার একনিষ্ঠতা কিরূপে রক্ষা হইত? আমরা মনে করি অভয়ার এই ভণ্ডামীটুকুতেই ঔপন্যাসিক একনিষ্ঠ প্রেম দেখাইতে বিফলকাম হইয়াছেন। যাহারা বলেন রোহিণীকে নেওয়া ছাড়া আর অভয়ার অপর কোন গতি ছিল না আমরা তাহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। অবস্থার খাতিরে একজনের গলগ্রহ হওয়া একনিষ্ঠতা নহে। আর যদি সাবিত্রী ও সতীশের ন্যায় এখানেও প্রকৃত প্রেমিকের সুখকল্পনা অসম্ভব মনে হয়, শ্রীকান্ত তখন সহায় এবং যে **Forward** অভয়া রোহিণীকে রেঙ্গুণে লইয়া আসিয়াছিল, সেই রোহিণীর সহায়তায়ই অভয়া আবার বাড়ী ফিরিতে পারিত। রোহিণীর একনিষ্ঠতারও বিশেষ পরিচয় আমরা "শ্রীকান্তে" পাই নাই। কার্য্যকালে তিনিও যে এই শ্রেণীস্থ সর্ব্বসাধারণের ন্যায় একনিষ্ঠতা বিসর্জ্জন দিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" হইতেন না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

বিরাজ-বৌর স্বাভাবিকত্ব সমর্থন করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন অনেক হিন্দুনারী এইরূপ স্বামীত্যাগিনী হয়েন। বর্ত্তমান সময়ের অবস্থায় অনেকে স্বামী বর্ত্তমানেও গৃহত্যাগ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু

বিরাজের ন্যায় এত বড় সাধ্বীর পক্ষে যিনি বলেন সীতা সাবিত্রীর অপেক্ষাও সতীত্বে তিনি ন্যূন নহেন, গৃহত্যাগ অত্যন্ত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। সত্য বটে পারিবারিক অস্বচ্ছলতায় উভয়ের প্রাণ তিক্ত হইতেছিল, কিন্তু সতী-নারীর সেই সমস্ত ছোটখাটো দুঃখ দৈন্যে কি আসে যায়? অন্যের কথা নহে, আমরা এই সম্বন্ধে শরৎবাবুর কথায়ই বলিতে চাই! "আমার জীবনে যে ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েছি, সবাই তারা দুঃখের ভিতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছে"। বাস্তবিকই আমাদের মনে হয় বিরাজের ন্যায় অভিনব সৃষ্টি বিলাতী আমদানী আর্ট ভিন্ন কিছুই নয়। বিলাতী উপন্যাস পাঠ করিয়া অনেকেই যে হিন্দুর আদর্শ ভুলিয়া যান, এই চরিত্র তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন। যাহা হউক্ এইরূপ সৃষ্টিতে সমাজের কোন্ বেদনাটা হৃদয়ে পৌঁছে? স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে নারীর যথেচ্ছগমন? না, পরিত্যাগের পর অনুশোচনা এবং পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত? অনুতাপ অতি মহৎ-প্রবৃত্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই দেখা যায় গৃহত্যাগের পর প্রায় সকলেই অনুশোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই অনুতাপের পরে সকলেই কি ঘৃণিত জীবনের খোলস্ পরিহার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে? তবে বিরাজবৌএর সম্বন্ধে এই সমস্ত ব্যক্তির কোন আবশ্যকই হয় না, কারণ তাহাদের দাম্পত্য বন্ধন মনুষ্য-জীবনে সাধারণতঃ দুর্ল্লভ এবং স্বামী-ভক্তির বড়াই সে অল্প করে নাই।

সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইলেও, একনিষ্ঠ প্রেম তাহাপেক্ষা বড় এই কদর্থে অনেকে সতীত্বের গৌরব লাঘব করিয়া থাকেন। সতীত্ব যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে তাহা প্রকৃত সতীত্ব নহে এবং তাহাপেক্ষা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিশ্চয়ই বড়। কিন্তু

সতীত্ব বাদ দিয়া যে পরিপুর্ণ মনুষ্যত্ব হয় না, আর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সতীত্ব যে একটা গুণ বিশেষ একথা অনেকে বোঝেন না। সাময়িক প্রেমবন্ধন সতীত্ব নহে। সতীত্বের পরিকল্পনায় দেহজ্ঞান নাই। সতী নারীর স্বামী—জীবনে নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। নির্ভীকতা, সত্যজ্ঞান, আত্ম-সম্মান ও আত্ম-বিসর্জ্জন সতীত্বের ভূষণ। আমাদের সতী নারীর আদর্শ সীতা। শ্রীরামচন্দ্রের অন্ধানুরাগিনী ছিলেন বলিয়াই সীতা আদর্শ হিন্দু পত্নী নহেন। নারীত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ বা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বই সীতার বিশেষত্বঃ এবং সেইজন্যই সীতা আদর্শ সতী। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে তাঁহার ক্রীড়া সঙ্গিনী ছিলেন বলিয়াই সীতার কথা কেহ বড় মনে করে না। মনে করে সীতার আত্মমর্য্যাদা, তাঁহার নারীত্বের সম্মান। অশোকবনে প্রবল পরাক্রান্ত ভুবন-বিজয়ী রাবণকেও নিঃসহায়া রোরুদ্যমানা হরিণীর চক্ষুর অগ্নিতে বিফল মনোরথ হইয়া বারম্বার ফিরিয়া আসিতে হয় এবং সেই অগ্নিতেই লঙ্কা ভস্মীভূত হইয়া যায়। আবার প্রজাগণ সমক্ষে "নাহি দিব পরীক্ষা অনলে" বলিয়া পাতাল প্রবেশও এই আত্মমর্য্যাদারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাঁহারা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া সতীত্বের গৌরব লাঘব করিতে চাহেন, তাঁহার এই তেজঃস্বিতা ও আত্ম-মর্য্যাদার পরিচয় তাঁহাদের কল্পিত চরিত্রে একবার কল্পনা করুন, পরে অপর কথা শুনিব।

যাহা হউক শরৎবাবুকে কোনরূপ অমর্য্যাদা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার গুণগ্রাম সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তিনি কখনও কখনও কোন কোন চরিত্র এমন মহিমময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাঁহার প্রভাব চিরদিনের জন্য আমাদের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে; যেমন 'স্বামী' উপন্যাসে ঘনশ্যাম চরিত্র। সময় মত তাঁহার কল্পিত অদ্ভুত চরিত্ররাজীর ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি-নৈপুণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ধন্য হইব।

দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী*

সম্প্রতি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণীর" অভিনয়োপলক্ষে উক্ত নাটকের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে ও তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিমত প্রকাশিত হইতেছে। অনেকে বিশ্বাস করেন নাটকখানিতে হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দেওয়া হইয়াছে, কারণ অহল্যা হিন্দুর নিকট প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে প্রথমস্থানীয়া, এবং তাঁহাকে কুৎসিৎ-ভাবে চিত্রিত করিয়া কবি হিন্দুর দৃঢ়বদ্ধসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। অনেকে বলেন, "পাষাণী" দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য, এবং বাল্মিকীর চিত্রিত চরিত্র তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ করেন নাই, তবে যাহারা কৃত্তিবাস প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া অহল্যাকে 'পঞ্চ-সতীর' মধ্যে গণ্য করিয়া হিন্দু নামে কলঙ্ক সঞ্চার করেন, বাস্তবিকই তাহারা বিশেষ কৃপার পাত্র। তাঁহারা বলেন, "Do the signal achivements of any the five "Satees" justify her being remembered daily by decent men or women who have learnt to think even a little for themselves"?

---

*নবযুগ ১৩৩১ মাঘ। 'পাষাণী' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ফরওয়ার্ড দৈনিক কাগজের মঞ্চ সম্পাদক হিসাবে আমি যে সমালোচনা করিয়াছিলাম তাহার প্রতিবাদে কবির সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় একটী ইংরাজী প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটি দিলীপ বাবুর প্রবন্ধেরই প্রত্যুত্তর।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন :—

(১) বাল্মিকী অহল্যাকে যে ভাবে লোকচক্ষে প্রতিভাত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার (অহল্যার) প্রতি হিন্দুগণের শ্রদ্ধা হওয়া বিস্ময়কর।

(২) "পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্" শ্লোকে মনে হয় ইহার প্রণয়ণকর্ত্তা সম্ভবতঃ অহল্যা দ্রৌপদী প্রভৃতি নাম করিয়া উপহাসই করিয়াছেন (I sometimes really wonder if the composer of the sloka did not mean to be ironical)

(৩) যেমন ভীষ্ম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি অপেক্ষা বর্ত্তমানে রাম ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে অযথা সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা এতদিন ভুল করিয়াছি (we have often erred in honouring too much men like Judhistir and Rama), সীতা গান্ধারী প্রভৃতি বর্ত্তমানে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, মন্দোদরী ও তারা পঞ্চকন্যাকে সম্মান করিয়াও আমরা সেইরূপ অন্যায় করিয়াছি। এবং এখন এই পূর্ব্বকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া ঐ সমস্ত নাম বিস্মৃতির গর্ভে বিদায় দেওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে (Is it not high time to wake up to what our ideals should be, revaluing them if need be.)

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মিকীর আদর্শ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

(৫) রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অনেকেই "পাষাণী"কে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকাবলীর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

দিলীপবাবু পিতাকে সমর্থন করিয়া উপযুক্ত পুত্রের কার্য্যই করিয়াছেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। কিন্তু যাহারা

নিরক্ষর মূর্খ, "nameless non-entities", কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত যাহাদের রামায়ণ জ্ঞানের দৌড়, তাহাদের পক্ষ হইতেও কয়েকটা কথা বলিবার আছে। সম্প্রতি বাল্মিকী ও দ্বিজেন্দ্রলাল যে যে ভাবে অহল্যা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা পাশাপাশি তাহা প্রদান করিব।

মহামুনি বিশ্বামিত্র শ্রীরামলক্ষ্মণ সহ যখন মিথিলায় গমন করিতেছিলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র মিথিলার উপবনে একটী নির্জ্জন পুরাতন রমণীয় আশ্রয় দেখিতে পাইয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্, এই স্থানটী আশ্রমের ন্যায় বোধ হইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি উহাতে কোন ঋষি নাই। পূর্ব্বে ঐ আশ্রম কাহার ছিল? শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।" বিশ্বামিত্র তখন স্বল্প কথায় গৌতম আখ্যান অহল্যার তপস্যা এবং তৎপর অহল্যার সাময়িক পতন ঘটিত বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। অহল্যার সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা বিশ্বামিত্রের মুখেই কবি আরোপিত করিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তি হইতেই আমরা বলিতে পারি গৌতমের অবর্ত্তমানে সুযোগ পাইয়া (তস্যান্তরাং বিদিত্বা) একদিন ইন্দ্র গৌতম বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার নিকট নিজের কামেচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং তাহার ইচ্ছা চরিতার্থ করেন। বিশ্বামিত্রের কথা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিয়াও নিজেকে বিতরণ করিয়াছিল—

মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজ কুতূহলাৎ॥

এখন এই ছোট একটী কথায় ('বিজ্ঞায়') তপোনিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অহল্যার জ্ঞানতঃ পাপ সম্বন্ধে যখন বলিতেছেন তখন তাহা কর্ত্তন

করিবার বৃথা যুক্তি প্রদান করিতে আমাদের অভিলাষ নাই। বিশেষতঃ স্বামীর বেশ ধারণ করিয়া ব্যক্তি বিশেষ স্ত্রীর নিকট অসদভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলে স্বামীর মন ও আত্মা লইয়া সে যে আসে নাই, কামতাড়িত ও কুতূহলাক্রান্ত না হইলে তপোনিষ্ঠা অহল্যাও বুঝিয়া সেই সময়ে সতর্ক হইত। কিন্তু ইহা কামাতুরা নারীর নারী-সুলভ দুর্ব্বলতা; এইখানেই অহল্যার পতন এবং এই জন্যই আমরা তাহার কার্য্যের অনুমোদন করি না। কিন্তু বাল্মিকী আরও কতকগুলি অবস্থাও উপস্থিত করিয়াছেন :— (১) তৃতীয় ব্যক্তি বিশ্বামিত্রের উক্তি (২) গৌতমের অনুপস্থিতি (৩) অহল্যার আন্তরিক অবস্থা ও সুযোগ (৪) ইন্দ্রের বেশ পরিবর্ত্তন এবং আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়েও গৌতম তাহাকে নিজবেশধর দেখিয়া অভিসম্পাত প্রদান করে—

"মমরূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে!"

গৌতমের কোন কথায়ই মনে হয় না যে অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিয়া এই কাজ করিয়াছিল (৫) অভিশপ্ত হইয়া ইন্দ্র দীন নয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেব, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও চারণগণকে বলিতেছেন—

"কুর্ব্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্য্যমিদং কৃতম্।"

"আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনার্থ তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি আমিই গৌতমকে ক্রোধরূপ কঠিন পাপ প্রদান করিয়া তাঁহার তপস্যা অপহরণ করিয়াছি।" এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় গৌতমের অনিষ্ট করিবার জন্য ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রেই অহল্যার

অপরাধ, স্বামীবেশে ইন্দ্রকে দেখিয়া দুরদৃষ্টবশতঃই তাহার পতন। এই বিষয়ে পুনরায় কবিও শতানন্দের মুখে আরোপ করিতেছেন

"অপি রামায় কথিতং যদ্‌বৃত্তং তৎ পুরাতনম্
মম মাতুর্মহাতেজো দৈবেন দুরনুষ্ঠিতম্।"

মহাতেজস্বরূপা আমার জননীকর্তৃকে দৈবক্রমেই যে এইরূপ অপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই কাহিনী কি শ্রীরামচন্দ্রকে বিবৃত করা হইয়াছে? সুতরাং অহল্যা যে ইন্দ্রকে চিনিয়া নিরয়গামী হইয়াছে তাহা মনে হয় না। যদিই বা ধরিয়া লই যে মুনি বেশধারী ইন্দ্রকে সে চিনিয়াছিল। তবেও বহুদিন স্বামীসহ তপস্যায় ব্যাপৃতা থাকিয়া যদি মুহূর্ত্তের জন্য অহল্যার জীবনে "দৈব-দুরনুষ্ঠিত" একটা ভ্রমই সংঘটিত হয়, তবেই কি তাহার ত্রাণ নাই? দিলীপবাবু ও তাঁহার মতানুবর্ত্তীগণ অহল্যা প্রভৃতি নামগুলি যেন প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারেন, বা কৃত্তিবাসের একেবারে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু মহর্ষি বাল্মিকী তো তাঁহার ন্যায় এরূপ নাসিকা কুঞ্চন করেন নাই। বিশ্বামিত্র অহল্যাব বৃত্তান্ত শুনাইয়া রামচন্দ্রকে খুব ত্রস্ত হইয়া আগ্রহের সহিত বলিতেছেন— "হে মহাতেজসম্পন্ন রাম, তুমি পুণ্যকর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে শীঘ্র চল, এবং তথায় গিয়া সেই মহাভাগা দেবরূপিনী অহল্যাকে উদ্ধার কর" :—

"তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাম্ দেবরূপিনীম্।"

কি আশ্চর্য্য, এই অসতী-কূল-পাংশুলাকে "মহাভাগা দেবরূপিনী!" কেবল ইহাই নহে। আশ্রমে আসিয়া তাঁহারা অহল্যাকে দেখিলেন।

"দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা জ্বোদিতপ্রভাম্"।

এইখানে বাল্মিকীর বর্ণনা কি চমৎকার! রামচন্দ্র তথায় গিয়া দেখিলেন—তপস্যার তেজ অহল্যার প্রভা অধিকতর প্রতিফলিত হইয়াছে। মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবদানবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় বিধাতা প্রযত্নাতিশয়ে এই মায়াময়ী মোহিনীমূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দীপ্তি ধূমপূর্ণ বহ্নিশিখাসদৃশ। হিম-বিজড়িত বা মেঘমিশ্রিত পূর্ণচন্দ্রের লাবণ্য যেরূপ, জলমধ্যে প্রদীপ্ত সূর্য্য-প্রভা যে প্রকার, তাহার আকৃতিও তদনুরূপ হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন—

"রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ জগৃহতুস্মুদা।"

তখন দেবলোকে দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের মহান্ মহোৎসব ও স্বর্গ হইতে সেই আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি হইল। সত্য বটে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অহল্যার উদ্ধার হয়, কিন্তু বাল্মিকী তাঁহাকেও অল্প তপশ্চারিণী করিয়া রামের নিকট উপস্থিত করেন নাই। অহল্যা সৃজনে এইখানেই বাল্মিকীর বিশেষত্ব। বাস্তবিক দেবতারা সেই তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমের বশীভূতা ও অনুগামিনী পত্নী অহল্যাকে "সাধু, সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন :—

"তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্"

আর গৌতম? সেই "abusing ও unforgiving" গৌতমও অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন—

"গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যা সহিত সুখী"

ইহার পর মিথিলানগরীতে শতানন্দ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

আমার মহাভাগা যশস্বিনী মাতাকে শ্রীরামচন্দ্রের সন্দর্শন করাইয়াছেন ত ?

এখন বাল্মিকী যাহার দৈবনিবন্ধন মুহূর্ত্ত কালীন ভ্রম সহস্র বৎসর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপনোদন করাইয়া পরে মহাভাগা দেবরূপিনী, যশস্বিনী, গৌতমবশা, বিশুদ্ধাঙ্গীরূপে তাহার যশোগান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, যাহার পরিত্রাণের জন্য তপোনিষ্ঠ কঠোর যোগী বিশ্বামিত্রও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, যাহার তপোতেজপ্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার পাদবন্দনা করেন, সেই তপশ্চারিণী মাতার নাম মহাপাতকনাশন-রূপে স্মরণ করিয়া যদি হিন্দুরা গাত্রোত্থান করিয়া আনন্দ বোধ করে তবে দিলীপবাবু তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়া মনে করিতে পারেন "**Sanctioned by no better authorities than nameless nonentities of nonsensical numbers**" এবং হয়ত বা মনে করিতে পারেন এ বাল্মিকীকেও আমাদের কৃত্তিবাস রূপে আমরা ভ্রম করিয়াছি, কিন্তু তাহার নবোৎসাহিত স্খলিত ভাস্তে হিন্দুর বিশ্বাস অহল্যা-দ্রৌপদীর প্রতি বিন্দুমাত্রও আলোড়িত হইবে না। সত্য বটে, সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, শৈব্যা, গান্ধারী, দময়ন্তী, চিন্তা, বেহুলা, ফুল্লরা, প্রভৃতি আদর্শ সতী সন্দেহ নাই এবং এখন হিন্দু বিরল ইহাঁদের নামমাত্রে যাহার হৃদয় না পবিত্রতায় স্নাত হয়। আর এই সকল আদর্শ সতীর নিকট সত্য বটে অহল্যার তুলনা হইতে পারে না কিন্তু অহল্যার মত এমন আর একটি চরিত্র আমরা রামায়ণ মহাভারতে খুঁজিয়া পাই না, যিনি মুহূর্ত্তকালীন ভ্রম তীব্র প্রায়শ্চিত্ত সাধনে (স্বামীর ক্ষমাবলে

নহে) নিজের দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ অগ্নিশুদ্ধা করিয়া পরে—পরে আবার ক্রোধপরায়ণ স্বামীরও মনস্তুষ্টিসাধনে সক্ষম হইয়া সুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়েন। পূর্ব্বকালীন হিন্দু এত ক্ষমাশীল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল। আর এখন নির্দ্দোষী সাধ্বী স্ত্রী আততায়ীর হস্তে পতিত হইয়া সমাজ পরিত্যক্তা! এই মর্ম্মব্যথা আমরা বারবার বলিয়াছি এবং বারবার বলিব! পাঠক দেখুন এই অহল্যার প্রতি বাল্মিকীর ধারণা (Conception)ও কত উচ্চ, এবং এই জন্যই অহল্যা এত বড়। পঞ্চস্বামী বর্ত্তমানে দ্রৌপদীর অপূর্ব্ব সংযমই তাঁহাকে আবার প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে। এখনও কি দিলীপবাবু বলিতে চাহেন "why waste admiration to those who do not merit the same," দিলীপবাবু হিন্দুর রাম যুধিষ্ঠির প্রভৃতিতে যেরূপ শ্রদ্ধাবান, তাহাতে তাঁহার সঙ্গে বোধ হয় তর্ক না করাই ভাল। আমাদের সংস্কার আলাদা, শিক্ষা অলাদা, বিশ্বাস আলাদা। তবে একটা কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে তিনি যাঁহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয়া ও সম্মানার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন---অর্থাৎ ভীষ্ম এবং লক্ষ্মণ—তাঁহারা সেই পূজ্য চরিত্রদ্বয়কে এত শ্রদ্ধা করিতেন কেন? এবং ভীষ্মদেব শ্রীরামের অপর রূপ শ্রীকৃষ্ণকেই বা এত ভক্তি করিতেন কেন? এখন এই অহল্যাকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন আমরা সেইটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মতে দশ বৎসরের সময় অহল্যার বিবাহ হয়। তারপর আরও পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখন সে পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী। তাহারা—

"আজি উচ্ছ্বসিয়া
ছাপিয়া হৃদয়-পাত্র যাইতেছে
নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা।"

সঙ্গীতেও অহল্যার সেই মর্ম্মব্যথা, সেই করুণ কাহিনী—

"আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি রে
মম হৃদয় কাহার লাগি রে
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।"

কিন্তু এভাব কি স্বামীর জন্য? যখন বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতেন না, ভাবিতেন পুণ্য পরিণয়ে জন্ম সার্থক হইবে, কিন্তু—এখন? যৌবনাগমনে—

"এতদিনে বুঝিয়াছি ভ্রম"

ইহার মধ্যে আবার ৪।৫ বৎসরের এক ছেলেও তাহার ক্রোড়ে (১০ বৎসর পরে সে যুবক)। স্বামীর কথা উঠিলে তিনি বলেন—

"তিনি ধার্ম্মিক মাধুরি। কিন্তু রমণী-হৃদয়
তাঁর প্রার্থী নহে সখি! থাক্ কাজ নাই
নিষ্ফল বিলাপে আর। বুঝিবি না তুই।
অথবা কি ফল অনুতাপে? (সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস)
নাহি জানি কেন আজি হৃদর কাতর।"

এইবারে যখন অহল্যাকে আশ্রমে রাখিয়া গৌতম কিছুদিন বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অহল্যা যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, স্বামীকে খুব শক্ত দুই কথা শুনাইয়া দিল—

"দেখ চাহি এই মুখপানে এই
নব উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উচ্ছ্বসিত রূপ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয়
দেখিছ ? বাঁধিলে কেন নব সুকোমল
কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বল্লরী
নীরস বিশুষ্ক বৃক্ষ কাণ্ডে ?" (ক্রন্দন)

স্বামী বৃদ্ধ বলিয়াই বোধ হয় এত অভিমান। কোথায় বা অহল্যার তপস্যা ? কোথায় বা দেবাসুর সংগ্রামে মুহূর্ত্তেকের জন্য পতন ও ইন্দ্রকে চিনিয়াও আত্মরক্ষায় অনিচ্ছা। অহল্যা যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত—

"আমার জীবন চাহে সম্ভোগ। তোমার
জীবনের ব্রত পুণ্য সঞ্চয় ; তোমার
কার্য্য ব্যয়। ভিন্নরূপ গতি দুজনার
ভিন্ন দিকে। এ জীবনে হইব না মোরা
কভু সম্মিলিত। যাও, বাড়িবে না তাহে
আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ।"

এই ভাবে বরষার বারিসম্পাতে সন্ধ্যাসমাগমে যখন কুটীরে সে একাকিনী, যখন তাহার,—

"আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগ
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারি,
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা
ধিক্ ধিক্ জনম আমারি—"

যখন তাহার বাসনা—

"আর রাখিতে না পারি
বাঁধিয়া প্রবাহ। হায় বুঝেছি আমার
বিফল যৌবন, এই নারী জন্ম বৃথা।"

অহল্যার সেই অবস্থায় সুঠাম, সুন্দর, দীর্ঘদেহ, প্রসারিত বক্ষ ইন্দ্র কুঠীর-দ্বারে উপস্থিত। বাল্মিকীর সৃষ্টির ন্যায় স্বামী মূর্ত্তি পরিগ্রহের কোন উল্লেখ নাই। তথাপি অহল্যা তাহাকে দেখিয়াই ডাকিলেন, "মদীয় আশ্রমে যাপ নিশীথ" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভাবে গদ্গদ হইয়া কখনও নিজের নাম ভুলিয়াই যেন বলিতেছেন—

"কি নাম যেতেছি ভুলিয়া"

আবার আত্মস্থ হইয়া তখনই বলিতেছেন "আশ্রমে চল।" (অস্ফুটস্বরে)—"সত্য বলিতেছি, আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর"—(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)।

এইভাবে কতদিন চলিল, তাহার ঠিক নাই কিন্তু মাধুরী তাহার স্বামী চিরঞ্জীবকে বলিতেছে—"একজন সুন্দর সুগৌর যুবা প্রত্যহ নদীবক্ষে একখানা সজ্জিত তরণীর সহায়তায় অর্দ্ধরাত্রে আসে, আর প্রত্যহ প্রত্যুষে চলিয়া যায়। ছেলেকেও নিজের কাছে শুইতে দিতে অহল্যা রাজী নহেন এবং এই অবস্থায় সংবাদ আসিল গৌতম সপ্তাহমধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। ইন্দ্র অহল্যাকে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছে, আর অহল্যা তখনও কম্পিতস্বরে শপথ করাইতেছে—

"সত্য ভালবাস ?"

উপপতির সঙ্গে যাইবার কি আনন্দ ! এক মুহূর্ত্তে সে ভবিষ্যৎ-সুখ কল্পনা করিয়া লইতেছে—

"যেথানে ভুঞ্জিব
পরস্পরে নিত্য চির অতৃপ্ত বিলাসে
অলক্ষ্যে নিভৃতে সুখে। সেখানে
বুঝিব বিশ্ব জনশূন্য, শুদ্ধ তুমি আমি আছি
ভাসায়ে যাইব যুগে যুগে নিরবধি
ক্ষুদ্র মিলনের তরী, অকুল
গভীর প্রেমের সমুদ্রে।"

যাইবার সময়ে নিশীথে হঠাৎ পুত্র শতানন্দ জাগিয়া অনর্থ উৎপাদন করিল। "মা ক্ষুধা, মা ক্ষুধা" বলিয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অহল্যা—

"তবে দিতেছি মিটায়ে চিরজীবনের ক্ষুধা।"

বলিয়া শিশুর কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। অবশ্য ক্ষণেকের তরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—

"করিলাম হত্যা আপন সন্তানে।"

কিন্তু পরক্ষণেই প্রেমিকের হাত ধরিয়া গৃহের বাহির হইল। পথে মাধুরী বাধা দিল, চিরঞ্জীব বাধা দিয়া ইন্দ্রের অস্ত্রে ভূতলশায়ী হইল। কিন্তু অহল্যাকে কিছুই প্রতিহত করিতে পারিল না। 'মাতৃত্বের' নিধন সাধন করিয়া, আশ্রয়-কর্ত্তার মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া প্রিয় সখীর কাতরোক্তি উপেক্ষা করিয়া উপপতির প্রেমপাশে আবদ্ধা অহল্যা পর্ব্বত-

প্রান্তে ইন্দ্রের সহিত দিবস-রজনী বিহার করিতে লাগিল। এই অবস্থায় কিছুদিন মধ্যে যখন ইন্দ্রের ক্ষুধা তৃপ্ত হয়, স্বর্গে আবার ফিরিয়া যাইবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আসে, অহল্যা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—

"এই নহে আমাদের স্বর্গ ?
করে কর, বক্ষে বক্ষ,
অধরে অধর।
দশ বর্ষ ধরি পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্র সুধা, পাত্রে চেয়ে
দেখো আরো আছে। আরো দিতে
পারি। এই পীনবক্ষ—যত চাহ দিব,
যত চাহ পান কর।"

কিন্তু ইন্দ্র যখন একান্ত দৃঢ়মনোরথ, তখন সুরাপানোন্মত্তা অহল্যা উপপতির বক্ষে শাণিত অস্ত্রাঘাত করিয়া উন্মাদবৎ অট্টহাস্য করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পাঠক দেখুন বাল্মিকী যাহার মুহূর্ত্তকালীন পতন-সংঘটন করিয়া পরে তাহাকে মহাভাগা দেবীরূপে পরিণত করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র চিত্রে সেই অহল্যাকে হীন বারাঙ্গণারও অধম করিয়া সৃজন করা হইয়াছে কি না ? আর যদি তাহাই হয়, তবে কি এই 'সাহিত্যের দুর্নীতি' নিবারণের কোন উপায় নাই ?

ইহার পর অহল্যা জানিতে পারে যে তাহার পুত্র জীবিত ; তাহার সহিত অহল্যার সাক্ষাৎও হয়। কিন্তু পুত্র মাতাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার

করেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম এতদিনে বোধ হয় অহল্যা নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত-হৃদয়ে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিবেন, কিন্তু এখনও তাহার রূপের গরিমা, তাহার তীব্র প্রতিহিংসা, এখনও আকাঙ্ক্ষা, এখনও মানুষের প্রতি তীব্র কটূক্তি, নিজের পাপের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নাই, বিন্দুমাত্র অনুতাপও দৃষ্ট হয় না—

"আমি কলঙ্কিণী সত্য। কিন্তু কার দোষ ?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণ প্রতিমারে
নীরস পাষাণস্তূপে ? কেবা প্রলোভনে
ভুলাইল অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী !
নহে সে নির্ম্মম ক্রূর পুরুষ ? তথাপি
তথাপি শুধু আমি দোষী একা সমাজ বিচারে,
কেহ নহে নির্ম্মম, যেমতি ক্রূর পুরুষ নির্ম্মম।
বহ বহ ঝঞ্ঝা, কর চূর্ণ ধূলিসাৎ
এই অরাজক রাজ্য। ভৈরব উল্লাসে
দাঁড়ায়ে দেখুক তাহা অহল্যা পাষাণী।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাল্মিকীর শ্রীরামচন্দ্র—অহল্যার তপশ্চারণে মুগ্ধ হইয়া দর্শনমাত্রেই তাঁহার পাদবন্দনা করেন ও বিশ্বামিত্র স্বয়ং তাঁহাকে সেই মহাভাগার নিকটে লইয়া আসেন; আর দ্বিজেন্দ্রলালের অহল্যা বিশ্বামিত্রকে বলিতেছে—

"তুমি কপট পুরুষ
একা মহাসত্য জানিয়াছি প্রভু
"লম্পট পুরুষ জাতি"। তুমি ঋষি বটে
তথাপি বিশ্বাস নাই পুরুষ ত তুমি
আসিয়াছ বুঝি রূপ লালসায় ?"

রামচন্দ্রকে বলিতেছে—

"আরম্ভ হইয়াছিল জীবন আমার
প্রকাণ্ড প্রাসাদে। হায় রাখিল বিধাতা
পূর্ণ জ্যোৎস্না কেন ভগ্নগৃহে ; পাপিয়ায়
অন্ধকারে ; ছড়াইল নির্জ্জন বিপিনে
পুষ্পের সুগন্ধ রাশি ?"

দ্বিজেন্দ্রলালের রামের অনেক বক্তৃতার পরে তবে অহল্যার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ অনুতাপ আরম্ভ হয় এবং পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তাহার কিঞ্চিৎ অনুতাপ দেখিতে পাই। ইহার পরে গৌতম তাহাকে গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বাপর দেখিয়া পাঠক বিবেচনা করুন, বাল্মিকী হইতে কবি কতদূর সরিয়া পড়িয়াছেন এবং বাল্মিকীর 'মহাভাগা দেবীরূপিণী' অহল্যাকে তিনি দশবর্ষব্যাপী লালসাকূপ-নিমজ্জিতা পুত্রঘাতিনী, প্রেমিকের প্রাণহন্ত্রী প্রতিহিংসাপরায়ণারূপে চিত্রিত করিয়াছেন কি না ? কিন্তু নাটকখানা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথমকালীন নাটক, প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। এবং দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুদিন পরে পদ্যে নাটক না লিখিয়া গদ্যে

নাটক লিখিবেন স্থির করেন এবং তজ্জন্য অনেক কৈফিয়ৎও দেন। ইহার পরে দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যজগতে যেরূপ উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ইচ্ছা করিলেই যে কোনও থিয়েটারে তিনি এই নাটকের অভিনয় করাইতে পারিতেন। কিন্তু সাহিত্যে দুর্নীতি নিবারণের জন্য যিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও লেখনী ধারণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়েন নাই, হিন্দুর প্রাণে তিনি কিছুতেই ব্যথা দিতে পারেন না। হিন্দুর অহল্যাকে, বাল্মিকীর অহল্যাকে আদর্শচ্যুত দেখিয়া অপরে অট্টহাস্য করিতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাতে নিশ্চয়ই খুসী হইতেন না, সুধী সমাজ তাহা বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এই সমস্ত চরিত্র যে হিন্দুসমাজের সমাদৃত ও পূজিত তাহার কারণ শ্রীভগবানের করুণা। মহাপাতকীরও তিনিই উদ্ধারকর্ত্তা, পথভ্রষ্ট পাপাচারী নরনারীরও তিনিই ত্রাতা, অহল্যা-চরিত্র স্মরণে হিন্দুর মনে সেই মহাসত্যই প্রতিভাত হয়। যে সকল চিত্র বা চরিত্র হিন্দু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, অনভিজ্ঞ সমালোচকের কথায় তাঁহাদের আজ মতিচ্ছন্ন ঘটিবে না।

দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলাল
ও
মহাকবি গিরিশচন্দ্র *

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাট্য-মন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিমলানন্দ বাবু,সহৃদয় সুধীবৃন্দ ও বন্ধুগণ, নাট্য-সম্রাট, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জনক ও প্রতিষ্ঠাতা, পরম বিশ্বাসী, রামকৃষ্ণ ভক্ত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়া আপনারা খুলনাবাসীগণ বাঙ্গলার অন্যান্য জিলার সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃতিও জাতীয়তাবোধের যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন। এবং সেই আবরণ উন্মোচন করিবার গৌরব আমাকে প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া আমাকে ধন্য ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনাদের ন্যায় গুণগ্রাহী ব্যক্তির সঙ্গে গিরিশপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমারও আনন্দ-

---

* ১৯৪৫ সালের ৭ই জুলাই খুলনা 'নাট্যমন্দিরে' নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র ও দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলালের মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। খুলনার জনহিতকারী নায়ক সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এডভোকেট মহাশয় বর্ত্তমান লেখককে গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে ও সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা দেশ কবির ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীকে দ্বিজেন্দ্র-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে আহ্বান করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তদুপলক্ষে রচিত হয়।

রাশি উথলিয়া উঠিতেছে আরও আনন্দের কারণ হইয়াছে যে এই সুযোগে বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে সুবিধা পাইয়াছি। 'দেশকবি'—বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন প্রদত্ত এই গৌরবজনক উপাধিটি আজই প্রথমে খুলনার এই অনুষ্ঠানে উক্ত সম্মেলনের কার্য্যকরী সভাপতি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে উপাধিটী যে খুবই উপযোগী তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আজ সত্যই—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ন্যায় দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলালেরও স্বদেশচেতনার একান্তই প্রয়োজন হইয়াছে। আজ আমরা চাই, বাঙ্গলার আবাল বৃদ্ধবণিতা স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমস্বরে বলিতে শিখুক—

"আমরা ঘুচাব মা তোর কলিমা
মানুষ আমরা নহিত মেষ,
দেশ আমার! সাধনা আমার!
স্বর্গ আমার! আমার দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ
ত্রিংশ কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ।"

দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতেই দিগ্বিজয়ী বিদেশী সম্রাটের মুখেও ত্রিংশকোটি-সেবিত ভারতভূমির নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য রাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—

"সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! আর কি এক সৌম গৌর দীর্ঘাকৃতি জাতি এদেশ শাসন কচ্ছে।

আজ আমরা দেখিতেছি ভারতবাসী বিভিন্ন মত ধারায় শতধা বিভক্ত, আজ আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, লাঞ্ছিত, পরপদানত, দুর্ভিক্ষের কবলে উহার ভীষণ দংশনে নিষ্পেষিত। ইহার পরিবর্ত্তে দেশকবি পরিকল্পনা করিতেছেন ভারতের ভাবীচিত্র—

"এই প্রধূমিতা, প্রজ্জ্বলিতা, প্রবাহিত রক্ত স্রোতস্বতী ভৈরবী ভারত-ভূমির পরিবর্ত্তে এক রত্নালঙ্কৃতা পুষ্পোজ্জ্বলা সঙ্গীত মুখরা হাস্যময়ী জননী জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহা সাম্রাজ্য—

"মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।"

এই অবিমিশ্র, বিমল দেশানুরাগ দেশকবির লেখনীতেই শ্রেষ্ঠ জন্মভূমি গীতিতে মুখরিত হইয়াছে—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

দেশকবি ভারত ভূমিকে ভালবাসিতেন বলিয়াই, প্রতাপসিংহের বীরত্ব, গোবিন্দ সিংহের দেশাত্মবোধ দুর্গাদাসের আদর্শ গুণরাশি তাঁহার রচনায় এমন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর
বিরাট দুঃখে দৈন্যে তাহার,
শৃঙ্গের সম অটল স্থির
মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়

রঞ্জিত করি কাগার তীর
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।"

"দুর্গাদাস" নাটকে যেমন যশোবন্ত মহিষী ওজঃস্বিনী ভাবে গ্রামবাসী-গণকে উদ্বোধিত করিতেছেন এখানেও সেরূপ দেশের স্বেচ্ছাসৈনিক-গণকে আমরা দেশকবির ভাষায়ই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি—

"ওঠো, সৈনিকগণ, ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করো, একবার দৃঢ়পণ করে ওঠো, ওঠো যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার ক'রে ওঠে, যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে। যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গ-কল্লোল ওঠে। ভারতবর্ষ জানুক, বিদেশী জানুক, তোমাদের শৌর্য্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয়নি"। দেশ মাতৃকার সেবক দেশকবির মাতৃভক্তিও জন্মভূমি প্রীতিরই অনুরূপ। তাই মাতৃ অপমান মোচনকল্পে তাঁহার সমস্ত শোণিত রাশি উত্তপ্ত তেজে উদ্বেলিত হইয়া চাণক্যরূপে শিথিল মনোরথ চন্দ্রগুপ্তকে উদ্দীপিত করিতেছে—

"না জানোনা, নইলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? মা যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে, এক মন। এক প্রাণ, এক নিঃশ্বাস, এক আত্মা, যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল, তারপর পৃথক হয়ে এলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত। মা যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহ চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী করে তোমায় পান করিয়েছিল, তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষ চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা রোগে, শোকে, দৈন্যে,

দুর্দ্দিনে, যে তোমার দুঃখ বক্ষঃ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লানমুখ উজ্জ্বল দেখবার জন্য প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহ মন্দাকিনী শুষ্ক তপ্ত মরু-ভূমিতে শতধারায় উচ্ছাসিত হয়ে যাচ্ছে, মা যার অপার করুণা মানবজীবনে প্রভাত সূর্য্যের মত কিরণ দেয়, বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না, উন্মুক্ত কম্পিত আগ্রহে আপনাকে দু'হাতে বিলাতে চায়—এ সেই মা।

দেশ-কবির হাসির গানও স্বদেশীকতায় পরিপূর্ণ, ট্রেজেডির নামান্তর মাত্র। যেমন

"আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক' ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা—আর
মুটেদের ডাকি কুলি!"

বঙ্গভাষা সংস্কৃতির অন্যতম পূজারী দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলাল 'মাতৃসম মাতৃ ভাষাকে'ও দেশমাতৃকার ন্যায়ই ভালবাসেন বলিয়া লিখিতে পারেন—

"জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,

দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র

যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি
অমল কমল চরণে স্থান ."

১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত যুগটি স্বদেশীকতার মহেন্দ্রযুগ, আর সেই যুগে দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, সাজাহান, ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতাপাদিত্য, রাক্ষসী, পদ্মিণীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার, আর গিরিশচন্দ্রের ভ্রান্তি, সৎনাম, বাসর, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম ও ছত্রপতি নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের অবদানই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে তিনিই প্রথম বাঙ্গলার স্বাধীন, দেশ-ভক্ত, হিন্দু-মুসলমানে সমান স্নেহশীল নবাব সিরাজের প্রকৃত চরিত্র সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া জাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বিদেশীর রচনায় যে সিরাজ মদ্যপ, নিষ্ঠুর কুক্রিয়াশক্ত পরস্বাপহারী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে, গিরিশই প্রথমে খাঁটি ইতিহাসাবলম্বনে নাটক রচনা করিয়া দেখাইলেন সিরাজকে তোমরা যাহা দেখাইয়াছ তাহা ঠিক নয়, সে প্রকৃতই প্রজাবৎসল বাঙ্গলার দরদী নবাব,—আজ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠরত্ন দেশকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

"স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন,
হিতাহিত হয়নি বিচার
মদ্যপানে করিয়াছি, শতশত দুর্নীত ব্যবহার
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন

বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়
শেষ বাক্যে জাগিয়াছে প্রত্যয় আমার
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার
নবাব প্রজার ভৃত্য প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গল সাধন নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।"

গিরিশের লেখনীতে সিরাজের প্রকৃত আলেখ্য লোকচক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় বাঙ্গালীর দাস-মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যে জাতীয়তার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছে, আর এখন হইতে বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ নবোদ্‌ঘাটিত বাঙ্গালী সিরাজ-চরিত্র তখন জাতীয়তা প্রসারে এত সহায়তা করিয়াছিল বলিয়াই গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি। তদানীন্তন মুসলমান নেতৃবৃন্দ আবুল কাসেম, ডাক্তার গফুর, মজিবুর রহমান প্রভৃতি দেশপূজ্য জাতীয় নেতা বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথকে বলিতেন "মহাশয়, পঞ্চাশটা স্বদেশীসভায় যাহা হয় না, সিরাজদ্দৌলার এক রাত্রির অভিনয়ে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হয়।" বস্তুতঃ যখন রঙ্গমঞ্চ হইতে সিরাজ-বেশী দানিবাবু অমাত্যগণকে সম্বোধন করিতেন, সমস্ত দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চার হইত, জাতীয়তার উৎস প্রবাহিত হইত—

"—ওহে হিন্দু-মুসলমান
এসো করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন
হই বিস্মরণ পূর্ব্ববিবরণ
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন,
আমি মুসলমান করি বাক্যদান

ভুলে যাব যাহা কিছু মনে
পূর্ব্ব কথা আলোচনা নাহি প্রয়োজন,
সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত,
বাঙ্গলার ক্ষতি নহে তাহে
হয় যদি বিদ্রোহ সফল
বাঙ্গলার বঙ্গবাসী হইবে নবাব,
কিন্তু সাবধান,
বিদেশীরে নাহি দিও সূচ্যগ্র-স্থান।"

এই জাতীয়তা সিরাজদ্দৌলার ছত্রে ছত্রে। সিরাজদ্দৌলা যখন মীরমদনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—আমরা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করি।

"মীরমদন" জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনও সুদিন হয়' যদি কখনও হিন্দু-মুসলমান জন্মভূমির অনুরাগে ধর্ম্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চস্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গলের সহিত আপনার মঙ্গল বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা বিদ্বেষ নীচপ্রবৃত্তি দলত ক'রে স্বদেশবাসীর অপমান আপনার অপমান জ্ঞান করে তবেই আশা, নতুবা নিষ্ফল।"

এই নাটকের অভিনয় দেখিয়াই লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নাট্যকার ও বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের প্রতি অতি-মাত্রায় শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

লুতফুন্নিসার প্রতি—সিরাজের শেষ কথাগুলিও কত মর্ম্মন্তুদ—

"প্রিয়ে ফুরিয়েছে রাজ অভিনয়
কল্পনায় না হয় উদয়
কয়জন বিদেশী বণিক
কাড়ি নিল সিংহাসন
ধূমকেতু উদি শুষিল সাগর নীড়
বঙ্গ সিংহাসন না জানি কি কুহকে গঠন
অধিকারী বর্ত্তন তাহার কুহক প্রভাবে যেন
শুনি অষ্টাদশ জন পাঠান আসিয়ে
লক্ষ্মণ সেনের গদি লইল কাড়িয়ে
বসিল পাঠান যবে হিন্দু সিংহাসনে
বঙ্গবাসিগণ না করিল অঙ্গুলি চালন
এবে দূরদেশী মুষ্টিমেয় বিদেশী
কাড়ি নিল সিংহাসন
রণস্থলে সশস্ত্র দাঁড়ায়ে
অভিনয় নেহারিল বিপুল বাহিনী
হয় অনুভব বাঙ্গলায় এই জলবায়ু মৃত্তিকা প্রভাব ।
রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা সতত
কহে যত হিন্দুগণে
সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা
নাহি হেন অন্য কোন স্থানে
পুত্রের মমতা নাহি বঙ্গমাতা হৃদে—"

বাঙ্গলার জলবায়ু মৃত্তিকা প্রভাব বলিয়াই—করিম চাচা নবাবকে বলিতেছে—

"জনাব, এই বাঙ্গলার তিনজনের যদি হুমত দেখাতে পারেন আমি নাকে খত দিয়ে আফিং খাওয়া ছেড়ে দিব। বাঙ্গলার বুদ্ধিও যেমন প্রখর, প্যাঁচও তেমন ঝুড়ি ঝুড়ি।"

এইতো গেল সিরাজদ্দৌলার কথা। বাঙ্গালী মিরকাশিমে মহাকবি গিরিশ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এমন এক আদর্শ বাঙ্গালী আধিনায়কের ভাবীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে ১৫ বৎসর পরে আমরা সেই আদর্শ বীর দধিচী তুল্য সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সত্যই পাইয়াছিলাম। সেই দেশহিত-প্রাণ সেই আত্মত্যাগ, সেই আড়ম্বর শূন্য জীবন যাপন, সেই ঐকান্তিক-ন্যায়নিষ্ঠা।

গিরিশের অন্তর্দৃষ্টিই তাঁহার সৃষ্টি চাতুর্য্যের উৎস। ইহা অন্যে সম্ভব নয়। নতুবা রাম না জন্মিতে রামায়ণের মত ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ভাবী দেশবন্ধুকে হুবহু কেহ অঙ্কিত করিতে পারিত না। মহাকবি "স্বরাজ প্রতিষ্ঠাতা" ছত্রপতি শিবাজীর বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। কিন্তু 'মির-কাশিমে' সামান্য একজন ইংরাজ সৈনিকের কথায়ও জাতীয়তা উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। হেষ্টিংস এবং ব্যাটসন ভারতবাসীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত এই লইয়া ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত, হঠাৎ খবর আসিল ইংরাজ রমণীগণকে নৌকা পার হইবার সময় নিমজ্জিত করা হইয়াছে। চারিদিকে রব উঠিল 'War', 'War', অবিলম্বে ঐ দুইজন ইংরাজ হাতে হাত মিলাইয়া আবার এক সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপ ভাবপরিবর্ত্তনে আমাদের দেশীয় লোকগণের বিস্ময় উপস্থিত হওয়ার সাহেব বলিতেছে—

আমরা ঘরের ভিতর ঝগড়া করে, এমন ঝগড়া করে, duel গড়ে, লেকেন তুসরা যখন তুষমণ খাড়া হবে, সব ঘরোয়া ঝগড়া মিটিয়া যাইবে হামাদের সব শিখিতে পারিবে হামাদের এইটা ইণ্ডিয়া শিখিতে পারিবে না। জাতের তুষমণ সবার তুষমণ, এ ইণ্ডিয়ান লোক কথনও শিখিবে না।

কিন্তু মহাকবি গিরিশচন্দ্র কি কেবল সাময়িক রচনারই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাতীয়তা তাহার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেবল চৈতন্যলীলা লিখিয়াই তিনি সেই ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে young Bengalএর মতিগতি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রবল স্রোত প্রতিহত করেন নাই। একা তিনিই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র সাধনার ভাবী পুরোহিত হইয়াছেন। সকলেই বোধ হয় জানেন না যে, সাহিত্য সম্রাটের যে বন্দেমাতরম আজ আমাদের একমাত্র সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, প্রথমে সকলে না বুঝিবার জন্যই হোক বা সংস্কারবশতঃই হোক ইহার গূঢ় মর্ম্ম তেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রই গরুড় প্রবন্ধে, গরুড়ের মাতৃবন্ধন উন্মোচনের উল্লেখ করিয়া গাম্বেটা, গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি প্রভৃতি দেশভক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া ভারত-বর্ষের মাতৃশৃঙ্খল উন্মোচনের কথাই তার স্বরে বলিতেছেন—

মাতৃমন্ত্র ইউরোপেই ফলপ্রদ এমত নহে। বিবাদ দিক্ষীত আকবর রাণাপ্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন, রাণা একজন মাতৃ উপাসক। ইতিহাসে শুনিতে পাই তাঁহার জয় অপেক্ষা পরাজয় অধিক গৌরববর্দ্ধক। যখন সমস্ত রাজপুতানা আকবরের সিংহাসন তলে যুগল করে দণ্ডায়মান তখন পুরুষসিংহ রাণার সিংহনাদ আরাবলি পর্ব্বত শুনিতেছে। তুর্জ্জয় মুসলমান শক্তি সুরক্ষিত তুর্গ সকল একে একে পদানত হইতেছে,

সভয়ে আকবর সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন। শতদ্রুসলিল বিকম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল—পাণ্ডুগণ্ড ইংরাজ শুনিল। দেখিতেছি এ মন্ত্র হীন ভারতবর্ষেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে কেহই ঈদৃশ হীন নাই—যিনি মনে করিলে এ মন্ত্র না গ্রহণ করিতে পারেন। তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাকে হীন বিবেচনা করি। সিদ্ধমন্ত্র—(বন্দেমাতরম) রহিয়াছে, হায় কেহ কি গ্রহণ করিতে নাই ?

আমরা যেন আজ সাহিত্য সম্রাটের সিদ্ধ মন্ত্রেরই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। ইহারই পাঁচ ছয় বৎসর পরে রাণাচণ্ডের স্বদেশভক্তি তাঁহার নাটকে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"হের এই চিতোর নগর পুণ্যধাম—
উচ্চশির প্রাচীর বেষ্টিত ধরাধর গর্ব্ব খর্ব্ব যাহে
স্বর্গোপম গরীয়সী মম জন্মভূমি এবে তথা বিহরে রাঠোর।"

যদিচ নাটকখানি বাঙ্গালীর চরিত্র উপলক্ষ করিয়া রচিত হয় নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের মত এখানেও চণ্ড একজন আদর্শ বীর।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেমন মান, গরিমা, স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া আদর্শ নেতা হইয়াছিলেন, নেতার সেই আদর্শ গুণ দেশবন্ধুর আবির্ভাবের বিশ বৎসর পূর্ব্বেই মহাকবির লেখনীতে চণ্ডের উক্তিতে অমর হইয়া রহিয়াছে—

"অন্তরের গূঢ়স্থান কর অন্বেষণ
মন। পশি' অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে

হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ-আশ
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশ-বৎসল ভার? আধিপত্য-লিপ্সা
কিম্বা ভারতের হিতে চালিত অন্তর?
সত্যতত্ত্ব কর নিরূপণ, দেখ মন,
স্বার্থ শূণ্য নহে কি অন্তর তব?"

'জনা' নাটকেও মহাকবি দেখাইয়াছেন কিরূপে মাতৃত্বের আদর্শ মূর্ত্তি জনার ন্যায় অনেক জননীগণও হাসিমুখে সন্তানগণকে স্বাধীনতা-অপহরণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবেন—

"পুত্র বর চার্য্য রণে যেতে
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে
মন্দ যদি তাহে হয় নরনাথ
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত
প্রফুল্ল নয়নে নন্দনে হেরিতে রণস্থলে
বীর মাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ
যদি হয় জয় পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চকার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব
তুমিও না নিবার রাজন।"

জনারই রূপান্তর সংনামের বৈষ্ণবীতে। সাধনায় সিদ্ধ অসম সাহসী বৈষ্ণবী বলিতেছে—

"জন্ম মম মাতৃভূমি উদ্ধারের হেতু
ইঙ্গিতে আমার সৈন্য হইবে সৃজন
অলক্ষিতে শতকোটি যোগিনী সঙ্গে ফেরে।"

সৎশিক্ষা প্রাপ্তা একজন মহিলা দ্বারা যে কত মহৎ কার্য্য সম্ভব, জনা, বৈষ্ণবী, জোবি, হরিমণি প্রভৃতি চরিত্র জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

জাতীয় কবি বিজাতীয় আদর্শে খড়্গহস্ত, তাই তাঁহার শিবাজী বলিতেছেন—

"বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন, হিন্দুর হিন্দু পরিচ্ছদ নাই, হিন্দুর অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দুভাবে সদালাপ নাই।"

গিরিশচন্দ্রের স্বাদেশিকতা গঠনমূলক, তাই তিনি ১৮৯৭ সালেই গঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

"কিন্তু এই দুঃখমনে, ভারত সন্তানগণে
কোনমতে শিখিলনা আপন নির্ভর
শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিলনা কর।
এ দুঃখ কহিব কারে, তব শ্বেতপুত্র দ্বারে
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে
শ্বেতপুত্র শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে।

লবণের প্রয়োজন নিত্যজানে জনে জন
তব পুত্র হ'তে তারা ক্রয় করি আনে
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে।"

'মায়াবসানে' বলিতেছেন—"মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দেন, বড়লোক একত্র হয়েছেন যে মদ খাবে তাকে সামাজিক শাসন করুন। নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপরে দেখছেন দীনদরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজী চালে চলে, আয় অনুসারে ব্যয় করতে পারে না। তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন। এমন কুটীর নাই যেখানে মদের বোতল, শ্লিপ বোতাম সাবান এসেন্স নাই। যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন, সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন, পবিত্রতাচারী হ'তে বলুন। বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে সেই টাকায় দীন দরিদ্রের সাহায্য করুন।"

এই সাধারণের জন্য, ছাপোষা গৃহস্থের জন্যই সর্ব্বদা গিরিশচন্দ্রের সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিত। তাই 'প্রফুল্ল' নাটকে এই সহানুভূতি প্রকট দেখিতে পাই। যোগেশ বলিতেছে—

"আমার বিবেচনায় কলকাতার গৃহস্থ ভদ্রলোকই দুঃখী। এ পাড়ায় দেখ, চাক্‌রী বাক্‌রী ক'রে আন্‌ছে নিচ্ছে খাচ্ছে, যেই একজন চোখ বুজ্‌লো অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল, কি খায় তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা বলবো কি ভাইরে, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি!"

এই সহানুভূতিতেই কন্যার বিবাহে পিতা কিরূপে সর্ব্বস্বান্ত হন বলিদান নাটকে নিজের রক্তমোক্ষণে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু দেশ চিন্তাই বলুন, সামাজিক সমস্যাই উপস্থিত করুন, পুরাণাবলম্বনে বহু নাটকই রচনা করুন—সর্ব্বোপরি মহাকবি গিরিশচন্দ্র

ছিলেন বিশ্বাসী ভক্ত, হিন্দুর জাতীয় কবি। রঙ্গভূমি এই বিশাল সংসারের প্রতিকৃতি মাত্র। জাতীয় রঙ্গালয় জাতীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মর্ম্মচিত্র অঙ্কিত করে। এখানে বিলাতী অনুকরণের স্থান নাই। মহাকবি সেকস্‌পিয়রের নাটকে অলৌকিক বা পারলৌকিক তত্ত্ব উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হয় নাই, কেননা, অতীন্দ্রিয় রহস্যে পাশ্চাত্য জাতির প্রকৃতিগত সংশয়। হ্যামলেটের ন্যায় মনীষী মনস্বী, উন্নত পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ববিচারশীল চরিত্র মৃত পিতার প্রেতাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও বৈতরণীর পরপারের উদ্দেশে বলিতেছেন—

"অজানিত দেশ, পান্থ নাহি
ফিরে যথা হ'তে।"

কিন্তু এই পরলোকে বিশ্বাস হিন্দুর মজ্জাগত। ইহলোক সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জাতির সকল কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যমূলে নীতি ও পুরুষকার। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে ধর্ম্ম, পরলোক ঈশ্বর নির্ভর প্রভৃতি আর ইহাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সত্য বটে এখন লোকে ধর্ম্মের কথা শুনিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, কিন্তু ভারতের উন্নতি ধর্ম্মের দ্বারাই সম্ভব একথা কেহই যেন বিস্মিত না হন তাই জাতীয় নাট্যকারের রচনায় এত ধর্ম্মতত্ত্ব। যেখানে অতীন্দ্রিয় জগৎ—সেকসপিয়র যেখানে মূক, গিরিশচন্দ্র সেখানে মুখর। তাই ফলষ্টাফের অপেক্ষা বরুণচাঁদ ও করিম চাচা স্বতন্ত্র, আর জনার বিদূষক ও পাণ্ডব গৌরবের কঞ্চুকীর সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্কও কোন দেশের কোন সাহিত্যে নাই। তাই দেখিতে চাই বিল্বমঙ্গলেই অদ্ভুত পাগলিনী গাহিতেছে—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে
যেখানে যাই সে যায় পাছে
আমায় বল্‌তে হয়না জোর করে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়
আমার মুখপানে চায়
আমি হাঁসলে হাসে
কাঁদলে কাঁদে কত রাখে আদরে।"

তাই দেখিতে চাই 'তপোবনের' বশিষ্ঠ ধর্ম্মবলে আত্মশক্তির প্রভাবে অটল মেরু সম আত্মত্যাগে মহীয়ান—

"প্রফুল্ল বদন
উদ্ভাসিত তেজোরাশি তায়
হোমাগ্নি সদৃশ জ্যোতি বদন মণ্ডলে।"

এই শক্তিতেই দেখিয়া তপোনিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল—

"এ মাহাত্ম্য অভাব আমার
হেন কার্য্যে নহে তো সক্ষম আমি।"

এ দৃশ্য মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ কল্পনার বহু সহস্র বৎসর পুর্ব্বে অনুষ্ঠিত। কত এমন উদাহরণ দিব? এই আত্মা শক্তি ও ধর্ম্মবলের প্রভাবে ক্রুর সর্পও বশীভূত হয়, হিংস্র পশু শান্ত হইয়া যায়, এমন কি অত্যাচারোদ্যত নর-পশুও অচিরে সংযত হইতে বাধ্য হয়।

পরিশেষে একটী বিষয় অব্যক্ত রাখিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি

না। জাতীয়তা বোধ ও ধর্ম্মের সমন্বয় না হইলে আমরা পথভ্রান্ত হইব। গিরিশচন্দ্রের সৎনামে তাহার সমন্বয় হইয়াছে। জাতীয়তা ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূতরূপে প্রকটিত করিয়া একটা মহাসমাস্যার তিনি সমাধান করিয়াছেন। 'সৎনাম' নাটকে গিরিশ স্বদেশরক্ষার জন্য মৃত্যু, ধর্ম্মকার্য্যে মৃত্যু তাহাই দেখাইয়াছেন, মোহিনী বৈষ্ণবীর উদ্দীপনায় উদ্বোধিত হইয়া তাহাকেই বলিতেছে—

"মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন
কিন্তু শুনি তোমার বচন
সে বাসনা নাহি আর
যথাসাধ্য হব' তব কার্য্যে অনুকূল
ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হ'তে হলে সমাধান
ভাবিব মা সার্থক জনম
বুঝিয়াছি কথায় তোমার
যাগযজ্ঞ তপজপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভুমি পূজা সম।"

সৎনাম নাটকে ফকিররামও বলিতেছেন "এমন হিন্দু অতি বিরল ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছু মাত্র উত্তেজিত হয় না। আত্মীয় রক্ষা স্বদেশ রক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করেনা। কিন্তু দেখ বিধর্ম্মী দেবদেবী ভঙ্গ করছে, হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা ক'রে দেবদেবী নিয়ে পলায়ন করে। আরও দেখ মৃত্যুভয় হিন্দুর সত্যই নাই, যাদের শত্রুরা ভীরু ব'লে জানে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে জাহ্নবী তীরে নিয়ে যেতে তারা উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে

পার, মাতৃভূমির নিমিত্ত, স্বজন-রক্ষার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য শত্রু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কাশী-মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়, গঙ্গার সজ্ঞান মৃত্যুবৎ ফলপ্রদ, তা হ'লে অনেকে তোমার মতানুবর্ত্তী হবে, ভারত অজেয় হবে।"

ভ্রান্তির রঙ্গলালও বলিতেছে "মৃত্যু ভয় গেলেই অজেয় হওয়া যায়।"

গিরিশচন্দ্র আর একটী মহাকার্য্য করিয়াছেন। এই দেশে এত জাতি, এত ধর্ম্ম, কতদিকে গোঁজামিল দিয়া রাখা যাইবে। তিনি বলেন "রিলিজিউস ইউনিটি" না হইলে ভারতে ঐক্য সম্ভব নয়। তুমি হিন্দু হও মুসলমান হও, খৃষ্টান হও, তুমি আমার ভাই, তুমি এক ভগবানেরই সন্তান—ইহাই প্রকৃত ইউনিটি বা ঐক্যের উপায়।"

আজ এই ধর্ম্ম প্রচারেরই একান্ত প্রয়োজন। তোমারও যিনি ঈশ্বর, আমারও তিনিই ঈশ্বর। তুমি ভারতবাসী ইহাই আমাদের পরিচয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের এই ধর্ম্মই যুগধর্ম্ম—'যত মত তত পথ'। আর ইহাতেই একমাত্র ঐক্য সম্ভব। তাই গিরিশ বলেন—

"যথা জল এক কোয়া ওয়াটার পানি
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লাগড়
ঈশ্বর জিহোবা যীশু নামে নানা জনে ডাকে
সনাতনে। ভেদবুদ্ধি অজ্ঞান লক্ষণ
ভেদবুদ্ধি কর দূর! বহু নাম
প্রতিনাম সর্ব্ব শক্তিমান। যার যেই
নামে ভক্তি প্রীতির উদয়, প্রফুল্ল হৃদয়
যেই নামে পূর্ণ মনস্কাম, সেই জন
সেই নাম উচ্চারণে।"

এই ভেদবুদ্ধি দূর হইলেই—আমাদের চরম লাভ হইবে। ভারতাগত কয়জন তুর্কী-সাংবাদিকের ন্যায় আমরা বলিতে সক্ষম হইব **We are Indians first, Hindus & Mohomedeans afterwards** ইহাই রিলিজিয়স ইউনিটি। ইহা রামকৃষ্ণের শিক্ষা, বিবেকানন্দের শিক্ষা। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা। মহাকবির এই মহাশিক্ষা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজি সবই **Proscribed** ইহাদের প্রচার ও অভিনয় নিষিদ্ধ। বিনানুমতিতে কোন কথা উল্লেখ করিবার অধিকার নাই। 'বাসর' হইতে একটী গান উদ্ধৃত করিয়াই আজ আমার কাজ পরিসমাপ্ত করিব—

"জননী ভুবন মোহিনী তীর্থকারা কীর্ত্তিদায়িনী
বাল্মিকী ব্যাস গায় মা তোমার পুরাকাহিনী
সামগানে তপোবনে নিত্য তোমার আরতি
কর মা নরত্ব প্রদান
দে মা শক্তি মাতৃভক্তি কর গুণগান
গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান
শুনি আর্য্যভেরি, কাঁপুক অরি—
পূজ্যবীর প্রসূতি।"

গিরিশচন্দ্রের অনুপ্রেরণাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লোকশিক্ষার জন্য "জাতীয় রঙ্গালয়" প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার আশা অপূর্ণ রাখে। দেশবন্ধুর অসমাপ্ত কার্য্য সমাধা করিতে বাঙ্গলায় কি কেহ নাই?

বঙ্কিম ও মুসলমান

ইদানীং প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, বঙ্কিম মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। একথা অনেক মুসলমান বলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক হিন্দুও বলিয়া থাকেন। বিগত বঙ্কিমশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেহ কেহ পরাণ মণ্ডল ও হাসিম সেখের উল্লেখ করিয়া সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উকীলের সে যুক্তি বিশেষ ভাবে আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই। অথচ জাতিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ বঙ্কিমের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ লোক-শিক্ষকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বঙ্কিম কেন, কোন লোক-শিক্ষকই এরূপ ভাব পোষণ করিতে পারেন না।

এ-পর্য্যন্ত আমি তিনজন মহাপুরুষের জীবনালোচনা করিয়াছি। ইহাঁরা কেহই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান লইয়া লেখনী সঞ্চালন বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁরা তিনজনই ছিলেন জাতির মহোপকারী প্রাণবন্ত পুরুষ। একজন ছিলেন জাতীয় ঋষি, একজন জাতীয় মহাকবি, আর একজন জাতির অবিসম্বাদী অধিনায়ক। ইঁহারা বাঙ্গলার অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন এবং একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কোনও ভেদবুদ্ধি ইহাদের কাহাকেও বিচলিত করে নাই। ইঁহারা হিন্দুরও নহেন, মুসলমানেরও নহেন, সমগ্র বাঙ্গলা জাতির। বস্তুতঃ ভেদবুদ্ধি থাকিলে কেহই জাতির উপদেষ্টা বা পরিচালক হইতে পারেন না।

জাতির নেতা দেশবন্ধু ধর্ম্মমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা অনেক লিখিয়াছিলেন

বটে, আর তিনি ইতিহাসও গড়িয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতিহাস লিখিবার সুযোগ তাঁহার অল্পই হইয়াছে। অন্য দুইজন আবার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া অনেক কিছুই লিখিয়াছেন—একজন উপন্যাস আর একজন নাটক। দেশবন্ধু যেমন বাহিরে ভিতরে হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতা দেখাইবার সুযোগ পাইতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বা গিরিশের নাটকে সে সুযোগ না থাকিলেও, তলাইয়া দেখিলেই সকল জাতির প্রতি তাঁহাদের সমদর্শিতা তুল্যভাবে প্রতীয়মান হয়। অধিনায়কের কার্য্য হইতে কবি ও নাট্যকারের কার্য্য স্বতন্ত্র, কারণ, ইতিহাসমূলক রসসাহিত্য রচনা করিতে, উপাদান ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইতিহাস সত্য না হইলে স্থায়ী হয় না। তাই সত্য ঘটনা উল্লেখ, বিদ্বেষ অনুমিত হইলেও সত্য ঘটনাশ্রিত নাটক বা উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে বিদ্বেষমূলক কখনও হইতে পারে না।

ইতিহাস বিবৃতিতে সম্প্রদায়বিশেষের দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই, বরং ইতিহাস দৃষ্টে উভয় জাতির ভ্রম সংশোধিত হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্যার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস এবং পেক্সপিয়ারের নাটক উল্লেখ করা যাইতে পারে। Wars of the Roses-এর বর্ণনায় Yorkists এবং Lancastrians এর পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়েই একই জাতি। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাউণ্ডহেড ও ক্যাভিলিয়ারের বিরোধ লইয়া স্কটের উপন্যাসাবলী রচিত। এই সব পুস্তক পড়িয়া ইংরাজ ও স্কট্‌স্ যেমন পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হন না, আমাদের হিন্দু-মুসলমানেরও পূর্ব্ববদ্বন্দ্ব স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান দ্বন্দ্বে ইন্ধন প্রদান করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

গিরিশচন্দ্রের "সৎনাম" নাটক হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব অবলম্বনে এবং "ছত্রপতি শিবাজী" হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল, অথচ সর্ব্বত্রই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও প্রীতিবন্ধনই মূর্ত্ত হইয়াছে। গিরিশ বারম্বার প্রচার করিয়াছেন—

"স্বাধীনতা-প্রিয় মনুষ্য মাত্রেই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীনচেতা, তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করে।"

(ছত্রপতি শিবাজী)

গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'মিরকাশিমও' খাঁটি বাঙ্গালী চরিত্র। কবি তাঁহাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভাবী নায়করূপে চিত্রিত করিয়া আমাদের জাতীয় জীবন আরও সমুন্নত ও সরস করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উদারভাবাপন্ন হইলেও সরকারের আদেশক্রমে এই কয়খানি নাটকেরই মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার বন্ধ রহিয়াছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসের আবার অন্যরূপ অপ-প্রচার। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর দৃঢ়ীবদ্ধ হইয়াও ইহাদের দুর্নাম যে, বিদ্বেষ প্রচারই ইহাদের কার্য্য। দেখিতেছি, ওসমান ও মোবারকের মহত্ত্ব বা সাহস কোন বিরোধীরই হৃদয় স্পর্শ করে নাই। মুসলমান ভ্রাতৃগণের মুখে নিয়তই শুনিতে পাই, বঙ্কিমের 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' বিরোধানল প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, বঙ্কিমের প্রকৃত মনোভাব লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বুদ্ধিভ্রংশেই 'বন্দেমাতরমে'র অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে। যাঁহার লেখনীতে সমদর্শী চাঁদশা ফকির সকল চরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে, বিরোধ কি তাহাতে সম্ভব ? বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমানে সমভাবে

রক্ষা করিবার জন্যই যে বঙ্কিম সীতারামের দ্বারা হিন্দুরাজ্য স্থাপন করাইয়াছিলেন, একথা কেহই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। এ পর্য্যন্ত এ সমস্ত কথার আলোচনাও বড় কেহ করেন নাই।

আজ নয়, সেদিন নয়, জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্কিম তাঁহার উন্নত মনোভাব দেশবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন। চাঁদশা ফকিরই যে সীতারামের প্রধান সহায়, বঙ্কিম "সীতারামে" তাহা বরাবর দেখাইয়াছেন। কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি পাঠক তাহা দেখিয়াও দেখেন না বলিয়াই, আজ গোড়ার কথাটি বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

কিরূপে বঙ্কিম চাঁদশার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই সহায়তায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করেন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের লিখিত উক্তিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপন্যাসখানিতেও এই অংশ আছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে বর্জ্জিত হইয়াছে কারণ উপন্যাসের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার নয়, কলার উৎকর্ষ সাধন। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আজ আমরা বঙ্কিমের এই প্রচার-মূলক পরিত্যক্ত অংশ মাহেন্দ্রক্ষণে পাঠককে উপহার দিব।

"সীতারামের" প্রথম সংস্করণ হয় ১৮৮৭ মার্চ্চ ৪, কিন্তু সীতারাম "প্রচারে" প্রথম বাহির হয় ১৮৮৪, জুলাই, ১২৯১, শ্রাবণ। আমরা যে অংশ উল্লেখ করিতেছি, তাহা বাহির হয় "প্রচারের" ১২৯২ শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ ১৮৮৫, জুলাই। আমাদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৮৮৫ ডিসেম্বর মাসে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাব পাই কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠারও পূর্ব্বে।

বঙ্কিম লিখিয়াছেন, সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দির দর্শনে

চলিয়াছেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন যে, দেবমন্দির-দ্বারে দেবমূর্ত্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে বাবা তুমি ?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতা। "মুসলমান ?"

ফকির। "মুসলমানই বটে।"

সীতা। "আ সর্ব্বনাশ !"

ফকির। তুমি এত বড় জমিদার। হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল ?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান !

ফকির। দোষ কি বাবা ! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইলেন ?

সীতা। হইলেন বৈকি ? তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল ?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর ? ইনি করেন কি ?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

সীতা। ইনিই ; যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমানই ইঁহার মন্দির দ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইলেন ? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা ? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই

কি ইনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা অবশ্য—তোমরা মান না কেন?

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহঃ আছেন, তাহাতে তিনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম ইহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র উত্তর দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতি-ব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, "এইরূপ আমাদের দেশাচার।'

ফকির বলিল, 'বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান। উভরেই তোমার প্রজা হইবে। দেশাচরের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারখারে যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমানরাজ্য যাইবে; তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময় আবার আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাঁহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী, আরবী উত্তম জানে সে। তাহার উপর. সংস্কৃতও উত্তম জানে। এবং হিন্দু-ধর্ম্ম বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে, যদিও তাঁহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও (ভার্য্যাদ্বয়) লজ্জাত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি ন্যায্য। আমি সাধ্যানুসারে পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এই উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায়

জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকটে থাকিলে আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।”

ফকির। তুমি একটী কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামাপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার “**মহম্মদপুর**” নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতিরজমা থাকিব যে তুমি হিন্দু-মুসলমান সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল,—

“আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করি না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।”

গমনকালে ফকির তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পাঠক, পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, “প্রচারে” বঙ্কিমের মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু উপন্যাস প্রচার-কার্য্য নয় বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পুস্তকে পূর্ব্বোক্ত সব অংশই পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আজ সর্ব্বকালোপযোগী বঙ্কিমের এ কথাগুলি সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলে* জাতির মঙ্গলদায়ক হইবে। বাঙ্গলার হিন্দু ও

---

* বঙ্কিম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পরে, এই প্রবন্ধ ১৩৪৫ এর ‘বঙ্গশ্রী’ মাসিক

মুসলমান বঙ্কিমের এই কথাগুলি চিরন্তন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বাঙ্গলা দেশ আজ পরস্পরের বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হইত না ; এক অখণ্ড বাঙ্গলা একমন-প্রাণে জগতের সমক্ষে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারিত, বাঙ্গালী আবার সকলের পূজ্য আসন লাভ করিতে সমর্থ হইত।

বন্দেমাতরম্

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া "সাহিত্য পরিষদের" সভাপতি মনীষী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন লেখেন—

'বঙ্গশ্রী'তে আপনার 'বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়' প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। বেশ ভাল লাগিল।

"প্রচারে প্রকাশিত 'সীতারামের' এই অংশের কথা সাধারণে ভুলিয়া গিয়াছে, অথচ এ অংশটী বেশী দরকারী। এ প্রসঙ্গে 'রাজসিংহের' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাহিত্য পরিষদ হইতে বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর একটী ক্রিটিক্যাল সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সীতারাম এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সীতারাম মুদ্রণকালে সম্পাদকদিগের আপনার এই "বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়" প্রবন্ধ দেখা উচিত। সেইজন্য প্রবন্ধটী তাঁহাদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

আমার মানসিক কুশল—আশা করি আপনি বেশ সুস্থ আছেন। ইতি—শুভার্থী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

যাত্রার ইতিবৃত্ত

যাত্রা আমাদের দেশের একটী প্রধান আমোদ। এখনও মনে আছে, বাল্যকালে বহু দূরেও যাত্রা শুনিতে যাইতাম। যাত্রার কথোপকথন, যাত্রার গান, ও যাত্রার সঙ সবই আকর্ষণের বস্তু ছিল। কিন্তু তখনও যাহা শুনিতাম, তাহা নূতন যাত্রা। নূতন ও পুরাতন যাত্রায় বিশেষ পার্থক্য ছিল। নূতন যাত্রা হইত কতকটা থিয়েটারের অনুকরণে, পুরাতন যাত্রা হইত কৃষ্ণবিষয়ক। ইহাতে ভক্তির ভাবই বেশী প্রকটিত হইত।

আমাদের দেশে যাত্রা অনেকটা আধুনিক হইলেও, ইহার জন্মকাল কিন্তু প্রায় হাজার বৎসর আগে। তৎপূর্ব্বে নাট্যাভিনয় ভারতীয় কৃষ্টির একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। রামায়ণ মহাভারতের যুগ ছাড়িয়া দিলেও মহামনীষী ভাস, কালিদাস, শূদ্রক ও ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাট্যকার কেবল ভারতেই নয়, জগতে কবি ও নাট্যকারদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। অনেক পণ্ডিত কালিদাস ও সেক্সপিয়রের মধ্যে কে অধিকতর শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাটক ছাড়িয়াও অনেকের রচিত নাটক পল্লীতে পল্লীতে অভিনীত হইত।

কালক্রমে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েটারের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হয়। আবার ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে নাটকাভিনয় প্রবর্ত্তিত

হয়। আজও বাঙ্গলা নাটক যে অভিনীত হইতেছে, তাহা ইংরাজের থিয়েটারের অনুকরণে। তথাপি বলিতেই হইবে যে, নাটক প্রাচীন ভারতের নিজস্ব সম্পদ্। মুসলমান নৃপতিগণ ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া নাটকাভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। তবে এই ক্ষতির পূরণ হয় অন্য দিকে—কিন্তু তাহা কতকাংশে বটে। সেকথাই এখন বলিব।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গলা দেশ অধিকার করেন। ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর নিকট পরাভূত হন। ইহার ৫৪৪ বৎসর পরে বাঙ্গলা দেশ ইংরাজদের হাতে আসে, আর তাহার শতাধিক বৎসর পরে বাঙ্গলা নাটক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হইতে আরম্ভ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই দীর্ঘ সার্দ্ধ ছয়শত বৎসর কাল কি বঙ্গবাসীর কোন আমোদ প্রমোদের বিষয়ই ছিল না?

সত্য বটে, মুসলমান প্রভাবে নাটকের অধোগতি হইয়াছিল, কিন্তু একদিকে রাজসমাদরে যেমন কলাবতী গানের উন্নতি হইতে লাগিল, তেমনি আর একদিকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এবং ভক্ত কবিগণের ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাঙ্গলায়ও যাত্রা, কবি প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ করিল। বাহ্যতঃ নাটক ও যাত্রা উভয়ই প্রায় এক প্রকার; তবে যাত্রায় রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও যবনিকার আবশ্যক নাই, গানের আধিক্য বেশী। সকলে এক আসরে বসিয়া গান বাজনা করে এবং দুই তিন জন দাঁড়াইয়া সঙ্গীত ও উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করে। কিন্তু বাহ্যিক কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও পরস্পরের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। যাত্রার উদ্দেশ্য রসপুষ্টি, নাটকের উদ্দেশ্য চরিত্র-সৃষ্টি। সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্মী নর আপনাকে ভাঙ্গে, গড়ে এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্মবিকাশ করে।

ক্রিয়াবান্ নাটক এইজন্যই মানবের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। ক্ষুদ্র রঙ্গালয় মহানাট্যশালার অনুকৃতি মাত্র :—

All the world's a stage
All the men and women are mere players.
—"As you like it."

প্রাচীন ভারতের অভিনয়-গৌরব মুসলমানের আধিপত্য কালে বিলুপ্ত হইলেও যাত্রাদির মধ্যেই হিন্দুনাট্যকলা বাঁচিয়াছিল। বস্তুতঃ যাত্রাই দেশীয় নাট্যাভিনয়।

যাত্রা বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত। প্রাচীনকালে যাত্রা অর্থে দেবতাদের সম্মানের জন্য কোনও উৎসবকে বুঝাইত। জগন্নাথ-দেবের যাত্রা (স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা) হইতে এই উৎসব নামকরণ হওয়া সম্ভব। ভারত-নাট্যশাস্ত্রে যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতীমাধবেও 'যাত্রা' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উৎসব এবং পারিভাষিক উভয় অর্থেই যাত্রা শব্দ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং পৌরাণিক বিষয় লইয়াই যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। ধর্ম্ম ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হইত। থিয়েটারের ন্যায় যাত্রাও দেবপূজা সংক্রান্ত উৎসবাদি হইতে উৎপন্ন। যে অবস্থায় ইউরোপে 'মিষ্টিরিজ' আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গলায় সেই অবস্থাতেই বোধ হয় যাত্রা আরম্ভ হয়। অনেকেই মনে করেন "যাত্রা হইতে থিয়েটারের উৎপত্তি। 'ললিত-বিস্তারে' বুদ্ধদেবের অভিনয়-প্রীতি সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহা থিয়েটার

সম্বন্ধে নহে, যাত্রা সম্বন্ধে। বৈদিক স্তোত্রাদি ও কথোপকথনও তাঁহাদের মতে যাত্রারই প্রারম্ভ সূচনা করিতেছে।"*

আমরা কিন্তু এই সকল মনীষীদিগের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বস্তুতঃ যাত্রা এবং থিয়েটারের মূল এক হইলেও আর্য্য-সভ্যতা এবং উহার উচ্চ আদর্শের প্রভাবে শ্রেষ্ঠতম কলাবিদ্যাই নাট্যশাস্ত্র, নাট্যশালা এবং হিন্দুনাটকের অভিনয়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর বিরুদ্ধ সভ্যতার আঘাতে তাহা ম্লান হইয়া যাত্রার আকারে অন্যদিকে রূপান্তরিত হইয়া আপনার প্রাধান্যকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। থিয়েটার পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। যাত্রা কেবল মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল মাত্র। মুসলমান আমলে যখন নাটকাভিনয় নিষিদ্ধ ছিল, তখন ধর্ম্ম বা পুরাণমূলক উপাখ্যান 'যাত্রা'র আকারে অভিনীত হয়। ইহাই যাত্রার উৎপত্তি। ঐ যাত্রার গতি আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। থিয়েটারের আদর্শে এখন যে যাত্রার অভিনয় হইতেছে, তাহার সহিত পূর্ব্বকালের যাত্রার সম্বন্ধ খুব কম। থিয়েটার ও যাত্রা উভয়ের উৎপত্তির মূল এক হইতে পারে কিন্তু

---

* I. E. P. Harritz :—"Even the Vedic age knew Jatras, a venerable heirloom of Aryah antiquity. The gods of the Rigveda were hymned in choral procession. Some of the Samveda-hymns re-echo the rude mirth of the primitive Jatra-dances.

The Indian Theatre, P. 178, Footnote.

Dr. Hertel regards the Jatras of Bengal as consitituting a distinct age in the evolution of Indian drama.

যাত্রা থিয়েটারের কারণ নয়। এই অধ্যায়ে আমরা যাত্রার পৃথক্ গতিধারা নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রাচীন বাঙ্গলার যাত্রা শক্তিপূজার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। শুম্ভনিশুম্ভ বধ, বা অন্য কোন অসুর বধের উপাখ্যান লইয়া যাত্রাগানের পালা রচিত হইত। এক হিসাবে "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী"কে আমরা যাত্রার মূল নাট্য-সাহিত্য হিসাবেও গণ্য করিতে পারি। চণ্ডীতে মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মধুকৈটভকে বধ করেন বিষ্ণু এবং মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন স্বয়ং চণ্ডী। কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পর হইতে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচেষ্টা ও সাধনায় সরস বৈষ্ণব ধর্ম্ম যখন যুগধর্ম্মরূপে বাঙ্গলায় সমাদৃত হয়, তখন হইতে কৃষ্ণযাত্রা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে। জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" এবং তদনুকরণে রচিত কবিতা ও রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী প্রভৃতি যাত্রার ভাব ও বিষয়ের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণ ও সখীর কথাবার্ত্তা আছে। কৃষ্ণযাত্রার বিষয়ও প্রায় সেইরূপ। পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ লইয়া যাত্রার পালা রচিত হইত। এই সকল ভাবরসেই যাত্রার আসর জমিত দর্শকবৃন্দ রাধাকৃষ্ণের প্রেমরস পান করিয়া ভক্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইতেন, তাঁহাদের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইত, কখনও বা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত।

প্রথমে শক্তিযাত্রাই যে প্রচলিত ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু "শক্তিযাত্রা" এই নামটি প্রথমে ছিল না, শুধু 'যাত্রা' বলা হইত। কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত হওয়ার পর উহার নাম হইল কালীয়দমন।

কৃষ্ণ-যাত্রা মাত্রেই কালীয়দমন। 'দান' হউক, 'মান' হউক, 'মাথুর' হউক কিম্বা যে পালাই হউক, লোক সকল পালাকেই কালীয়দমন বলিতে লাগিল। এখন পর্য্যন্তও অনেকে এই নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণযাত্রার নাম কালীয়দমন কেন হইল, তাহার একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। এই সময়ে একজন বৈষ্ণব যাত্রা অভিনয়ের জন্য একটি বেশ সুন্দর নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটি পুষ্করিণীকে বেশ সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইত। ইহার নাম রাখা হইয়াছিল কালীয় হ্রদ। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড অজগর সর্প নির্ম্মাণ করা হইত। এই অজগর সর্পের নাম কালীয় নাগ। জলের উপরে কালীয় নাগের বিশাল ফণা বিস্তৃত, আর এই ফণার উপরে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেন আর মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-নৃত্য-পীড়নে কালীয় নাগের প্রাণ ওষ্ঠাগত। চারিদিকে কালীয় নাগের স্ত্রীগণ জল হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে,—কখনও কথায় কখনও বা গীতে। নিকটে এক মাচার উপরে মৃদঙ্গ করতাল, খরতাল, বাজিতে থাকিত এবং যাত্রাওয়ালারা বসিয়া "দোয়ার্কি" করিত। এই যাত্রা অভিনয় লোকের খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং 'কালীয়দমন' নামটাতে সকলে বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। তারপর কালীয়দমন ছাড়িয়া কৃষ্ণযাত্রার অন্যান্য পালা যখন আরম্ভ হইল, তখনও লোকে সেই কালীয়দমন নামই ব্যবহার করিতে লাগিল। কলীয়দমন কৃষ্ণযাত্রা, লোকে বুঝিল কৃষ্ণযাত্রা হইলেই কালীয়দমন।*

---

* গ্রন্থকারের "Thé Indian stage" ১১৬ পৃষ্ঠা।

অনেকদিন হইল কালীয় দমন যাত্রা একপ্রকার লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পর ইহার জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু। কালীয়দমন প্রায় চারিশত বৎসর কাল জীবিত ছিল।*

চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০।৩৫০ বৎসর কাল কালীয়দমন যাত্রার অভিনয় কাল ধরা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বে শক্তিযাত্রা, চণ্ডীর গান, মনসার গান প্রভৃতির প্রচলন ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যাত্রাগান হইত, কিন্তু সে সমস্ত প্রায়ই শক্তি বিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রার তখন সূত্রপাতই হয় নাই।‡ পূর্ব্বোক্ত ভাবে সব যাত্রাই কালীয়দমন যাত্রা নাম পরিগ্রহ করিবার পরে আবার শক্তিযাত্রাও মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। তখন কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রার নাম হইল কৃষ্ণযাত্রা আর শক্তি বিষয়ক যাত্রার নাম হইল শক্তিযাত্রা।

নাটকের প্রথমে যেমন নান্দীমুখ, যাত্রার প্রথমেও তেমনি গৌরচন্দ্রিকা। রূপ গোস্বামী তাঁহার "বিদগ্ধমাধব" ও "ললিতমাধব" নাটকের গুরুবন্দনায় চৈতন্যদেবের স্তুতি করিয়াছেন। তৎকালে গৌরবন্দনা মাঙ্গলিক কার্য্যের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল—বিশেষতঃ গীতবাদ্য অভিনয়াদিতে। এই বন্দনাই গৌরের উদ্দেশ্যে নিবেদন বা গৌরচন্দ্রিকা। সকল যাত্রাতেই এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। যাত্রা মহাপ্রভুর সময়েই প্রবর্ত্তিত হউক বা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত থাকুক, এই মঙ্গলাচারণ বা গৌরচন্দ্রিকা হইতেই যাত্রা গানে চৈতন্যদেবের প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

---

* বঙ্গদর্শন ফাল্গুন, ১২৮৯।

‡ সোমপ্রকাশ পত্রে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ।

যাত্রার ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী শিশুরাম অধিকারী নামক এক ব্রাহ্মণ যাত্রার গৌরব সম্পাদন করেন। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। সঙ্কীর্ত্তন ও কবি গানের প্রচারের ফলে তাহা প্রায় লোপপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছিল। শিশুরাম তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া পুনরায় প্রচলিত করেন। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল, তৎপর পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিপুষ্টি সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রচেষ্টা অনেক পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।*

শিশুরামের পূর্ব্বেও অনেক যাত্রাওয়ালা ছিল। কিন্তু তাহাদের কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ আমরা পাই নাই। শিশুরাম রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন।

গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যাত্রাও বলিতে পারা যায়, থিয়েটারও বলিতে পারা যায়। কারণ সঙ্গীতশালা বা 'উঠান' শব্দের উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রেও রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয়ে বহু অভিনেতার প্রয়োজন হইত এবং প্রত্যেক অভিনেতাই পৃথক্ সজ্জায় সজ্জিত হইতেন।

উপরোক্ত শ্রীদাম, সুবল, দুই সহোদর। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, পলাশী যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে এই দুই ভাই কালীয়দমন (কৃষ্ণযাত্রা) গান করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দেশে তখন ঘোর

---

* গ্রন্থকারের "The Indian stage" ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

বিবর্ত্তন, চারিদিকে একটা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময় বর্গীরা দেশ ছাড়ে, মুসলমানের রাজ্য যায়, কোম্পানীর ব্যবসা জাঁকিয়া উঠে। বাঙ্গলার রেশম, বাঙ্গলার কার্পাস, বাঙ্গলার থান, বাঙ্গলার কোরা বিদেশীদের শিরোভূষণ হয়। সেই সময় কবি, কীর্ত্তন, শিল্প, সাহিত্য সকলই জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। সেরূপ জাঁক তাহার পর আর হয় নাই। তখন ভারতচন্দ্র লেখক, কবিওয়ালা লালু, নন্দলাল, কীর্ত্তনওয়ালা বাঞ্ছারাম বৈরাগী, পুরাণ বক্তা (কথক) গদাধর শিরোমণি আর যাত্রাওয়ালা শ্রীদাম, সুবল।

"ইঁহারা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন, এই জন্য ইঁহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু হইতে পারিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র; অন্য কয়জনের কবিত্বে স্নেহ প্রণয় বাড়িয়াছিল, সেই স্নেহের তরঙ্গ বাঙ্গালীর অন্তরে অদ্যাপি বহিতেছে। বৈষ্ণবতা সতত স্নেহ প্রণয়ীর সঙ্গী। সুতরাং সেই সঙ্গে বৈষ্ণবতাও বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।"*

শ্রীদাম সুবলের দলে পরমানন্দ দাস নামে (হুগলী জেলার তারানিবাসী) এক বালক 'সখী' সাজিত। পরে ইনিই ওস্তাদের মান রক্ষা করেন। তাঁহার বেশ-ভূষায় কোন বাহুল্য ছিল না। বিলক্ষণ স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া গৃহস্থের বাড়ী হইতে দুইখানি শাড়ী চাহিয়া পরিতেন—এক-খানায় কুলাইত না। নাসায় একটি বেসর পরিতেন, যে বাড়ীতে যেমন জুটিত চাহিয়া অলঙ্কার পরিতেন। সঙ্গে খোল করতাল ছাড়া কিছু আনিতেন না। তিনি একাই দূতী সাজিয়া গালাগাল করিতেন, কৃষ্ণ,

* বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন ১২৮৯

রাধিকা এবং অন্যান্য সকলে উপলক্ষ থাকিত মাত্র। সকলের কথাই তিনি একা নানা ভাবে কহিতেন ও গাহিতেন, আর শ্রোতারা তাঁহার যাত্রা শুনিয়া হাসিত, কাঁদিত, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া শুনিত।

পরমানন্দের যাত্রা যিনি শুনিয়াছেন তিনি জানেন যে, আসরে আসিয়া প্রেমানন্দ যখন গান করিতেন "নবরে নবরে নিতুই নব, যখনি হেরি তখনি নব" মনে হইত, তিনি যেন দুইটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় লইয়া খেলা করিতেছেন, দুইটিকে কখনও পরস্পরের খুব কাছে আনিতেছেন, কখনও বা দূরে রাখিতেছেন, আর সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন তাঁহাদের প্রাণে অপরিসীম চাঞ্চল্য। 'মানের' পালায় তাঁহার এই ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। 'মান' বাঙ্গলা ভাষায় একমাত্র নাটক বা **drama,** বোধ হয় একমাত্র প্রথম নাটক। **Drama** বলিয়াই বোধ হয় 'মান' লোকের কাছে এত মিষ্ট লাগিত। পরমানন্দের যাত্রায় গীতের ভাগ খুব বেশী ছিল না। কাব্যরস সৃষ্টি করিবার জন্য পরমানন্দ কথাবার্ত্তাই অধিক বলিতেন। সেই কথাবার্ত্তার মধ্যে যে যে অংশে গীত ছিল তাহা প্রায়ই পয়ার ছন্দে রচিত এবং সাধারণতঃ পয়ারের সুরে গাওয়া হইত। পয়ারের-সুরে গাহিতে গাহিতে গানের শেষ লাইনের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যটুকু শ্রোতার কর্ণে নিঃশেষে ঢালিয়া দিবার জন্য শেষ পদটি পরমানন্দ কীর্ত্তনের সুরে গাহিতেন। সমস্ত শ্রোতা যেন মাধুর্য্য রসে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। এই প্রণালীকে তখন তুক্কো বলা হইত। আর পরমানন্দই ছিলেন ইহার স্রষ্টা। 'পরমার তুক্কো'র ন্যায় সুশ্রাব্য সঙ্গীত বাঙ্গালায় সৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই অনেকের ধারণা। পর পৃষ্ঠায় দুই একটি তুক্কো উদ্ধৃত করা গেল :—

(১) "সারা বন বুলে বুলে
বনফুল আনলাম তুলে
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলে,
কিনা তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে বলে।"

(২) "বঁধু যেতে যেতে, প্রাণের বঁধু
যেতে যেতে
রথ হতে কি কথাটি বল্‌তেছিল।
বলতে বলতে অমনি বঁধুর
মুখের কথা মুখে রইল
নয়ন জলে ভেসে গেল।"

পরমানন্দের যাত্রা দর্শকগণকে অন্তোপান্ত শুনিতে হইত। এই যুগে কাব্যরসের সৃষ্টি করাই ছিল যাত্রাওয়ালাদের উদ্দেশ্য। তাই সম্পূর্ণ পালাটি না শুনিলে শুধু দুই একটি গান শুনিয়া রস গ্রহণ করা সম্ভব হইত না। দর্শকগণের মনে ধরিতেছে না বুঝিলে তাহারা আসরে সং আনয়ন করিত এবং পুনরায় রসসৃষ্টি করিবার জন্য নূতন করিয়া পরিশ্রম করিত।

পরমানন্দের সমসাময়িক আর একজন যাত্রাওয়ালা ছিলেন, তাঁহার নাম প্রেমচাঁদ। তিনি 'থরকাটা প্রেমা' নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। ইঁহার গানে তুক্কো ছিল না, সমস্ত গানই ছিল চৌপদী। কীর্ত্তনে তিনি যাহা গাহিতেন, তাহা একটু মাজিয়া ঘষিয়া লইতেন। খাঁটি মহাজনী পদ 'পত্তন' দিয়া গাহিলে সাধারণ লোক ভাল করিয়া

বুঝিতে পারিত না। এই জন্য প্রেমচাঁদ মহাজনী পদ হালকা করিয়া সেই পদের পুরাতন ভাষার সঙ্গে প্রচলিত ভাষা মিশাইয়া মাজিয়া ঘষিয়া যাত্রা-গান করিতেন। শুনিয়া সাধারণ লোক একেবারে মাতিয়া উঠিত। সেই অবধি স্ত্রীলোকের কীর্ত্তনের ব্যবসা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের মুখে কীর্ত্তন শোনা নিষিদ্ধ ছিল।*

প্রেমচাঁদের 'ছোকরা' বদন, যাত্রাওয়ালা হইয়া তাহার গুরুর পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কালীয়দমন যাত্রা করিত। পরমানন্দের 'ছোকরা' গোবিন্দ অধিকারী অল্প কিছুদিন যাত্রা করিয়াই গুরুপ্রদর্শিত তুক্কো পরিত্যাগ করিলেন এবং ইচ্ছামত নানা সুরে গান রচনা করিয়া যাত্রার আসরে গাহিতেন। দাশরথি রায়ের অনুপ্রাসে তখন সকলেই মুগ্ধ হইতেন। গোবিন্দ অধিকারীও তাহার রচিত গানে অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ দ্বারা শ্রোতার প্রাণে অমৃত ঢালিতে লাগিলেন। পুরাতন তুক্কোর স্থান অনুপ্রাস আসিয়া অধিকার করিল এবং যাত্রার আসর জমকাইয়া বসিল। বদন কিন্তু তুক্কো ছাড়িল না, বরং আরও ঘষিয়া মাজিয়া যাত্রার মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিল। বদনের পরেই কালীয়দমন প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। বদনের পুত্র ক্ষেত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র যদুনাথ ও ব্রজনাথ (ছোকরা বলিয়া পরিচিত) কিছুদিন তুক্কো রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারাও অধিক দিন যাত্রা করে নাই।

গোবিন্দ অধিকারীর বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরের জাহাঙ্গীর পাড়ায়। অনুমান ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কালীয় দমন যাত্রায়

---

* বঙ্গদর্শন ১২৮৯

প্রথমে তিনি দূতী সাজিতেন। তাঁহার দূতীর ভূমিকা অভিনয় দেখিবার জন্য বহু দূর হইতে লোক ছুটিয়া আসিত। গোবিন্দ অধিকারীর রচিত ভাবপূর্ণ ভক্তিরসাশ্রিত অনুপ্রাসবহুল সঙ্গীত তাঁহারই মুখে গীত হইয়া শ্রোতাকে এমনই মুগ্ধ করিত যে, কোথাও গোবিন্দের যাত্রা হইতেছে শুনিলে বহুদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলবদ্ধ হইয়া আগমন করিত এবং যাত্রা আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আসরে যাইয়া বসিয়া থাকিত। এত জন-সমাগত হইত যে, আসরে তিল ধারণের স্থানও থাকিত না। তাঁহার "শুক শারীর পালা" ও "চূড়ানূপুরের দ্বন্দ্ব" এক সময়ে সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি যখন সুর ধরিতেন—

(১) নূপুর শোনরে শোন, বিনে সুজন, সুজনের বেদনা জানে না,
অবোধ যদি উচ্চ ভাসে, সুবোধ বুঝায় মৃদুভাষে,
ভায়ের অভাসে ভাসে, কভু ডুবে না।

(২) বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত্ব যায়,
গেলে একদিন বড়ই পায়
বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগে না॥

সুরের সেই ঝঙ্কারে প্রাণে মধুবর্ষণ করিত, সকলের চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া যাইত।

গোবিন্দ অধিকারী পুরাতন পদ্ধতির যাত্রা কেন পরিত্যাগ করিলেন, আমরা এখানে তাহাই কিঞ্চিত আলোচনা করিব। কৃষ্ণযাত্রা বেশীদিন রহিল না আভ্যন্তরিক কারণের জন্য, মুসলমান প্রভাবের জন্য নহে। কারণ, যাত্রার আসরে কি গান হইত, সে সম্বন্ধে মুসলমান নৃপতিগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার

নব পর্য্যায়ে থিয়েটারের সূত্রপাত হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গলার প্রচলিত আমোদ-প্রমোদ লুপ্ত হইতে বসিল। কলিকাতা নগরীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর হিন্দুস্থানী এ দেশে আসিয়া সাধারণের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বহু মহারাষ্ট্র যুবতী বাঈজীরূপে বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। ধনাকাঙ্ক্ষীরা মাড়োয়ারীদের অনুগত হইল। ধনবানেরা মহারাষ্ট্র বাঈজীদের সেবা করিতে আরম্ভ করিল। এই বাঈজীরাই বাঙ্গলা সঙ্গীতের সর্ব্বনাশের কারণ। ইহাদের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে গায়িকার প্রচলন বড় ছিল না। কীর্ত্তন গাহিত পুরুষেরা, যাত্রাও পুরুষেরাই করিত। এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গলার কীর্ত্তনের সুর সুদূর পাঞ্জাব পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। কীর্ত্তনের সেই সুর বাঈজীদের আগমনে লোপ প্রাপ্ত হইতে বসিল। খোল করতালের গোলমাল বাবুদের আর ভাল লাগিল না, তবলার টিমটিমি বোল তাঁহাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। টপ্পার হাল্কা সুর এবং তবলার সঙ্গৎ প্রবর্ত্তনের আয়োজন চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ব্যবসায়ীদের উপার্জ্জনও কমিতে লাগিল। তাই গোবিন্দ অধিকারীকে যাত্রাগানের পুরাতন পদ্ধতির সহিত কালোপযোগী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল এইরূপে "সখের যাত্রা" ক্রমে কৃষ্ণযাত্রাদির স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এই সময় বাঙ্গলার উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ প্রদেশ হইতেও অনেক যাত্রার দল আসিয়া এ দেশে আসর জমাইয়া রাখিয়াছিল। এই যাত্রা অনেকটা আধুনিক নাটকের অনুরূপ কথোপকথন-বহুল ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমই এই যাত্রার বর্ণিত বিষয়; কটক জেলা হইতে

আগত ব্রাহ্মণকুলজাত বালকগণ কর্ত্তৃক এই যাত্রা অভিনীত হইত। গ্রীক chorus-এর সহিত এই যাত্রার অনেক সাদৃশ্য ছিল।*

গোবিন্দ অধিকারী অভ্যুদয়ের সময়ে "অক্রুর-সংবাদ" এবং "নিমাই সন্ন্যাস" পালা গাহিয়া লোচন অধিকারী শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ ভাবে বিমুগ্ধ করিতেন। শোনা যায়, লোচন অধিকারীর যাত্রায় করুণ রসের আধিক্যে এত অশ্রু তরঙ্গ প্রবাহিত হইত যে, কোনও এক ধনী ব্যক্তি ক্রন্দনের ভয়ে লোচন অধিকারীকে নিজ বাটীতে আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই।

এই সময় "নল দময়ন্তী" যাত্রা, ব্রজমোহন অধিকারী এবং রামসুন্দর অধিকারী যাত্রা বিশেষ রূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। নল দময়ন্তীর পর "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এই "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রাই সখের যাত্রা নামে পরিচিত হয়।

সখের যাত্রা প্রচলিত হওয়ার পর হইতে যাত্রার ইতিহাসে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহার পর হইতে যাত্রায় রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের স্থান বিদ্যা এবং সুন্দরের মানবীয় প্রেম আসিয়া অধিকার করে। যাত্রার এই পরিবর্ত্তন বাঙ্গলার সমাজ জীবনেরও পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে। সখের যাত্রা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে যাত্রার আসরে স্ত্রীলোক কখনও নামে নাই। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতের আসরে স্ত্রীলোকও গাহিবার অধিকার লাভ করে। এইরূপ একটী যাত্রার দলের সংবাদ পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল :—

---

* গ্রন্থকারের "দি ইণ্ডিয়ান" ষ্টেজ ১২৬ পৃষ্ঠা।

"গ্লী ক্লাব" (Glee Club) কর্ত্তৃক "নন্দ বিদায়" নামক একটি নূতন যাত্রা অভিনীত হয়। দর্শকবৃন্দ এই নূতন যাত্রার খুব প্রশংসা করেন। বাবু রামচন্দ্র মুখার্জ্জি জোড়াসাঁকোর একজন বিশেষ ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। জোড়াসাঁকোয় একটি হাফ আখড়াই দল ছিল। উহাই কলিকাতার আদি সঙ্গীত সমাজ। রামবাবু এই হাফ আখড়াই দলকে যাত্রার দলে পরিবর্ত্তিত করেন এবং স্বয়ং উহার সেক্রেটারীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই দলের কবিও ছিলেন তিনিই। এক্ বৎসরের মধ্যে এই দলের জন্য প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়। পুরুষ অভিনেতা ব্যতীত এই দলে দুইটি বালিকাও ছিল। বড়টির বয়স প্রায় ১২ বৎসর ছিল, তাহার নাম ছিল সিদাম। ছয় সাতটি বালকও এই দলে ছিল। রাত্রি নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইয়া প্রাতে সাতটায় শেষ হইত। *

ইহা ১৮৪৯ সালের কথা।

সখের যাত্রা

কোন ধনী ব্যক্তি 'সখ' করিয়া নিজ ব্যয়ে একটি যাত্রার দল গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া অতঃপর এবম্বিধ যাত্রা 'সখের যাত্রা' নামে অভিহিত হয়। সেই সময়ে উহাকে রিফরম্‌ড (reformed) যাত্রাও বলা হইত। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, তখন বাঙ্গলা সঙ্গীতের ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

---

* গ্রন্থকারের "দি ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ" ১১২ পৃঃ।

খোল ও নূপুর লোপপ্রাপ্ত হয় এবং তবল ও ঘুমুর তাহাদের স্থান অধিকার করে, মহাজনী পদের স্থান অধিকার করিল নূতন রচিত গীতিকা, আর তাহাতে সংযোজিত হইল নূতন সুর। পশ্চিম দেশীয় টপ্পার সুরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। নূতন বলিয়া এই যাত্রার দিকে লোকের মন বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হইল। ক্রমে এই যাত্রা পেশাদারী যাত্রায় পরিবর্ত্তিত হইলেও নামটা সখের যাত্রাই রহিয়া গেল। লোকে মনে করিত ঢোলক ও তবলা থাকিলেই সখের যাত্রা, আর খোল করতাল থাকিলে কালীয়দমন। আরও একটী পার্থক্য ছিল। দেবতার প্রসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণ-যাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা হইতে পারিত না। সখের যাত্রার বিষয় ছিল কখন বিদ্যাসুন্দর, কখনও বা নল-দময়ন্তী। ক্রমে কালীয়দমন একেবারে উঠিয়া গেল। তারপর সখের যাত্রার 'সখের' কথাটা উঠিয়া শুধু যাত্রায় পরিণত হইল।

পূর্ব্বে সখের দলের মধ্যে ভবানীপুর, বেলতলার এবং আঁড়িয়াদহের যাত্রাই সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বহু অনুসন্ধানের ফলে যাত্রার দলের ইতিহাস যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

বৌবাজারে প্রথম সখের যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। শোনা যায়, রাধামোহন সরকার নামক এক ধনী ব্যক্তি বৌবাজারের যাত্রার দল গঠন করেন, কিন্তু ইনিই সখের যাত্রার প্রথম প্রবর্ত্তক কি না, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না।

সখের যাত্রাভিনয় সম্পর্কে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে

আঁড়িয়াদহেই প্রথম সখের যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পিতা রামজয়ের নামে এই দল গঠন করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর তখনও মুদ্রিত হয় নাই—হস্তলিখিত পুঁথি হইতে অভিনয়োপযোগী দৃশ্য বাছিয়া লওয়া হয়। এই কার্য্যে প্রাণকৃষ্ণ তর্কলঙ্কার এবং নিমাই মিত্র বিশেষ সহায়তা করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অভিনয় করিয়াছিলেন :—

রাজা—রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়

সুন্দর—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যা—ঈশান (রাধামোহনবাবুর পুত্র)

রাইবাঘিনী—নিমাই গাঙ্গুলি

নান্দীর গান গাহিয়াছিলেন নিমাই মিত্র ও তাঁরাচাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ের অল্প কিছুদিন পরে এই দলের প্রবর্ত্তক ও অধিকারী ঠাকুরদাস বাবু এবং আরও কয়েকজন অভিনেতার মৃত্যু হওয়ায় অশুভসূচক বলিয়া দলটি ভাঙ্গিয়া যায়।

অতঃপর দক্ষিণ বরানগরে ও জনাইতে দুইটি উৎকৃষ্ট বিদ্যাসুন্দর দল গড়িয়া উঠে। দক্ষিণ বরানগরে মধু ভট্টাচার্য্য—মালিনী, গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়—রাজা, রামচন্দ্র ভাদুড়ী—বিদ্যা, রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সুন্দর সাজিতেন। মধু ভট্টাচার্য্য সুবক্তা, কথক এবং সুগায়ক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বরানগরের বিখ্যাত পালোয়ান কালী চাটুর্য্যের আত্মীয় এবং দলের অন্যান্য সকলেই খুব সুপুরুষ ছিলেন।

শ্যামবাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয় বিদ্যাসুন্দরকে ভিত্তি করিয়াই নাট্যশালার প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র প্রদান করিব। উক্ত থিয়েটার ২।৪ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু তাহাতেও খুব ব্যয় হইত। তাই তখনকার দিনে যাত্রাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল।

একদিকে পশ্চাত্ত্য অনুকরণে সখের যাত্রা এবং থিয়েটার, আর একদিকে দেশীয় প্রথায় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা, দুই-ই তখন প্রচলিত ছিল। যদিও সখের যাত্রা ও থিয়েটারের দিকে লোক অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি দেখা যাইত, গোবিন্দ অধিকারীর আসরে লোক ধরে না। গোবিন্দকেও অবশ্য যুগোপযোগী করিয়া তাহার যাত্রার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তাই কালীয়-দমনের পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

সঙ্গতি-সম্পন্ন বাবুদের সখের থিয়েটার অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু পেশাদারী সখের যাত্রা বেশ চলিতে লাগিল। অন্যান্য স্থান হইতে এইরূপ পেশাদারী যাত্রার দল আসিয়া কিছুদিন গীতাভিনয় করিবার পর স্থানান্তরে চলিয়া যাইত। এইরূপ দুই একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

(১) মণিপুর হইতে একটি যাত্রার দল কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহারা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলা অভিনয় করিত। বাদকগণ সকলেই ছিল পুরুষ কিন্তু গায়িকারা স্ত্রীলোক। তাহারাই কৃষ্ণ, ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, বিদ্যাধরী,

ইন্দুলেখা প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয় করিত। গোপীদিগের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহাদের চেপ্টা নাক মোটেই মানাইত না।

(২) বাবুদের বাড়ীতে হলধরের সম্প্রদায়ও খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিত। তাহারা বিদ্যাসুন্দর, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ এবং অন্যান্য পালা অভিনয় করিত। *

ইহা ১৮২৮এর কথা।

বরানগর তখন সঙ্গীতাদির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নবীন বাবুর দলে যিনি সুন্দর সাজিতেন, তিনি ছিলেন এখানকার লোক (ভবানীপুরবাসী)—নাম শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বরানগরের আর একটী সুগায়ক ছিল, নাম প্যারী। বেহালা বাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। প্যারী দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল। ভবানীপুরের একটি সঙ্গতি-সম্পন্না বারাঙ্গণা তাহার গীতবাদ্যে মোহিত হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিছুদিন একসঙ্গে বাস করিয়া উভয়ে একটী যাত্রার দল গঠন করে এবং নলদময়ন্তী পালা গান করিতে আরম্ভ করে। দর্শকগণ এই যাত্রা শুনিয়া খুব প্রীতিলাভ করিয়াছিল। ভিক্ষোপজীবী প্যারী অতঃপর প্যারীমোহন নাম গ্রহণ করিয়া একটী প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিল। এই দলই ভবানীপুরের দল বা বেলতলার দল নামে খ্যাতি লাভ করে। অতঃপর স্ত্রীলোকের নেতৃত্বেও একাধিকবার বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল গঠিত হইয়াছিল। "তারাহারার" দল ও "বৌ-মাষ্টারের" দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* গ্রন্থকারের "দি ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ" পৃঃ ১২৮।

কলিকাতার ভবানীপুরের রামকুমার কাঁসারী ছিলেন এই যুগের একজন প্রধান ওস্তাদ। নৃত্যগীতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং তিনি খুব ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতেন। প্যারীমোহনের দলে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

রামধন সূত্রধরের দলও এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রতি রাত্রি অভিনয়ের জন্য সে ৫০৲ ৬০৲ টাকা করিয়া পাইত। তাহার দলে ফুরণের বন্দোবস্ত ছিল। উদ্বৃত্ত অর্থ নিজে এক অংশ লইয়া অবশিষ্ট তিন ভাগ দলের সকলকে ভাগ করিয়া দিত। শাল, বনাত প্রভৃতি উপহারের জিনিষপত্র সে নিজেই লইত। লোকে রামধনকে ওস্তাদজী বলিয়া ডাকিত। গঙ্গাসাগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহার খ্যাতি বিস্তৃত ছিল।

সখের যাত্রায় গোপাল উড়েই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহার যশ বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় সকল জায়গা হইতেই তাহার "বায়না" আসিত। গোপাল উড়ের বাড়ী কটক জেলায় জাজপুরে। কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে নানা প্রকার মনোহারী দ্রব্যাদি ফেরি করিত। পরে সে বহুবাজারের ধনী রাধামাধব বাবুর যাত্রার দলে যোগ দেয়। গোপালও ছিল সুকণ্ঠ গায়ক এবং দেখিতেও ছিল খুব সুশ্রী। সে মালিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিত। তাহার সুশ্রী চেহারা এবং সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্য মালিনীর অভিনয়ে সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, রাধামাধব বাবু তাহার মাসিক বেতন একেবারে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দেন। রাধামাধবের মৃত্যুর পর গোপাল তাহার হুগলী জিলান্তর্গত সিঙ্গুর গ্রামের দলের সমস্ত জিনিষপত্র পাইয়া নিজেই

একটি দল গঠন করে। ভৈরব হালদার নামক এক ব্যক্তির দ্বারা সে অতি সহজ ভাষায় গান রচনা ও সুর যোজনা করাইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিত্তবিনোদন করিত। গানগুলির রচনা-ভঙ্গী ছিল এমন সুন্দর যে, গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচও চলিতে পারিত। ইহার উপর সে দেখিতে ছিল সুশ্রী, স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ তাহাকে পুরুষ বলিয়া সহজে ধরিতে পারিত না।

চাষা-ধোপাজাতীয় কাশী নামক এক ব্যক্তি নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। অনেক যাত্রার দলে সে নৃত্যশিক্ষা দিত এবং ইহা ব্যতীত অনেক পুরুষ এবং স্ত্রীলোকও তাহার নিকট নৃত্য শিক্ষা করিত। কাশী গোপাল উড়ের যাত্রায় যোগদান করিয়া মালিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত। মালিনীর ভূমিকায় কাশীর নৃত্য হইতেই যাত্রায় খেমটা নাচের প্রচলন হয়। গোপাল উড়ের যাত্রায় উমেশ এবং ভোলানাথ দাস যথাক্রমে বিদ্যা ও সুন্দরের পার্ট অভিনয় করিত।

গোপালের রস সৃষ্টি করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

বিদ্যাসুন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী। পূর্ব্বে গোপালই মালিনী সাজিত। সুন্দর তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিলে মালিনীবেশী গোপাল ভগ্নবীণার সুরে বলিত,

"যাদু এমন কথা কেন বল্‌লি
ভোরের বেলা সুখের স্বপন এমন সময় জাগালি।"

মালিনীবেশী গোপাল হীরা মালিনীর রূপের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে,

যখন বামুনপাড়া ফুল যোগানে গমন করি, তখন পূজাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ এই পক্ককেশী রূপবতীকে দেখিয়া—

"রহে কোশাকুশি অমনি ধরে।"

অন্যত্র গোপাল বিদ্যার ভূমিকায় হীরা মালিনীকে লক্ষ্য করিয়া গান ধরিত—

"ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে খোঁপা বেঁধেছ
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ—"

সন্ন্যাসী-বেশী সুন্দরের সহিত বিদ্যার বিবাহ হইবে ইহা লইয়া হীরা মালিনী ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে—

আখড়াধারী মহৎ আশ্রম
অতিথ আসবে রকম রকম
গাঁজাতে লাগাবি লো দম,
বোম কেদার বলে—"

এই সকল গানের সঙ্গে নাচও চলিত। গোপালের যাত্রা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে বাঙ্গলায় এমন স্থান ছিল না, যেখান হইতে গোপালের বায়না না আসিত।

যাত্রায় যে রস-সৃষ্টি হয় না তাহা নহে। বস্তুতঃ রস-সৃষ্টিই যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য। রসপূর্ণ রচনা আদর পাইলে সমাজেরই রসগ্রাহিতার

পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণযাত্রায় রস সৃষ্টি কম হয় নাই, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে তাহা প্রায় দেখা যাইত না, দেখাইবার স্থানেরও অভাব ছিল। বকুলতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ, মালিনীর বাড়ীতে তাহার বাস এবং দৌত্যকর্ম্মে মালিনীর প্রবৃত্তি এই কয়েকটি অংশ লইয়া সচরাচর যাত্রা হইত। ইহাতে বিচ্ছেদ ও করুণ রস নাই, বিষাদ যেটুকু থাকিত, নাচের প্রাবল্যে দর্শক তাহাও ভুলিয়া যাইত। বিদ্যা বিষাদক্ষিন্ন হইয়া গায় ও নাচে দর্শকগণ বাহবা দেয়—বিদ্যা আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে, আসরে হাস্য ও অদ্ভুত রসের পুষ্টি হয়। 'বিদ্যাসুন্দরের' যাত্রায় এই ভাবে করুণ রসের স্থানে অদ্ভুত রসের অবতারণা হইত।

রুচি ও শ্লীলতার দিক দিয়াও বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের অযোগ্য হইয়া উঠিল। বলিতে কি, শিক্ষিত সমাজের পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা এক সঙ্গে বসিয়া এই অভিনয় দেখিতে পারিত না। গানগুলি প্রায়ই জঘন্য রুচির পরিচয় দিত। এইরূপ অভিনয় দর্শনে লোকের আগ্রহ দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—

"আধুনিক যাত্রায় বিদ্যা, মালিনী ও সুন্দরের প্রাদুর্ভাব। পল্লীগ্রামের যৌবনোন্মুখী সরলা যুবতীগুলি বিদ্যার মুখে নিম্নলিখিত বা তদনুরূপ গীত শুনিলে তাহাদের কিরূপ শিক্ষা হয়—?

"এখন উপায় আয়ি কর তারে আনিতে।
কামানলে জ্বেলে ছলে, ভুলে আছে মনেতে!
কবে সে সুদিন হবে, সুধাকর প্রকাশিবে।
বারিবিন্দু বরষিবে, চাতকীরে বাঁচাতে।"

পিতা পুত্র-কন্যা লইয়া শুনেন, লজ্জা করে না সেই পুত্র-কন্যা জ্ঞানবান্ হইলে পিতামাতাকে কিরূপ ভাবিবে ?" *

যাত্রা গানের কদর্য্য রুচি শিক্ষিত লোকের মনে যাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিয়াছিল, তারপর শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ-প্রমোদের প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই জন্য থিয়েটার শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিল। নাট্যকার রামনারায়ণ স্পষ্টই বলিলেন, "সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটক সমূহের অতুলা রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে।"

নাট্যকার মনোমোহন বসুও বলিলেন, "জঘন্য যাত্রার প্রাদুর্ভাবে অশ্লীল রসের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল।" সঙ্গে সঙ্গে যাত্রায় সেই যে ভাঙ্গন ধরিল, আর তাহাকে রক্ষা করিতে পারা গেল না। কৃষ্ণযাত্রায়ও—'এবে প্রকাশ করিয়া বল দেখি'—বলিয়া যে উপর্য্যুপরি গান হইত, তাহা কাহারও ভাল লাগিত না। অতঃপর যাত্রার এক নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল—ইহার নাম অপেরা। কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিত "অপ্পেয়েরা।" এখনও অনেক স্থানে এই যাত্রা চলিতেছে। ইহাতে শামলা আছে, প্যাণ্টুলন আছে, পোষাক আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন-উত্থান আছে। আগে যাত্রায় ছিল গানের আধিক্য—তাই লোকে ইহাকে বলিত গীতাভিনয়। এখন দেখিবার জিনিষই বেশী, সঙ্গীত ও কাব্য রসের অভাব।

* বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯।

বাবু বিনোদপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী প্রণীত শকুন্তলাই প্রথম বাঙ্গালা অপেরা। ইহার ভাষা সরল, রচনাভঙ্গী সরস! শকুন্তলার অভিনয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে বৌবাজারের দত্তদের বাড়ীতে অপেরা অভিনীত হইয়াছিল। এই সময় যে তিনখানা অপেরা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পদ্মাবতীই ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।*

থিয়েটারের অনুকরণে যাত্রার অনেক উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাত্রার দিকে জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমেই হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল। শেষে যাত্রা ও থিয়েটারের পার্থক্য ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং যাত্রা থিয়েটারের সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল।

এই নূতন পর্য্যায়ের যাত্রারও এমন কতকগুলি বিষয় ছিল, যাহা রসসৃষ্টির বিঘ্ন জন্মাইত। **জুরীপ্রথা** ইহাদের মধ্যে একটী। প্রত্যেক যাত্রার দলেই কয়েকজন—সাধারণতঃ চারি জন লোক, চোগা চাপকান পরিয়া আসরে যাইয়া বসিত। ইহারাই জুরী নামে অভিহিত। দশ পনর মিনিট পরে পরেই তাহারা উঠিয়া নানারকম সুরে বিকট চীৎকার করিয়া গান ধরিত, তাহারা যেন কিছুতেই আর থামিতে চাহিত না। তাহারা অবশ্য অনেক প্রকার সুর, তান, মান, লয়ের সৃষ্টি করিত, সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞদের নিকট হয়ত উহার একটা বিশেষ মূল্যও ছিল, কিন্তু সাধারণ শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যের উপর জুরীপ্রথা ছিল এক প্রকার অত্যাচার বিশেষ। জুরীগণ গান করিতে উঠিলে অধিকাংশ শ্রোতাই বিরক্ত হইয়া উঠিত।

* গ্রন্থকারের "দি ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ" ১২৬ পৃঃ।

যাত্রা গানের রুচি

অতঃপর, লেখকগণ যাত্রা না লিখিয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরবর্ত্তী অনেক বাঙ্গালা-নাটকে যাত্রার প্রভাব দেখা গেলেও যাত্রার প্রতি লোকের আগ্রহ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সময়ের গতিকে রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের ন্যায় তৎকালীন অনেক বিখ্যাত লেখক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যাত্রাগানও ভারতের প্রাচীন নাটকের অনুরূপ হউক—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছিলেন, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর এবং নলদময়ন্তীর অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ আনন্দ লাভ করিত বটে, কিন্তু এগুলির অভিনয়পদ্ধতি এত হীন রুচির পরিচয় প্রদান করিত যে, কেবল কদর্য্য রুচি-সম্পন্ন লোকেরাই উহাতে তৃপ্ত হইত। ভদ্রসমাজের মার্জ্জিত রুচি তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না।

থিয়েটার প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে কবি, পাঁচালী, হাফ আখড়াই এবং যাত্রাই জনগণের চিত্তবিনোদ করিত। হাফ আখড়াই, কবি এবং পাঁচালীতে অশ্লীল গালিগালাজ চলিত এবং সাধারণ লোকের ঐ সকল গালিগালাজ ভালও লাগিত। যাত্রাতে কথাবার্ত্তা বড় একটা ছিল না। দু'একটা কথার পর—'তবে প্রকাশ করে বলো দেখি' বলিয়া গান আরম্ভ হইত। এই গানের কত আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর ছিল সঙের। সঙ হালকা সুরে গাহিত। অপেক্ষাকৃত ভারী অঙ্গের পালার সুর হইতে

সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ গালাগালি দিত; তাহা লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির এত আদর হইত যে, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকে-সম্পাদকে অতি অব্যক্ত ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত। যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন, আদর তাঁহার বেশী ছিল। ইংরেজী বিদ্যার কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে, সমাজের এরূপ রুচি ভাল নয়। সমাজের বড় বড় লোক নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে নাটকের বড় চটক হইল।"*

থিয়েটারের ক্ষতি লাভ উভয়ই হইয়াছে। যাত্রায় কতকগুলা অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল, তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীত-স্রোতও লোপ পাইল। কৃষ্ণ-লীলার মধুর রসপূর্ণ গান—মহাভাবুকের রচিত বিলুপ্ত হইতে চলিল, আমরা নৈতিকত্ব হারাইলাম---অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

সেই যুগের গোবিন্দ অধিকারী, নারায়ণ দাস, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় রসিক চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাগণ মহাভাবুক ব্যক্তি ছিলেন, স্বধর্ম্মে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, সাজসজ্জা এবং দৃশ্যপটাদি ব্যতীতই তাঁহারা দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন।

---

* বর্ত্তমান রঙ্গভূমি।

পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রাভিনয়

কলিকাতা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ যখন ভারতচন্দ্রের আদিরস ঘটিত গান ও ভাবভঙ্গীতে ভরপূর, পূর্ব্ববঙ্গ তখন কৃষ্ণলীলার গানে মুখরিত। ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রায় বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। ঢাকায় যাত্রা ও কবির অভাব ছিল না, কিন্তু প্রেমরসমাধুর্য্য পূর্ণ স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও বিচিত্রবিলাস এই তিন-খানি পুরাণ যাত্রা ঢাকায় যে ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, আমরা এখানে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। অনুমান ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে "স্বপ্নবিলাস" রচিত হয়। অনেক যাত্রার দলে এই বইখানি অভিনীত হইয়াছিল। এই বইখানির খুব বিক্রয় হইয়াছিল। "বিচিত্রবিলাসের" ভূমিকায় গ্রন্থকার কৃষ্ণকমল "স্বপ্নবিলাস" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "সাধারণের কাছে বইখানা নিশ্চয়ই খুবই ভাল লাগিয়াছিল, তাহা না হইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ২০০০০ হাজার বই বিক্রয় হইবে কেন?" বিক্রমপুরের কৃতি সন্তান ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই তিন খানি বই সঙ্গে লইয়া বার্লিন, সেণ্ট পিটার্সবার্গ প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন এবং তিনখানি পুস্তক অবলম্বন করিয়া "**The Popular Dramas of Bengal**" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক-খানি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুস্তকে পূর্ব্ববঙ্গের এই নাটক তিনখানি সম্বন্ধেই শুধু লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশের অন্য কোন যাত্রার কথা ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই।

রাই-উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস এবং স্বপ্নবিলাসের রচয়িতা কৃষ্ণকমল

গোস্বামী নদীয়া জেলার ভজনঘাটের অধিবাসী। কিন্তু ঢাকায় অবস্থানের সময় তিনি সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। এই তিনখানি বই ব্যতীত "ভরত মিলন" "নন্দ হরণ" এবং "সুবল সংবাদ" নামক আরও তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর "কৃষ্ণকমল" "নিমাই সন্ন্যাস" রচনা করেন এবং নিমাই সন্ন্যাসের অভিনয়ে নিজেই নিমাই সাজিতেন। তাঁহার নিমাইএর ভূমিকা অভিনয় এমনি প্রাণস্পর্শী হইত যে, অভিনয় দর্শনে সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৭৮ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে তিনি দেহ বিসর্জ্জন করেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে বড় গোসাই বলিয়া ডাকিত। কৃষ্ণকমলের চিন্তাশক্তি ছিল গভীর, তাঁহার রচনাভঙ্গী ছিল মনোমুগ্ধকর। তাঁহার রচিত সঙ্গীত-সুধা পহন করিয়া সকলেই পরম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাঁহার রচনামাধুর্য্যের সামান্য পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল—

রাধা, কৃষ্ণ-বিরহে পাগলিনী প্রায় হইয়া উঠিয়াছেন—পথ অপথের জ্ঞান নাই—শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য নিকুঞ্জ-কাননাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। ললিতা সখী বলিতেছেন "রাই ধীরে চল, অনেক কাঁটা রহিয়াছে—"

"অমন করে যাস্‌নে গো
কত কণ্টক আছে গো বনে
ফুটিবে দুটি চরণে গো।" ইত্যাদি—

শুনিয়া রাধা সখীকে বলিতেছেন,—"বহু তপস্যা করিয়া কৃষ্ণকে লাভ

করিয়াছি। রাখালের সঙ্গে প্রেমাবদ্ধ, জানি বনে বনে ফিরিতে হইবে, কত কাঁটা পায়ে বিঁধিবে, তাই সই,

"হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি
গড়াগড়ি করিয়ে শিখিতেম।"

আকাশে কৃষ্ণমেঘ বায়ুবেগে উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বিরহে উন্মাদিনী রাই মনে মনে ভাবিবেন "আমার নব জলধরই বুঝি আমাকে দেখিয়া দ্রুতপদে পালাইতেছে" তাই শশব্যস্ত হইয়া সখীগণকে বলিলেন,—

"সখি, ধর ঝট পীত পট, নিপট কপট শঠ
লম্পট শিরোমণি যায়।
আসিয়ে নিকট কোথা ঘুচাইবে সঙ্কট
নিকট বিরহ যে ঘটায়॥"
"ঠেকে যে শঠের পাটে, ব্রজের অবলা ঠাটে
গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে কাঁদিয়ে বেড়াই গো।"

আবার, মেঘ দেখিয়া রাধা কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"কিবা সজল জলদ শ্যামল সুন্দর"

বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ ভাব অতি সুন্দর হইয়া রাই-উন্মাদিনীতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপগোস্বামী, রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এবং গোবিন্দ অধিকারী, রাম বসু, হারু ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ও

কবিওয়ালাগণের ভাবে অনুপ্রাণিত কৃষ্ণকমলের কবিতা ও গান এমনি রস সিঞ্চন করিত যে, সকলেরই মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

পূর্ব্ববঙ্গের লোকও কালমাহাত্ম্যে নূতনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল—পুরাতন ধরণের যাত্রাগান আর তাহাদের ভাল লাগিল না, তাহারা থিয়েটারের অনুকরণে যাত্রার পক্ষপাতী হইয়া উঠিল এবং ক্রমে থিয়েটারও পূর্ব্ববঙ্গে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল যাত্রাওয়ালার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা ব্যতীত আরও কয়েকজন যাত্রাওয়ালার নাম এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। রামযাত্রায় আনন্দ অধিকারী এবং জয়চাঁদ অধিকারী, চণ্ডীযাত্রায় ফরাসডাঙ্গার (চন্দননগর) গুরুপ্রসাদ বল্লভ এবং মনসার ভাসানে বর্দ্ধমানের লাউসেন বড়াল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত এবং চণ্ডীপূজা বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে সেখানে নাচের ব্যবস্থা হইত। মনসাদেবী, মঙ্গলচণ্ডী এবং স্থানীয় অন্যান্য দেবতাগণের স্তুতি করিয়া যে পালাগান রচিত হইত তাহাই মঙ্গলগান নামে পরিচিত। এই সমস্ত মঙ্গলগানই কালক্রমে মেলোড্রামাতে (melodrama) পরিণত হইয়াছিল। এই সকল গানের সহিত কথাবার্ত্তার সংযোগ হইয়া যাত্রাকে অনেক পরিমাণে নাটকীয় আকার প্রদান করিয়াছে। সাধারণতঃ চণ্ডীমণ্ডপ কিম্বা মন্দির প্রাঙ্গণই এইগুলি অভিনীত হইবার প্রধান স্থান।

উল্লিখিত যাত্রাওয়ালাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নীলকান্ত মুখার্জ্জী এবং নারায়ণ দাস তাঁহাদের

যাত্রাভিনয় দ্বারা বহু লোককে মুগ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে নীলকান্ত প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন। এই সকল যাত্রা ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হইলেও সুপ্রসিদ্ধ মতি রায় নূতন পদ্ধতিতে যাত্রার আসর অনেকদিন পর্য্যন্ত জমকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

যাত্রা এবং কথকতা লোকশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। সাধারণ লোক যাত্রা শুনিয়া যে কত শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিত তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বজনীন শিক্ষার (Mass-Education) এই প্রধান একটি প্রতিষ্ঠানকে যাঁহারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় মতিলাল রায়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

মতি রায়

মতি রায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্দ্ধমান জিলার ভাতশালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন কেরাণীগিরি করিয়া পরে শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন। ইনি মাঝে মাঝে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত "প্রভাকর" পত্রিকায় কবিতা লিখিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ চৌধুরী তাঁহাকে যাত্রার দলের জন্য একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই অনুরোধে মতি রায় রামায়ণের বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে প্রথমে "তরণীসেন বধ" এবং পরে "রাম বনবাস" রচনা করেন। মতি রায় হরিনারায়ণের সহিত একযোগে যাত্রার দল

করিয়াছিলেন এবং নূতন পদ্ধতিতে অভিনয়প্রণালী শিক্ষা দিয়া যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, এমন মনোহর অভিনয় তাঁহারা কখনও দর্শন করেন নাই। মতি রায়ের যাত্রার বিষয় ছিল—পুরাতন কিন্তু তাঁহার পদ্ধতি ছিল—নূতন। তিনি অনেক যাত্রাভিনয়ের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কালীয়দমন, ভারত-মিলন, মহালীলা, সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বিজয়া-চণ্ডী, পাণ্ডব-নির্ব্বাসন, নিমাই সন্ন্যাস, ভীষ্মের শরশয্যা, রামরাজা, কর্ণবধ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, ব্রজলীলা, রাম বনবাস, রাবণ বধ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ প্রভৃতি মতি রায়ের প্রসিদ্ধ যাত্রাভিনয়। মতিলাল যে কেবল গীতাভিনয়ের পদ্ধতিরই পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি নিজেও ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ এবং নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত। "বঙ্গভাষা লেখক" প্রণেতা মতিলাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"১২৮০ সালে (১৮৭৩ খৃঃ) মতিলাল যখন নবদ্বীপে দলপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন নবদ্বীপেশ্বরী পোড়ামাতাকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার মন্দির-অঙ্গণে প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ সকলেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে দোলযাত্রা উপলক্ষে যখন ইঁহার যাত্রা হয়, তখন নবদ্বীপাধিপ ক্ষিতীশচন্দ্র, মতিলালকে বলিয়াছিলেন "আপনা হইতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। কারণ, ইতিপূর্ব্বে কোনযাত্রাই রাজবাটীতে হয় নাই। আমার বোধ হয়, তখন যদি এরূপ যাত্রা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

হইত।" কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "কমল-কুটীরে" বিশেষ যত্ন সহকারে রায় মহাশয়ের যাত্রা শুনিতেন। একদা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশববাবুর বাড়ীতে রায় মহাশয়ের যাত্রা হইতেছে, কেশববাবুর অঙ্কে স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস উপবিষ্ট, একমনে রায় মহাশয়ের গান শুনিতেছেন। রায় মহাশয় তৎকালে তাঁহার প্রণীত নিমাই সন্ন্যাস গীতাভিনয়ে শ্রীধর রূপে অবতীর্ণ। আবেগময় প্রাণমুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংসদেব সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। অনেক পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস 'মতি মতি' বলিয়া স্বয়ং উত্থান পূর্ব্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিমুলতলার বাটীতে সমাজ ও নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন।"

মতি রায়ের অনুকরণে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে অনেক যাত্রার দল গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সাঁতরা কোম্পানীর দল, উমাকান্ত ঘোষালের দল, ডেঙ্গর ঘোষ, কালীকান্ত নর, ভূষণ দাস, অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের দল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অহিভূভণের "সুরথ উদ্ধার" গীতাভিনয়ের নাম সকলেরই পরিচিত। উমাকান্তবাবু ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, সুশিক্ষিত এবং সুকণ্ঠ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ভূষণ দাস ও মথুর সাহার দলও উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তার দিক্ হইতে মুকুন্দ দাস সর্ব্বজন-বিদিত। আমরা যথাস্থানে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

কবি, হাফ-আখড়াই ও পাঁচালী যাত্রার ন্যায় নহে। তথাপি আমোদ-প্রমোদ এবং লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইগুলিরও কিঞ্চিৎ

পরিচয় এখানে দেওয়া আবশ্যক। কবিগান সাধারণতঃ দুই দলে হইয়া থাকে। শিব, শক্তি, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য পৌরাণিক দেবতাদিগকে লইয়া উভয়দলের মধ্যে বেশ বুদ্ধির পরীক্ষা চলিত। এক দলের পর আর এক দলের গান হইত। কবি বলিতে আজকাল যাহা আমরা বুঝি অর্থাৎ poet—পূর্ব্বে তাহা এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হরু ঠাকুর এবং তাঁহার চেলা ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, নিমাই বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হরু ঠাকুর, রাম বসু, এণ্টুনি ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা, সাতু রায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ কর্ণেল ক্লাইভের মুন্‌সীরূপে বিখ্যাত ছিলেন। হরু-ঠাকুর ছিলেন তাঁহারই বিশেষ প্রিয়পাত্র। পরে তিনি রাজদরবারের সভাসদ্ হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য দলের জয় পরাজয় বিচার করিতেন। হরুঠাকুরের প্রসিদ্ধ পদ—

"হরিনাম করিতে অলস করো না রসনা
যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে ব'লে কি
ঢেউ দেখে লা ডুবাবে।"

হরুঠাকুরের গানগুলি খুব সুন্দর। বিরহের গানেই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এণ্টুনী ছিলেন পর্ত্তুগীজ। তিনি প্রথমে ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি এক ব্রাহ্মণ-যুবতীর প্রেমে পড়েন। পরে তাহাকে লইয়া তিনি গিরিডির

নিকট যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু-যুবতীটি ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বাস করিলেও হিন্দু আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়াছিল এবং বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিত। এণ্টুনি সাহেব তাহার সহিত বাস করিয়া বাঙ্গলা বেশ ভাল বলিতে শিখিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া সাহেব নিজের ব্যবসা পরিত্যাগ করেন এবং সখের দল করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হ'ন। পরে পেশাদারী কবির দল করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত কবিগণ সকলেই ছিলেন দ্রুত কবি। এণ্টুনী সাহেবকে পাইলে পাল্‌টা আরও জোরে জমিত। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। রাম বসু এণ্টুনীকে বলিলেন,—

"কও হে এণ্টুনী!
আমি এইটী শুনিতে চাই
এসে এদেশে এ বেশে
তোমার গায় কেন কুর্ত্তি নাই।"

রামবসু তখন ঠাকুর সিংহের দলভুক্ত ছিলেন। এণ্টুনী তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—

"এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুরো সিঙ্গীর বাপের জামাই
কুর্ত্তিটুপী ছেড়েছি।"

এণ্টুনী একবার গান বাঁধিলেন,—

"ওমা মাতঙ্গী, না জানি ভকতি স্তুতি
জেতে আমি ফিরিঙ্গী।"

পরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়া উত্তর দিল—

"যীশুখ্রীষ্টে ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে
জাত ফিরিঙ্গী জাবরজঙ্গী পারব নাক তরাতে।"

আর একবার রাম বসু এণ্টুনী সাহেবকে বলিলেন,—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রী সাহেব শুন্‌তে পেলে
গালে দিবে চুণকালি॥"

এণ্টুনী জবাব দিলেন,—

"খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ ত কোথা শুনি নাই
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে
আমার মানব জনম সফল হবে,
যদি রাঙ্গা চরণ পাই।"

৬

হরু ঠাকুর একবার রাম বসুর দলকে পরাজিত সাব্যস্ত করিলে, রাম বসু উত্তরে গাহিলেন,

"ঠাকুর! বাঁচবে না আর বিস্তর দিন।
তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ॥"

নিতাই দাসও একজন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় প্রভাকরে লিখিয়াছেন,—

"ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রে নিতাই দাসকে বায়না দিতেন। ইঁহার সহিত ভবানী বেনের সাক্ষাৎ যুদ্ধ ভাল হইত। যথা প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই।' এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে-ভবানের লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহারা বাটীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যে ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত। তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক্ এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রূপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গোড়া ভক্ত কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রামের ভদ্র অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে গদ্‌গদ হইতেন। নিতাই দাস জয় লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইবেন—এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত। কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহারা গাহনার প্রাক্কালে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়াই গোড়ায়ই ঢলঢল হইতেন। নিতায়ের এক প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করতে পারিতেন।"

জন হলহেড

এণ্টুনী ফিরিঙ্গির মত আর একজন ইউরোপীয় কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার নাম মিঃ ন্যাথালিয়েল জন হলহেড্। ইনি প্রথম বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ লেখক ন্যাথানিয়েল ব্রাসলি হ্যালহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়াই চলাফেরা করিতেন। এমনি অনর্গল বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন যে, তিনি যে বাঙ্গালী নহেন, তাহা কেহই ধরিতে পারিত না। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন বর্দ্ধমানে একবার তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমানের রাজাবাহাদুর ইউরোপীয়দিগকে এক ভোজে আমন্ত্রণ করেন। তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গান বাজনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জন হলহেড এই গানের মজলিসে বাঙ্গালীর বেশে এমন সুন্দর গান করিয়াছিলেন যে ঐ দলের বাঙ্গালীরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই যে তাহাদের সঙ্গে একজন বিদেশী গান করিতেছে। মিঃ হলহেড পেশাদার কবিওয়ালা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিচারপতি। ইংরেজদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্য ও চলিত বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না।

বলিতে কি, তৎকালীন বঙ্গসমাজের আমোদ-প্রমোদের প্রধান উৎস ছিল কবি, যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারি "কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সে কালের প্রধান আমোদ ছিল, তাহাদের মধ্যে কবি প্রধান। হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু,

নৃসিং, রাম বসু, ভবানী বেনে ইঁহাদের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল। *

কবির দলের মধ্যে যিনি দ্রুত কবি থাকিতেন, লোকে তাঁহাকে বলিত বাঁধনদার। দ্রুত কবিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রখর কল্পনা শক্তি, পুরাণে যথেষ্ট দক্ষতা না থাকিলে বাঁধনদারকে পরাজয় মানিতে হইত। তৎকালের কবিওয়ালাগণের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ঈশ্বর গুপ্তও কোন এক সময়ে কবির দলের বাঁধনদারের কাজ করিয়াছিলেন।

কি সহর, কি পল্লীগ্রাম সর্ব্বত্রই কবির বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে বুদ্ধির এই লড়াই নিকৃষ্টতার এমন চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল যে, উভয় পক্ষে কদর্য্য, জঘন্য, অশ্লীল ব্যাঙ্গোক্তি তখন কবি গান নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, জনসাধারণও নির্ব্বিকারে এই অশ্লীল গালিগালাজ আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিত। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হীনরুচিসম্পন্ন আমোদ-প্রমোদের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। ফলে কবিগানের প্রসার বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গেল। এখন কবিগান একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তৎকালে সাধারণের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাচের কোন স্থান ছিল না। সাধারণতঃ ইউরোপীয়দিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ধনী লোকেরা নাচের মজলিসের আয়োজন করিতেন। এই সকল নাচের মজলিসে পেশাদার বাঈজীরাই

* সেকাল ও একাল—১৬ পৃষ্ঠা

নাচিত। স্বর্গীয় রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ভবানীচরণ তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম-উৎসব উপলক্ষে শালকিয়া এবং হাওড়ার সমস্ত ইউরোপীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শালকিয়া এবং হাওড়া তাঁহার এই উভয়স্থানের বাড়ীতে এই উপলক্ষে বাঈ নাচের আয়োজন হইয়াছিল। এই নাচের আসরে সহরের সেরা বাঈজীগণকে বায়না করা হইয়াছিল।

রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়ীতে একেবার নূতন ধরণের নাচের ব্যবস্থা করা হয়। এই নাচের আসরে কতিপয় মুসলমান পুরুষ নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিল। হিন্দুস্থানী নাচ এবং খেয়াল, টপ্পা ও ধ্রুপদ গানকে ব্যঙ্গ করিয়া এই আসরে নৃত্যগীত হইয়াছিল।

হাফ আখড়াই

হাফ আখড়াইগুলি অধিকাংশ স্থলেই ছিল সখের দল। বিশিষ্ট ভদ্র-পরিবারের যুবকগণ হাফ আখড়াই দলে গান করিতেন। ইহাতে বিবিধ প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত। সহরেই ইহার প্রচলন ছিল বেশী। কলিকাতার অনেক রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন। দুর্গা পূজার সময় অনেক হাফ আখড়াই ও পাঁচালীর দল গান বাজনা সহকারে কলিকাতার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করিত।

পাঁচালী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান। দলে যিনি প্রধান থাকিতেন, তিনি সুর-তান-লয় সহকারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ব্যাপার কথা ও গানে বর্ণনা করিতেন এবং দলের আর সকলে গানের ধুয়া ধরিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ লস্কর প্রভৃতি পাঁচালীওয়ালাগণের খুব নাম ছিল বটে, কিন্তু দাশরথি রায়ের খ্যাতি সকলকে

অতিক্রম করিয়াছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় বাদমুড়া গ্রামে দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি রায় প্রথমে কবির দলের বাঁধনদার ছিলেন কবিগান করিতে গিয়া দাশরথি প্রায়ই প্রতিপক্ষের নিকট কুৎসিত গালিগালাজ শুনিতেন ইহাতে তাঁহার পিতা ও মাতুল তাঁহাকে কবির দল পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। অতঃপর কবি দাশরথি পাঁচালী রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভাস, চণ্ডী, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেক পাঁচালী ছাপা হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলনে সমগ্র বঙ্গদেশ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। দাশরথি রায় তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্তুতি ছলে নিন্দা এবং গুপ্ত কবিকে নিন্দার ছলে প্রশংসা করিয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার দুটি একটি পদ উদ্ধৃত হইল,

(১) বিধবার দিতে নাগর গুণের সাগর
বিদ্যাসাগর গুণ ধরেছেন গুণনিধি! ইত্যাদি।

(২) মরুক দেশের অধার্ম্মিকে, বিপক্ষ বিধবা দিকে
জুটেছে এই কথায়,
কলিকাতায় আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত
নারীর রোগ বোঝে না বৈদ্য হয়ে
যেমন হাতুড়ে বৈদ্য বিষ দিয়ে দেয়
প্রাণে বধি। ইত্যাদি

তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ গানের দুই একটি পদ এখনও লোকের মুখে শোনা যায়—

দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে
ডুবে মরি গো শ্যামা
যড়রিপু হ'ল কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কুণ্ড। ইত্যাদি।

উপনা ও অনুপ্রাশের প্রয়োগে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে এবং প্রতি-পক্ষকে জব্দ করিতে দাশরথি রায়ের সমকক্ষ তৎকালে আর কেহ ছিল না। পাঁচালীওয়ালা তৎকালে আরও অনেক ছিলেন বটে, কিন্তু পাঁচালীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার মূলে যে দাশরথির কবি-প্রতিভা, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাশরথি রায় বাঙ্গলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

কালক্রমে পাঁচালীর ভাষা এত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইয়া উঠিল এবং উহাতে এত অসঙ্গত অনুপ্রাস এবং উপনার প্রয়োগ হইতে লাগিল যে ভদ্রসমাজ পাঁচালীর প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পাঁচালীওয়ালা এবং যাত্রাওয়ালা হিসাবে ব্রজমোহন রায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত "রামসীতা" "সাবিত্রী" এবং "অভিমন্যু" অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারের জন্য 'কথকতা' একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। কথকতায় কথক ঠাকুর কোন পৌরাণিক ঘটনা বিবৃতি করেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরসাল ভাষায় সমালোচনা এবং সঙ্গীতাদি দ্বারা বর্ণিত বিষয়কে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলেন। কথক হিসাবে শ্রীধর কথকই বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথকতায় অশ্লীলতা বা হীন রুচির কোন স্থান নাই। এখনও কথকতার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু ভাল কথক খুব বিরল।

এই সঙ্গে নিধুবাবুর কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। নিধুবাবু তাঁহার রচিত টপ্পাগানের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

কীর্ত্তন

কীর্ত্তন এক শ্রেণীর সঙ্গীতবিশেষ। কীর্ত্তন শুনিয়া বহুলোকে তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। বহুদিন হইতে বাঙ্গলা দেশে ইহা প্রচলিত আছে। কীর্ত্তন বলিতে সাধারণতঃ ভক্তিরস পূর্ণ গীতবিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবৎ-প্রেম, করুণা, জাগতিক বিষয়ের অসারতা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া কীর্ত্তন রচিত হইত।

তবল, বেহালা, সারেঙ্গী প্রভৃতি যে সকল বাদ্য যন্ত্র মানুষের মনে ইন্দ্রিয়লালসা জাগ্রত করিয়া তুলে, কীর্ত্তনে তাহাদের স্থান নাই। এক-তারা, সারীন্দা, খোল, খঞ্জনী অথবা গোপীযন্ত্র সহযোগে কীর্ত্তন গীত হইয়া থাকে। প্রথমে মেয়েরাই কীর্ত্তন গান করিত। সে সকল পতিতা পাপব্যবসা পরিত্যাগ করিত, তাহারাই সাধারণতঃ কীর্ত্তন গাহিত। কালক্রমে কীর্ত্তনের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কীর্ত্তন খুব আনন্দ-দায়ক এবং উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত বলিয়া অনেক পুরুষ শিল্পী কীর্ত্তনের দিকে

আকৃষ্ট হয় এবং কীর্ত্তন গাহিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর শুধু ভগবদ্ভক্তি ও করুণা প্রভৃতি কীর্ত্তনের মধ্যে আবদ্ধ রহিল না, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্ন দিক যেমন পূর্ব্বরাগ, মিলন বিরহ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কীর্ত্তন গান রচিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে একতারা এবং সারিন্দার স্থান হারমোনিয়ম অধিকার করিয়াছে, কিন্তু পুরাতন খোলকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। এমন কি, থিয়েটারে যখন কীর্ত্তন করা হয়, তখনও তবলার পরিবর্ত্তে খোল বাজান হইয়া থাকে।

উপজই হইল কীর্ত্তনের প্রধান মাধুর্য্য। উপযুক্ত মুহূর্ত্তে যে কীর্ত্তন গায়ক যত অধিক সংখ্যক উপজ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই কীর্ত্তনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন। উপজ সম্বন্ধে নিম্নে দৃষ্টান্তে দেওয়া গেল :—

কীর্ত্তনের একটি পদ আছে "বিফলে পড়ল এসে মালতীর মালা।' এই পদটি গাহিয়া নিম্নলিখিত রূপ উপজ সংযোজনা করা হইয়া থাকে, যথা :—

আমার মালা গাঁথা বিফল হলো, বন্ধুর জন্যে মালা গেঁথেছিলাম, আমার মালা গাঁথা বন্ধুর জন্যে, অনুরাগ মিশাইয়ে মালা গেঁথেছিলাম, আমার মালা গাঁথা ইত্যাদি—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিতেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা এবং যোগ্যতা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তবে কীর্ত্তন আরও উন্নত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার জীবিতকালে তিনি কীর্ত্তনকে উন্নত এবং কালোপযোগী করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গণেশ কীর্ত্তনীয়া মহাজনী পদ

খুব উন্নত ও মার্জ্জিত ভাবে গাহিতেন। এই জন্যই তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতে দেশবন্ধু খুব ভালবাসিতেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অর্পণা দেবী কীর্ত্তনের উন্নতি-কল্পে নিজে একটি কীর্ত্তনের দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহার এই কীর্ত্তনের দলের নাম "ব্রজ-মাধুরী সঙ্ঘ"। একবার তাঁহার কীর্ত্তন গানে নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজা স্বয়ং খোল বাজাইয়াছিলেন। অর্পণা দেবীর কীর্ত্তন শুনিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার এই "ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ" দীর্ঘ জীবনলাভ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ব্রতী থাকুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ব্রজবাসী খোল বাজনা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ও কৃতী। বর্ত্তমানে অনেক অধ্যাপক এবং ডাক্তারও কীর্ত্তনে যশার্জ্জন করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র এম, এ, মহোদয় কীর্ত্তনে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অর্পণা দেবীকে কীর্ত্তন সরস্বতী উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে এই উপাধিলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কীর্ত্তনের উন্নতির জন্য দেশবন্ধু যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্পণা দেবী তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাঙ্গলা অভিনয়

থিয়েটার প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত অভিনয় দেখিবার স্পৃহা বাঙ্গালীর পূর্ব্ববৎই বলবতী রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ নির্দ্দোষ আমোদ ও স্ফূর্ত্তির পরিমিত উপভোগ পানাহারের ন্যায় মানবের অপরিহার্য প্রয়োজন। অন্যথা জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মনে হয়। কি সুসভ্য কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই তারতম্যানুসারে উচ্চনীচ নানা অঙ্গের আমোদ তামাসার আয়োজন দেখা যায়। অন্যান্য আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা আবার নাটক অধিক হৃদয়গ্রাহী; কারণ সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্মী নর আপনাকে ভাঙে গড়ে এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্মবিকাশ করে। মানব এখানে আসিয়া নানাভালে নানামূর্ত্তিতে আপনাকে দেখে ও নানাভাবে আপনাকে আপনি অনুশীলন করে। ক্রিয়াপ্রাণ নাটক এইজন্য আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, কারণ ক্ষুদ্র রঙ্গালয় মহানাট্যশালার অনুকৃতি মাত্র।

All the world's a stage
All the men and women are mere players
"As you like it"—Shakespeare.

অন্যান্য শিল্প ও কলার ন্যায় নাট্যকলায়ও ভারত এক সময়ে অল্প গৌরবান্বিত ছিল না। কি রামায়ণ কি মহাভারতের সময়কালে, কি

রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাঙ্গলা অভিনয়

অশোকের রাজ্যাধিকারে, কি পৌরাণিক যুগে নাট্যকলার উৎকর্ষ সম্পাদনে ভারত কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু মুসলমান প্রভাবের সময়েই এই কলা অবনতির অধঃস্তন সোপানে অবরোহণ করে; কারণ ধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়া মুসলমান সম্রাটগণ নাট্যামোদের পোষকতা করিতেন না। পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহার পুনরভ্যুদয় হইয়াছে এবং ভারতীয় নাট্যকলার গৌরব এখন একমাত্র বঙ্গবাসীই প্রকৃত ভাবে রক্ষা করিতেছে।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এই ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনায় যেমন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়, সেইরূপ অনেক অনেক নূতন তথ্যও অবগত হওয়া যায়। তবে এই নবাভ্যুদয়ের প্রারম্ভে ইংরাজের অনুকরণে সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় ইংরাজী নাটকের অভিনয়ই অনুষ্ঠিত হইত। কোন্ সময়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রথমে বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হয়, অদ্য পাঠকের নিকট তাহাই আমরা উপহার দিব।

অনেকে মনে করেন, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাজার নবীনকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের বাটিতে প্রথমে বাঙ্গলায় বিদ্যাসুন্দর অভিনয় হয়। অনেকে জানেন চড়কডাঙ্গাস্থ জয়রাম বসাকের বাড়ীতেই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙ্গলা ষ্টেজ নির্ম্মিত হয় এবং তথায় অভিনীত রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার প্রণীত কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব নাটকই প্রথম বাঙ্গলা নাটক। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বেকার ইতিহাস আছে। পুরাতন কাগজপত্রাদি দৃষ্টে আমরা অবগত হই যে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রুষ দেশীয় একজন ভাগ্যান্বেষী মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা আসিয়া প্রথমে বাঙ্গলা নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেন এবং যে নাটক অভিনীত

হয় তাহা কমিডি—ইংরাজী "ডিস্-গাইস্", এর বঙ্গানুবাদ 'ছদ্মবেশ' নামে একখানি মিলনান্ত নাটক।

লেবেডফ কলিকাতা আসিয়া দেখেন তখন 'কলিকাতা থিয়েটার' নামে ইংরাজ পরিচালিত রঙ্গভূমি ইংরাজ দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া বেশ আয়ের সংস্থান করিতেছে। লেবেডফেরও বাঙ্গালী দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিয়া কিছু উপায় করিবার খেয়াল হইল। "কলিকাতা থিয়েটার" রাইটারস্ বিল্ডিংয়ের উত্তর দিকে বর্ত্তমান জেম্‌স্ ফিন্‌লে কোম্পানীর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ২০ বৎসর পরে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে গোপীমোহন ঠাকুর এই বাড়ী ও নিকটবর্ত্তী স্থান ক্রয় করিয়া একটী বাজার বসান। অধুনা ইহাই চীনাবাজার নামে প্রখ্যাত। আজকাল যেমন সহরের উত্তরাংশে থিয়েটারগুলি অবস্থিত, তখনকার দিনে সেরূপ চীনাবাজারের দিকেই থিয়েটারের আড্ডা ছিল। পলাশীর যুদ্ধাবসানের পর ইংরাজের প্রথম থিয়েটার **The Play House** ও একই দিকেই—লালবাজার পুলিস আফিসের পশ্চিম দিকে একটী বাটীতে অবস্থিত ছিল। লেবেডফও এই দিকেই ২৫নং ডোমতলা লেনে তাঁহার রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। ডোমতলা লেনেই বর্ত্তমানে এজরা ষ্ট্রীটে পরিণত হইয়াছে এবং অনুমান বর্ত্তমান ২১নং বাড়ীর গির্জ্জার ধারে, কি তাহার পূর্ব্বদিকে, সেন্ট্রাল থিয়েটারের পশ্চাদ্দিকে এই স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যাঁহার সহায়তায় এই নাটকের অনুবাদ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার নাম গোলকনাথ দাশ। গোলকবাবু ভাব রক্ষা করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভাষান্তর করেন এবং স্থানে স্থানে কয়েকখানি গান সংযোজন করিয়া

দেন। এইরূপে অনুবাদ কার্য্য শেষ হইলে লেবেডফ তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল স্যার জন সোরের অনুমতি পত্র লইয়া অভিনয়ের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ঐক্যতানবাদ্যে অনেক হিন্দুস্থানী গত্ বাজান হয় ও বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের সহিত বাঙ্গালীদের অনেক প্রিয় বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে তদানীন্তন সর্ব্বজনপ্রিয় ভারতচন্দ্রের শব্দ ঝঙ্কার পূর্ণ কবিতারও আবৃত্তি হইয়াছিল এবং অভিনয়টীও দর্শকের মন মুগ্ধ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হয়।

আর বিস্ময়ের বিষয় এই যে গোলকবাবুর সহায়তায় স্ত্রী চরিত্র ভূমিকা অভিনয়ের জন্যই স্ত্রীলোকই পাওয়া যায়। ইহার পরে মণিপুরী যাত্রায় ও নবীনবাবুর থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় করিত বটে, কিন্তু অতঃপর ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গ-রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষের দ্বারাই অভিনীত হইত, কিন্তু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নাট্যজগতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। অনেকে মনে করেন বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম প্রতিষ্ঠার তারিখ (১৬ই) আগষ্ট ১৮৭৩ হইতে এই সংস্কার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। ইতিপূর্ব্বে ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার ও ১৭ই জুন হইতে ন্যাসনেল লাইসিয়ন্* স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করিয়াছিল, তবে উভয় সম্প্রদায়ই স্বল্পকাল স্থায়ী হওয়ায় সাধারণের নিকট বেঙ্গল থিয়েটারই সে প্রতিষ্ঠার দাবী করিতে পারেন। আর উহার প্রবর্ত্তক ছিলেন কবি মধুসূদন।

লেবেডফ এর অভিনয় মাত্র দুই রাত্রি হয়। প্রথম রাত্রিতে (২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শুক্রবার) প্রবেশের মূল্য বক্স ও পিট্ ৮৲ ও

গ্যালারী ৪৲ ধার্য্য হয়। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় অভিনয় আরম্ভ হয়, এবং জনতা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় দর্শককে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য লেবেডফ দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে (২১ মার্চ্চ সোমবার ১৭৯৬ (নির্দ্দিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করেন ও ১০৲ মূল্যের ২০০ খানি টিকিট ও দৃশ্য কাহিনী অভিনয়ের ২।৩ দিন পরেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইহার পর সেই বিদেশী পর্য্যটক কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্রের সহায়তায় দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ হৃষ্টচিত্তে স্বদেশ যাত্রা করেন। খাঁটি ইতিহাস লিখিতে গেলে বলিতে হইবে যে লেবেডফ ও গোলকনাথ দাশই বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রথম প্রবর্ত্তক।

ফরাসী-বঙ্গও কাব্যসুধা ও অভিনয় রসে বঞ্চিত হয় নাই। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত চন্দননগরের থিয়েটারও এতদুপলক্ষে উল্লেখযোগ্য বটে। প্রথম রাত্রিতে L' Afocat নামক একখানি ফরাসী নাটক বঙ্গ-ভাষান্তরিত হইয়া অভিনীত হয়। নাটকের ঘটনাটী এই—এক মেষ পালক কোন ধনী ব্যক্তির অধীনে চাকুরী করিত। এই ধনীর মেষগুলি খুব হৃষ্টপুষ্ট এবং তাদের গায়ের লোমও বেশ সুন্দর ছিল। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মেষপালক দুইটি মেষ চুরি করিয়া মারিয়া ফেলে ও তাহার প্রভু স্থানীয় জজ আদালতে তাহার নামে চুরির দাবীতে নালিস করেন। রঙ্গমঞ্চে জজ সাহেব বিচারাসনে উপবিষ্ট, আসামী ও উভয়পক্ষের উকিল উপস্থিত, এমন সময়ে ম্যানেজারেয় ওয়াচ ঘড়িটী অপহৃত হয় ও তিনি একজন দৃশ্য পরিবর্ত্তককে সন্দেহও করেন। দৃশ্যকালে যখন বিচার শেষ হইয়াছে, ম্যানেজারও উত্তেজিত হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে আদালতে ধরিয়া লইয়া

যান্। এবং জজ প্রকৃত বিচারকের ন্যায় তাহাকে প্রশ্ন করিতেই বেচারী চুরী স্বীকার করিয়া ফেলে। বিচারক চোরকে তিরস্কার করিয়া থিয়েটারের ত্রিসীমানায় আসিতে নিষেধ করিয়া দেন ও রঙ্গালয়ে জীবন্ত অভিনয় উপভোগ করিয়া দর্শকবৃন্দ হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া যান।

তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের আলো ছিল না, পাখার বন্দোবস্ত ছিল না, তেলের বাতির সহায়তায়ই অভিনয়ের কার্য্যাদি চলিত। বড়লাট লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভগ্নী মিস্ ইডেন তৎকালীন থিয়েটারগুলির নানাবিধ অসুবিধার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমাভিনীত খাঁটি বাঙ্গালা নাটক*

আজ থিয়েটারের কয়েকটি পুরাতন গল্প মনে হইতেছে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার যুগের কথা বলিতেছি না। বিদেশী বণিকগণের এদেশে আসিবার পরের কয়েকটী কাহিনীর উল্লেখই করিব। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের বর্ত্তমান থিয়েটার এই বিদেশীগণের অনুপ্রেরণায়ই গড়িয়া উঠিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে নাদির-শা যে দিল্লী আক্রমণ করেন তখনকার কথা বলিতেছি। একটা গুজব উঠিয়াছিল যে, নাদির-শাকে খুন করিবার আয়োজন হইয়াছে। অমনি তিনি দিল্লী-নগরীর সমস্ত তোরণদ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। ইহাতে লোকজন আর বাহিরে যাইতে পারিল না। এবং খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের পথও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠিল, এবং সমস্ত লোকের প্রাণবধের আদেশ হইল। আর্ত্তনাদ বা করুণ ক্রন্দনে নাদির-শা বধির হইলেন। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী মনুষ্য শোণিতে প্লাবিত হইয়া গেল। অসংখ্য লোক না খাইয়া মরিতে থাকে, এবং অনেকে ভয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়। এই সময়ে টুকী নামে একজন বিদেশী অভিনেতার অভিনয় দক্ষতায় নাদির-শা এতই মুগ্ধ হন যে তাহারই

---

* সোনার বাঙ্গলা পূজার সংখ্যা ১৩৫২

প্রার্থনায় তিনি নগরের অবরোধ উন্মোচনের আদেশ করেন। টুকীর অনুকম্পায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা হয়।

এই সময়ে কলিকাতায়ও ইংরাজেরা অভিনয় করিতেন। তাহাদের প্রথম থিয়েটারের নাম ছিল প্লে-হাউস্। বাড়ীটি ছিল লালবাজার ষ্ট্রীটে মিশন-রো রাস্তাটির মোড়ে। এই রাস্তাটির নাম ছিল তখন রোপ-ওয়াক। এই প্লে-হাউসে ড্রেক্, হলওয়েল প্রভৃতিও আসিতেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন, অভিনয় বাড়ীটিতে তখন তাঁহার বড় সুবিধা হয়। এই বাড়ী হইতে তোপ দাগাইয়া ফোর্টের দিকে মারা হইত। তখন ফোর্ট ছিল আজকালকার যেখানে কালেক্টারের আফিস ও জেনারেল পোষ্টাফিসের উত্তরাংশটা—সেখানে। প্লে-হাউস্ ও ফোর্টের মাঝখানে কোন বাড়ী ছিল না, কেবল লালদিঘীটী ছিল মাঝে। লালদিঘীর নাম ছিল ট্যাঙ্ক স্কোয়ার (**Tank Square**) উভয় পক্ষের লোকের রক্তে দিঘীর জল লাল হওয়ায়ই বোধ হয় নাম হইয়াছে 'লালদিঘী'।

পলাশীর যুদ্ধের পরে যখন ইংরাজগণ কলিকাতায় পাকা হইয়া বসেন, এই প্লে হাউসে আর কোন অভিনয় হয়না। একজন নিলামের জিনিষ বিক্রেতা এখানে বাস করিত। তাঁহার নাম ছিল উপইলিয়েমসন। বাড়ীটাতে তাহার কোন স্বত্ব ছিল না। তবু সে কিছুতেই ছাড়িবে না। পরে পাক্ নামে একব্যক্তি মোকদ্দমা করিয়া তাহাকে উঠাইয়া দেয়। বাড়ীটার প্রাচীরের একটু অংশ কিছুদিন আগেও দেখিয়াছি।

তারপরে থিয়েটার হয় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের উত্তর দিকে। থিয়েটারের নাম হয় "ক্যালকাটা থিয়েটার" আর এই কলিকাতা

থিয়েটারের নামেই রাস্তাটির নাম হয় থিয়েটার ষ্ট্রীট। এখন উহার নাম লায়ন্স রেঞ্জ। এই রাস্তা এবং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে যে স্থানটি অবস্থিত—সেখানে থিয়েটার হইত। এই থিয়েটারের জায়গা ওয়ারেন হেষ্টিংস, বারওয়েল,স্যার ইলাহজা ইম্পো প্রভৃতি ৭০ জন ব্যক্তি লীজ লয়েন। তারপর শেয়ারের টাকা উঠাইয়া বাড়ী তৈয়ার হয়। এই বাড়ীর উত্তর পশ্চিম রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসের মোড়ে ফিলিপ ফ্রান্সিস থাকিতেন। সে সময় তার বাড়ীর মত কলিকাতায় এত জমকালো বাড়ীতে কোন ইংরাজ বাস করিতেন না। এই থিয়েটারে কলিকাতার ইংরাজরা প্রায়ই আসিতেন। কোন কোন বাঙ্গালীও আসিতেন। বিলাতের বিখ্যাত গ্যারিকও থিয়েটার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হন এবং মেসিঙ্ক নামক জনৈক সুদক্ষ ব্যক্তিকে মঞ্চাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়া দেন, মেয়েদের পার্ট পুরুষ অভিনেতারাই করিত কিন্তু শীঘ্রই একটা পরিবর্ত্তন হয়।

(তখন কলিকাতায় মিসেস্ ব্রিষ্টো নামে একজন খুব ফ্যাসনদার মহিলা বাস করিতেন। মিসেস্ ব্রিষ্টোকে লইয়া হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেটে' নানারূপ ব্যাঙ্গোক্তি থাকিত। মিসেস তুই একজনের সঙ্গে মিশিতেন না। তাহাদের নামের সহিত জড়িত করিয়া হিকি তুই চারিবার অসঙ্গত ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন না। যাক্, মিসেস্ ব্রিষ্টো চৌরঙ্গীতে একটী থিয়েটার করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠ অভিনয় ও নৃত্যকলার পরিচয় দেন।) ইহার পর হইতেই ক্যালকাটা থিয়েটারও অভিনেত্রী লইতে আরম্ভ করে। এই থিয়েটার আর বেশীদিন চলে নাই। বছর ত্রিশেক পরে থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায় এবং স্বর্গীয় গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় থিয়েটারের বাড়ী এবং

আশে-পাশের জমি কিনিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী বাজার খোলেন। সেই বাজার পরে চীনাবাজার নামে খ্যাত হয়।

ক্যাল্‌কাটা থিয়েটারের দেখাদেখি একটী বাঙ্গলা থিয়েটারের উদ্ভব হয়। এইটী সম্বন্ধেই অনেক কাহিনী আছে। লেবেডফ নামে রুষীয় ব্যাণ্ড মাষ্টার এখানে বাঙ্গালীদের জন্য কিছু আমোদের বন্দোবস্ত করেন। ইহার বাড়ী রুষিয়ার ইউক্রেনে। ইনি একটি সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিয়া কিছু টাকা উঠান। পরে থেয়াল হয় বাঙ্গালা অভিনয় দেখাইবেন। ইনি বাঙ্গালা লিখিতে অভ্যাস করেন এবং সেই উপলক্ষে গোলক নাথ দাশ নামে একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত পরিচিত হন। উভয়ে ডোমতলার (ডোম লেনে) একটি থিয়েটার খোলেন। একখানি ইংরাজী নাটকের বাঙ্গলায় অনুবাদ করাইয়া তাহার অভিনয় করেন। নাটকের নাম হয় 'ছদ্মবেশ'। বিদ্যাসুন্দরের অনেক গানও জুড়িয়া দেওয়া হয়। চৌকিদার মোতার, দালাল, ফিরিওয়ালা প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা হয়। এবং অনেক হাস্যকর কথাবার্ত্তার সমাবেশ হয়। অভিনয় খুব উপভোগ্য হয় এবং দুই রাত্রি অভিনয় করিয়া লেবেডফ দেশে চলিয়া যান। সে আজ ঠিক দেড়শত বৎসর আগেকার কথা (১৭৯৫ খৃঃ)। দেশে ফিরিয়া লেবেডফ একখানি অভিধান বাহির করেন। তাহাতে এই কাহিনীটি উল্লেখ করা থাকে। এই অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা কিন্তু স্ত্রীলোকরাই লইত। গোলক দাশই অভিনেত্রী যোগাড় করিয়া দেন। ২৫নং ডোমতলা (থিয়েটার স্থানটি) আজকালকার ২১ নং এজরা ষ্ট্রীটে।

তারপর থিয়েটায় হয় চৌরঙ্গী রোডে। ইহার উত্তরে থিয়েটার রোড

পূর্ব্বে লর্ড সিংহ রোড, পশ্চিমে চৌরঙ্গী রোড। এই থিয়েটারই ছিল ইংরাজদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নামকরা থিয়েটার, আর ইহার পার্শ্বস্থ বলিয়া উত্তরের রাস্তাটির নাম হইয়াছে থিয়েটার রোড। লর্ড ময়রার সময় থিয়েটার খোলা হয় এবং অনেক বড় বড় লোক ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তার মধ্যে হোরে হিম্যান উইলসন, ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন, পার্কার হিউম, ষ্টক কোয়েলার প্রভৃতির নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উইলসন সাহেব ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, রিচার্ডসন হিন্দুকলেজের অধ্যাপনা করিতে করিতে ছাত্রদিগেকে থিয়েটারের পাশ দিয়া বলিতেন—"আশাকরি আজ তোমরা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।" ষ্টক কোয়েলার ইংলিসম্যানের সম্পাদক হিসাবে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই থিয়েটার একবার বড় অর্থাভাবে পড়ে। তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুকম্পায় উহা রক্ষা পায়। প্রিন্স নিজে থিয়েটারের বাড়ীটা কিনিয়া টাকার অভাব পূর্ণ করিয়া দেন; পরে আবার ঐ বাড়ীটা থিয়েটারের লোকদেরই ছাড়িয়া দেন। এই থিয়েটারেয় কয়েকটি অভিনেত্রী খুব নামজাদা ছিলেন। তন্মধ্যে সকলের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল মিসেস্ লীচ। মিসেস্ লীচ এতই সুন্দর অভিনয় করিত যে তাহার নামই হইয়া যায় প্রমিলার সিডনস্। কিন্তু থিয়েটারটী আগুনে পুড়িয়া যায়। একদিন প্রায় রাত্রি ১২॥টা পর্য্যন্ত রিহার্সেল চলিতেছিল, পরে সকল আলোগুলি নিভাইয়া সকলে চলিয়া যায়, কেবল সামনের একটি বাতি জ্বলিতেছিল। এটি নিভান হইত না। কি রকমে আগুন ধরে নির্ণয় করা যায় না। আগুন

এমন প্রবলভাবে ধরিয়াছিল যে সমস্ত কলিকাতা সহর আগুনে আলো ময় হইয়া গিয়াছিল।

চৌরঙ্গি থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল বটে, এই থিয়েটারের আদর্শে দুইজন বাঙ্গালী অনেক অর্থব্যয় করেন। একজন কলিকাতার ধনকুবের প্রসন্নকুমার ঠাকুর আর একজন শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ নবীনকৃষ্ণ বসু। প্রসন্নকুমার বেলিয়াঘাটা শুঁড়োর উদ্যানে হিন্দু থিয়েটার খুলিয়া, "উত্তররাম চরিতের" ইংরাজী অনুবাদটির অভিনয় করেন। ইংরাজী অভিনয় হইলেও ইহা হিন্দু সংস্কৃতির পরিচায়ক। জুলিয়াস সিরাজ প্রভৃতিরও অভিনয় হয়, তবে ২।১ রাত্রি পরেই বন্ধ হইয়া যায়। নবীনবাবু কিন্তু খাঁটী বাঙ্গলা অভিনয় করেন। তখন তো কোন নাটক ছিল না, তাই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটী থিয়েটারে দেখান হইত। একটা দৃশ্য হইতে প্রথমে একজনলোক সবটা পড়িতেন, তারপরে দৃশ্য দেখিতে দর্শকগণ নানা স্থানে যাইতেন। যেমন রাজা বীরসিংহের দরবার নবীন বাবুর বৈঠকখানায় দেখান হইত। পুকুর পাড়ে বকুলতলায় সুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ নবীনবাবুর উদ্যানে দেখান হইত। সুরঙ্গ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ-মালিনীর গৃহ সবই প্রাকৃতিক ভাবে দেখান হইত। কিন্তু দর্শকগণকে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের রচনা দেখিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উঠিয়া যাইতে হইত। স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রী লোকেরাই নিত। রাণী ও মালিনী হইত জয়দুর্গা, বিদ্যা হইত রাধারাণী, রাজকুমারী হইত বিদ্যার সখী। নবীনবাবু ৪।৫ বৎসর থিয়েটার করিয়া প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। ইনি বিখ্যাত কৃষ্ণরাম বসুর বংশধর, অল্পবয়সে জমিদারী লাভের পর

খেয়ালবশতঃ থিয়েটার করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। কিন্তু বাঙ্গলা থিয়েটারের ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইবে। ইহারই জ্ঞাতি-ভাই রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের ভক্ত প্রবর বলরাম বসু মহাশয়। বলরাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন।

এই যে বাংলা অভিনয় হইল, ইহার প্রতি স্কুল কলেজের ছাত্ররা কোন প্রকার আগ্রহশীল হয় নাই। তাহারা ইংরাজী নাটকের আবৃত্তি করিতে ভালবাসিত। তবে এই সময় কলিকাতায় কলিরাজার যাত্রা নাটক —কামরূপ যাত্রা নাটক প্রভৃতি মিলনান্তক যাত্রার অভিনয় হয়। কলিরাজ যাত্রা, নাটকখানি বড় মজার নাটক। প্রথমে আসিলেন। দুইজন বৈষ্ণব গান করিতে, তারপর উপস্থিত হইলেন কলিরাজা, তার পরের দৃশ্যে আসিলেন উজির, তারপর চট্টগ্রাম হইতে সদ্য-আগত এক-জন সাহেব ও তাহার 'মেম সাহেব' পরে আসিল তাহাদের বেহারা খানসামা, শেষ দৃশ্যে বাবতীয় কুশীলবগণ একত্র হইয়া নাচ গান করিয়া সকলকে তৃপ্তি দিত। ইংরাজী আর একটি নাটকের সহিত আমাদের সংস্রব আছে। আজকাল যেখানে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ সেখানে সাঁসুচী থিয়েটার নামে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত একটী থিয়েটার ছিল। চৌরঙ্গী থিরেটার যখন পুড়িয়া যায়, মিসেস্ লীচ এদেশে ছিলেন না। খবর পাইবামাত্র তিনি আসিয়া দুই একজন অভিনেত্রীর সাহায্য কল্পে ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে ২।১ রাত্রি অভিনয় করিয়া থিয়েটারের একটি বাড়ী করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। ইংলিশম্যানের সম্পাদক ষ্টক কোয়েলার তাহাকে খুব সাহায্য করেন। থিয়েটারের বাড়ীটি বড় সুন্দর

হয়। এই থিয়েটারে দেশী লোক ও বেশ আসিতেন। আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদ যখন বন্দী হইয়া কলিকাতায় আনীত হয়, তিনিও অভিনয় দেখিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন। একদিন একটি দুর্ঘটনায় থিয়েটারটি উঠিয়া যায়। সে রাত্রিতে বিলাতের একজন অভিনেতা ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে একটি প্রহসনে মিসেস্ লীচ অভিনয় করেন। ষ্টেজে আসিবার পূর্ব্বে লীচ উইঙ্গসের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ ল্যাম্পের আগুনে তাহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া যায়। ধরাধরি করিয়া তাহাকে ষ্টেজের উপর আনা হইল, ড্রপ ফেলিয়া দেওয়া হইল এবং যথাসাধ্য তাহার শুশ্রূষা করা হইল। কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল না। তিন সপ্তাহে অভিনেত্রীকুল শিরোমণি লীচের জীবন দ্বীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

অতঃপর শীঘ্রই পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীর সাঁস্থচী উঠিয়া যায়। ইহার সাঁস্থচী নাম দিয়া এখানে সেখানে অভিনয় হইত বটে, কিন্তু উহা আসল সাঁস্থচী নয়। বৈষ্ণব আঢ্য ও এই সাঁস্থচিতে অভিনয় করিত। সাঁস্থচী থিয়েটারে ক্লিঙ্গার ও রবার্টস্ নামে দুইজন ইংরেজ অভিনেতা ছিলেন। ইহাদের সহিত বাঙ্গালীদের মেলামেশা ছিল। বটতলা ওরিয়েণ্টাল একাডেমির ছাত্রগণ সেকস্‌পিয়ারের নাটকাদি বড় সুন্দর অভিনয় করিত। ক্লিঙ্গার ও রবার্টস আসিয়া তাহাদের শিক্ষা দিতেন। ওরিয়েণ্টাল একাডেমিতে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার নাম হয় ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার। এখানকার অধ্যক্ষ জেফ্রয়ও কাপ্তেন রিচার্ডসনের ন্যায় নাট্যামোদী ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাহাদিগকে

অভিনয়ে উৎসাহ দিতেন। সেক্‌স্‌পিয়ারের জুলিয়াস সিজার, হেনরী দি ফোর্থ, মার্চেণ্ট অব ভিনিস প্রভৃতি অভিনীত হয়। অভিনেতাদের মধ্যে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত এবং রাধাপ্রসাদ বসাক খুব কৃতী ছিলেন। এই ছাত্র অভিনেতাদের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। তিনি তখনও মহারাজা হন নাই। প্রথম হইতেই যতীন্দ্র মোহন ভারতীয় নাট্যকলা এবং দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন। একদিন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন —"তোমরা ইংরাজী—নাটকের অভিনয় করে শক্তি অপচয় কর্চ্ছ কেন? বাংলা নাটকের অভিনয় কর, দেশীয় ঐক্যতান বাদ্যের প্রবর্ত্তন কর।" এই পরামর্শ মতে তাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়দের কাছে বাংলা অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহারা বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন—। কিছুতেই বাংলা অভিনয়ে মত দিলেন না। ইহাতে কেশব গঙ্গোপাধ্যায় প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতি থিয়েটার করিতে বিরত হন এবং হঠাৎ ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার উঠিয়া যায়। কিন্তু এই যুবকগণ বাংলা অভিনয়ে নিরুৎসাহ হইলেন না। সেই সময় একখানি বাংলা নাটক বাহির হয়। নাটক-খানির নাম হয় "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক। হরিনাভির পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন ইহা রচনা করেন। নাটকখানি সময়োপযোগী—তাহাতে আবার অনেক রহস্য পূর্ণ কথাও ছিল। লেবেডফের 'ছদ্মবেশ' ইংরাজী নাটকের অনুবাদ মাত্র, কিন্তু ইহাই খাঁটি প্রথম বংলা নাটক।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চরকডাঙ্গা রোডের জয়রাম বসাকের বাড়ীতে অভিনীত হয়। বসাকরা তখন সঙ্গতিপন্ন ছিলেন বটে, তবে খুব নামজাদা লোক

ছিলেন না। আর যুবকরা সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। রামনারায়ণ নিজেও অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। বালক গিরিশ ঘোষও আসিতেন। কুলীনদের কু-রীতি সম্বন্ধে সত্য কথা প্রচার করায় অভিনয় দেখিয়া কুলীনরা বড়ই চটিয়া যাইতেন। একদিন কয়েকজন পণ্ডিত ক্রোধে রামনারায়ণের সামনেই পৈতা ছিঁড়িয়া তাহাকে অভিশাপ দিয়া যান। নাটকের অভিনয়ে কিন্তু সামাজিক গ্লানি বিদূরিত হইতে থাকে।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে নূতন বাজারের এক কোনে চারি রাত্রি "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটকের অভিনয় হয়, কেইবা তখন এমন খোঁজ লইয়াছে। কিন্তু আজ প্রথমাভিনীত বাংলা নাটক বলিয়া "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক ও নাটুকে রামনারায়ণ এবং জয়রাম বসাকের বাটী বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে * যে কিরূপ অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে—তাহার তুলনা নাই। বস্তুতঃ **"কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটকই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে প্রথম ও প্রধান নাটক। আমরা রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়কে ও প্রথমাভিনীত বাটীর কর্ত্তা জয়রাম বসাককে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিতেছি।**

---

* "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক যে প্রথমাভিনীত নাটক, এ সম্বন্ধে বিস্তৃতালোচনা "ভারতীয় নাট্যমঞ্চে" করিয়াছি। পৃঃ ১৪—১৬

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

স্বদেশী যুগে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম ও ছত্রপতি শিবাজী জাতীয়তা প্রসারে অল্প সহায়তা প্রদান করে নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সকল নাটকের অত্যাশ্চর্য্য অভিনয় এখন আমাদের নিকট স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত। যে আইনের প্রভাবে প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের যুগান্তরকারী নাটকাবলীর অভিনয় বন্ধ হইয়াছে, তাহার আমূল ইতিহাস ঘটনা পরম্পরায় কাহিনীর ন্যায় বিস্ময়কর। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং কোন নাটক, প্রহসন বা গীতিকাব্য রাজদ্রোহমূলক বা অশ্লীলতাদুষ্ট বিবেচিত হইলে গভর্ণমেণ্ট ইহার অভিনয় ও মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কেন যে অভিনয়ের প্রতি এইরূপ কঠোর আইন জারি হইয়াছে অদ্য তাহারই আলোচনা করিব।

গ্র্যাণ্ড্ন্যাসনেল থিয়েটার স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরে জাতীয়তা-মূলক নাটকের প্রতি অভিনেতৃগণের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে নৈন্দুরের মাঠে হিন্দুমেলায় (১৮৭৩ খৃঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে) ন্যাসনেল সম্প্রদায়ের "ভারত বিলাপ" অভিনয়ে, আলুলায়িত-রুক্ষকেশা, মলিন-বেশ-পরিহিতা, রোরুদ্যমানা ভারতমাতার অশ্রুবিসর্জ্জনে, ও কমলিনীর "মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি" সঙ্গীতে সহস্রাধিক শোতৃবর্গ সমস্বরে ক্রন্দন

করিয়া উঠিয়াছিল ইহারই প্রায় দুই বৎসর পরে, হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় গ্রেট ন্যাসনেল থিয়েটার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া স্বরচিত শরৎ-সরোজিনী নাটক (১৮৭৫ খৃঃ ২রা জানুয়ারী) অভিনয় করান। এবং ঐ বৎসরেই তাহার সুদক্ষ পরিচালনায় ক্রমে হীরকচূর্ণ নাটক, সরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক রঙ্গালয় হইতে জাতীয়তার বীজ প্রথমে রোপণ করেন।

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের হীরকচূর্ণ নাটক গাইকোয়ার ও গভর্ণমেণ্ট প্রসঙ্গে রচিত। ১৮৭৫ খৃঃ, ২৯শে এপ্রিল তারিখে বরোদার গাইকোয়ারকে গদিচ্যুত করা হয়। এই নাটকে সংক্ষেপে তাঁহার বিচার সংক্রান্ত ঘটনাবলী বিবৃত আছে। ১৭ই জুন ইহার প্রথমাভিনয় রজনী, কিন্তু অমৃতবাজার ইহার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, "পেট্রিয়ট্ সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় গালিগালাজ করায় গোদুগ্ধের ন্যায় ইহার সমস্ত দোষ হরণ করিয়াছে।" শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "সরোজিনী" নাটক ও (২৬শে ডিসেম্বর অভিনীত) এই সময়ের প্রধান জাতীয় নাটক। "জ্বল-জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবাবালা" গানে এখনও প্রাণে অপূর্ব্ব স্পন্দন অনুভূত হয়। তৃতীয় নাটক সুরেন্দ্রবিনোদিনী। প্রথমে ইহা পুরাতন ন্যাসনেল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিউ-এরিয়ান্ নামে বেঙ্গল মঞ্চে অভিনীত হয় (১৪ই আগষ্ট)। উপেন্দ্র বাবু এক বৎসরের জন্য ঐ সম্প্রদায়কে এই নাটকের অভিনয় করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়

দিনের পূর্ব্বেই সম্প্রদায়টী উঠিয়া যাওয়ায় ৩১শে ডিসেম্বর হইতে গ্রাণ্ড ন্যাসনেলে ইহার অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু এই নাটকখানা লইয়া নাট্যকার ও তাহার সম্প্রদায়কে কিরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইতে হয়, ক্রমে তাহার বিবরণ প্রদান করিতেছি। বেঙ্গল থিয়েটারেও ঐ বৎসরে মলহর রাও, বীরনারী ও পলাশীর যুদ্ধ অভিনীত হইয়াছিল, জাতীয়তা হিসাবে এই কয়খানিও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে।

যে সময়ে অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদ-পত্র থিয়েটারগুলিকে 'সমাজ সংস্কারক' ও 'জাতীয়তা প্রবর্ত্তক' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিয়া জন সাধারণের অভিনয়ানুরাগ বৃদ্ধি করিতেছিল, বস্তুতঃ থিয়েটারের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরও শ্যেনদৃষ্টি ইহার প্রতি পতিত হইল। আর অনুকূল ঘটনাস্রোতও তাহাকে উহা খর্ব্ব করিবার আয়ুধ সংগ্রহ করিয়া দিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড (তৎপরে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) কলিকাতায় পদার্পণ করেন। সেই সময়ে এই ভবানীপুরস্থ বকুল বাগান নিবাসী হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজকে ২০শে পৌষ, (১২৭২) তারিখে নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য কুল-মহিলাদের দ্বারা হুলুধ্বনি ও বরণ প্রভৃতি দেশীয় প্রথায় সম্বর্দ্ধনা করেন। যুবরাজ সঙ্গীয় মহিলাগণকে বহির্ব্বাটিতে রাখিয়া একাকী অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় তদানীন্তন বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক সাহেব নাকি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক্ জগদানন্দ বাবুর আচরণে দেশে ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়া যায় এবং হিন্দু সমাজ এইরূপ

অভিনব সম্বর্দ্ধনার ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ করেন। জনরব, যুবরাজ মুখোপাধ্যায় পত্নীর বহুমূল্য হীরক খচিত স্বর্ণাভরণাদি দেখিয়া নাকি অত্যন্ত প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পেট্রিয়ট্ বলেন "জগদানন্দ বাবুর কার্য্যে জাতির মেরুদণ্ডে আঘাত করা হইয়াছে"। অমৃতবাজার পত্রিকা আরও তীব্র-ভাবে এই কার্য্যের নিন্দা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন—"হিন্দু সমাজ সকল নিপীড়ন সহ্য করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু পরিবারের উপর কোন আঘাত হইলে উহা সহ্য করিতে পারে না। আমরা সর্ব্বস্ব-চ্যুত হইয়াছি, কিন্তু পরিবারের যাহাতে কলঙ্ক হয়, এরূপ কার্য্য যিনি করেন, তিনি হিন্দু জাতির পরম শত্রু ও হিন্দু সমাজের কলঙ্ক। জগদানন্দ বাবুর কার্য্য হিন্দু জাতির অনুমোদনীয় নহে"। বাস্তবিক এই কার্য্যে হিন্দু মাত্রেই এতদূর ব্যথিত হয়েন যে কবি হেমচন্দ্রও "বাজীমাৎ" কবিতায় সতীর্থ উকিল-বন্ধুকে ব্যঙ্গ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই :—

"বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভাল বটে
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥
"ফিক্র" দাবে, এক তাড়াতে কল্লে বাজীমাৎ
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥"

এই আন্দোলনের সময় রঙ্গালয় হইতেও ব্যঙ্গ-মূলক প্রহসনাভিনয়ে জগদানন্দ বাবুর নিন্দা অধিকতর চপ্রার হইতে থাকে। চারিদিক হইতে প্রতিবাদ লাঞ্ছনা ও নিন্দা জগদানন্দ বাবুকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহার সহায় হইলেন ও অন্যদিকে কিছু

করিতে সক্ষন না হইয়া রঙ্গালয়কেই দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তৎকালীন শাসন-কর্ত্তা স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ গবর্ণর জেনারেল হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া জগদানন্দ ও কর্ণাট কুমার. হনুমান চরিত্র ও Police of Pig Sheep তিনখানি প্রহসন বন্ধ করিতে আদেশ দেন। ১লা মার্চ্চ তারিখে ডেপুটী কমিশনার মিঃ ল্যামবার্ট উপেন্দ্র বাবুর অনুপস্থিতিতে ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট আদেশ পত্র দিয়া পরামর্শ স্বরূপ এবম্বিধ অন্যান্য নাটকের অভিনয় করিতে নিষেধ করিয়া আসেন। এই প্রহসন আমাদের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে অমৃত বাজার বলেন "প্রহসনখানিতে কোন অশ্লীলতা দোষ ছিলনা।" কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই আইনের খসড়া উপস্থিত করিবার সময় প্রকাশ করেন "একজন ভদ্রোলোক যাহা ন্যায়,সম্মানার্হ ও অপরাধ শূন্য এমন কাজ করিয়া রঙ্গমঞ্চে যেরূপ ঘৃণিতভাবে চিত্রিত হইয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রতিকার না করিয়া কিরূপে স্থির থাকিতে পারি ?"

ইহার অব্যবহিত পরে রঙ্গালয়ের সম্পর্কে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে সুকুমারী বিরোজমোহিনী নাম্নী কুমারীর ভূমিকা গ্রহণ করিত। যে দৃশ্যে বিরোজমোহিনীর প্রতি মাজিষ্ট্রেটের পাশবিক অত্যাচারও পুনরায় রক্ত-রঞ্জিত কলেবরে দর্শকের সমক্ষে তাহার পুনঃ প্রবেশ, প্রদর্শিত হয়, সুকুমারীর সেই অংশের অভিনয় দর্শকবৃন্দকে এরূপ রোমাঞ্চিত করিত যে গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষকে দণ্ডনীয় করিতে মনস্থ করেন। ৬ই মার্চ্চ তারিখে স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী,

ডাইরেক্‌টার বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, আঃ ম্যানেজার বঙ্কুবিহারী দাস, প্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) সঙ্গীত শিক্ষক রামতারণ সান্ন্যাল, বাবু শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র দাস ওয়ারেণ্টে ধৃত হইয়া প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের জন্য প্রেরিত হয়েন। এই মোকর্দ্দমা লইয়া চারিদিকে বিষম হুলস্থুল পড়িয়া যায় ও স্বপক্ষে বিপক্ষে নানাপ্রকার অভিমত প্রকাশ হইতে থাকে। দেশীয় অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোক, এমন কি রেভারেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, অবলা বান্ধব, সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রভৃতি অনেকে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নাটকখানিতে অশ্লীলতা দোষ নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে কথিত দৃশ্যটী আইভেনহো উপন্যাসের নাইট্ টেম্পলার ও ইহুদী কুমারীর রেবেকার অনুরূপ মাত্র। পার্থক্য এই যে বিরাজমোহিনী উল্লম্ফনে পড়িয়া পুনরায় আহতাবস্থায় দর্শকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। বাবু শ্যামাচরণ সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও হাইকোর্টের প্রধান ইণ্টার-প্রিটার ওয়েন্ সাহেবের সাক্ষ্য সত্ত্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের বিচারে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (২৯২ ও ২৯৪) ধারানুসারে অশ্লীল দৃশ্য ও অশ্লীল সঙ্গীত প্রচারের অপরাধে উপেন্দ্র বাবু ও অমৃত বাবুর একমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয় ও অবশিষ্ট আসামীগণ মুক্তিলাভ করেন। প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় হাইকোর্টে মোসন করিয়া উভয়কে জামিনে খালাস করেন ও

ব্রনসন, মনোমোহন ঘোষ ও তারক পালিত কৌন্সিলী মহোদয়গণের সুদক্ষ পরিচালনায় জাষ্টিস্ ও ফিয়ার ও মার্কবীর যুক্ত বিচারে ২০ মার্চ্চ তারিখে নাটকের অশ্লীলতা দোষ স্খলিত হয় ও অভিযুক্তদ্বয় অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন। *

এই বিচারে গভর্ণমেণ্ট এত উত্তেজিত হয়েন যে উক্ত ২০শে মার্চ্চ তারিখেই আইন বিভাগের কর্ত্তা হবহাউস সাহেব ড্রামাটিক আইনের বিল উপস্থিত করেন। এবং ইতিপূর্ব্বে বিচার কর্ত্তা ফিয়ার সাহেবের বিদায় লইয়া দেশে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অতঃপরেই একেবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারে অনেক সন্দেহ করেন যে বোধ হয় লর্ড নর্থব্রুক্ উপরোক্ত বিচারের জন্যই তাহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। যাহা হউক এখন হইতে আর আদালতের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং যাহাতে সন্দেহযুক্ত অভিনয় বন্ধ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যই এই আইন প্রণয়ন। চতুর্দ্দিক হইতে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইল বটে, কিন্তু এক সম্প্রদায় আবার গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিতেও ত্রুটী করিলেন না। পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ ও একদল শিক্ষিত লোক অভিনেত্রী সংশ্লিষ্ট পাবলিক থিয়েটারের উপর বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না, একটী নূতন ঘটনায় আবার এখন তাহারা একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

---

*On a reference to R vs. Stevens 2 Earls reports Page 258. Grounds—4. No. evidence on record. 2. Trial without a specific charge.

আমরা ইতিপূর্ব্বে সুকুমারীর অভিনয়ের কথঞ্চিত আভাষ দিয়াছি, কিন্তু তাহার মাতৃদত্ত নাম সুকুমারী নহে, গোলাপসুন্দরী। শরৎ-সরোজিনী নাটকে গোলাপ সুকুমারীর ভূমিকায় অভিনয়-কলার এমন উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিত যে প্রথমে রঙ্গালয়ের ভিতরে ও পরে সাধারণের মধ্যে তাহার নামকরণ হইল সুকুমারী। আমরা শুনিয়াছি অতঃপরে জনৈক অভিনেত্রী নাকি গিরিশচন্দ্রের 'বিষাদ' নাটকে বিষাদের ভূমিকায় এরূপ উৎকৃষ্ট কলার পরিচয় প্রদান করিয়া 'বিষাদ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। লব্ধ প্রতিষ্ঠ অভিনেতা তারক পালিতকেও গিরিশচন্দ্র তাঁহার কতিপয় নাটকে "বসন্ত রায়" নামে পরিচিত করিয়াছেন, বোধ হয় উক্ত ভূমিকায় নিখুঁত অভিনব-কলা প্রদর্শনের জন্যই। যাহা হউক্ উপেন্দ্র বাবু থিয়েটারে আসিয়াও সমাজ সংস্কারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি নিজেও এক বর্ষীয়সী বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া পিতৃরোষ বরণ করিয়া লয়েন এবং পরে স্নেহশীলা মাতার অনুকম্পায় তাঁহার ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। রঙ্গালয়ের সংস্রবে থাকিয়া তিনি অভিনেত্রী জীবন কথঞ্চিৎ উন্নত ও সংস্কার করিতে প্রয়াসী হইয়া তাহাদের বিবাহ দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোষ্টবিহারী দত্ত নামে তাহার জনৈক অনুগত যুবককে সম্মত করিয়া তাহার সহিত সুকুমারীর বিবাহ দেন। এই গোষ্টবিহারী শরৎ-সরোজিনীতে পুস্তক বিক্রেতার একটী ছোট ভূমিকা গ্রহণ করিত। খুব অল্পকাল স্থায়ী হইলেও সুকুমারীর অভিনব বিবাহিত জীবন বেশ সুখে অতিবাহিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই দুঃসাহসী যুবক অবশেষে

পরিণীতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এক জাহাজের খালাসীরূপে উপেন্দ্র বাবুর নিকট বিলাত চলিয়া যায় ও অল্পদিন মধ্যে সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বাধ্য হইয়া মিসেস্ সুকুমারী দত্তকে পুনরায় অভিনেত্রী জীবন অবলম্বন করিতে হয়। রুচিবাগীশ ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে জাতীয় রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। ১৭ই মার্চ্চ তারিখে ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ পত্রে একখানি অশিষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়। সাময়িক সম্প্রদায় বিশেষের অভিমত জানিবার জন্য পাঠকের নিকট পত্রখানার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

Satisfaction will not be fully realised as long as the walls of the pavilelion of this infamous company are not levelled to the ground, its furniture confiscated and sold under the hammers of the state. That this theatre has by the introduction of harlots on the stage become the hot-bed of immortality and corruption none can deny……Some have gone to the length of saying that the "Mirror" has been alienating the sympathy of the Hindus by making ungenerous remarks on the taintless conduct of the distinguished personages and adorable women of the theatre who like Orpheus burnt with public zeal were not ashamed even to effect prostitute-marriages amongst them."

যাহা হউক্ সাধারণ জনমত বিরুদ্ধে কতিপয় লোকের সহায়তা বলে গভর্ণমেণ্ট ডিসেম্বর মাসে বাস্তবিকই আইনখানি মঞ্জুর করিলেন। সূক্ষ্মত দেখিতে গেলে মনে হয় এক "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"

মামলা পণ্ড হওয়াই এই আইনের প্রবর্ত্তন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট 'চাকর-দর্পণ নাটক' ও এতদ্‌প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন মাননীয় হবহাউস্ মহোদয় বলেন যে এই নাটকখানির অভিনীত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার অভিনয় হইলে বিষম অনর্থ হইত, কারণ চা-কর সাহেবদিগকে নাকি উহাতে নররাক্ষসরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে।

এই আইনের প্রভাবেই আমাদের যুগান্তর নাটকাবলীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কয়খানিই এখন রাজরোষে কবলিত। মোহনলালের দেশত্ব-বোধক উক্তি আর শুনিব না, হে সাহেবের উক্তি "নবাব সাদা কালা এক করিতে চাহে" আর কর্ণগোচর হইবেনা, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত বা নন্দকুমারের বিচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া রোমাঞ্চিত হইব না, আর সে লরেন্‌স্ ফষ্টর নাই, 'সংসারের' ছোট সাহেব নাই, নীলদর্পণের উড্ রোগ নাই, মহাশয়ের উদ্দীপনাময়ী ভাষা আর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইবেনা। কিন্তু আক্ষেপে কোন ফল নাই। যে সমবায় প্রচেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট পুনরায় স্বীয় বিধান রদ করিতে বাধ্য, আমাদের তাহা কোথায়? পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন ইহারই তিনমাস মধ্যে লর্ড লিটন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া Vernacular Press Act পাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এখন তিরোহিত। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এই অভিনয় সম্বন্ধীয় কঠোর আইন ও সরকারী নথিপত্র হইতে চিরতরে অপসারিত হইবে।*

---

* "রূপ ও রঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত।

স্বাদেশিকতায় রবীন্দ্রনাথ *

রবীন্দ্রনাথকে যে দিক দিয়া বিচার করা যায়, সেই দিকেই তাঁহার বিরাটত্ব উপলব্ধি হয়। কবিত্ব শক্তিতে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বযুগেই আলোচিত হইবে। তাঁহার সঙ্গীত, কাব্য, গল্প ও উপন্যাসের সৌন্দর্য্য চিরকালই আমাদিগকে মুগ্ধ করিবে, এবং নাট্য-প্রতিভা লইয়াও আমাদের মধ্যে আলোচনা হইবে। তাঁহার গীতিকাব্য সকলের চিত্ত বিনোদন করিবে। তাঁহার অভিনয়-প্রতিভা আলোচনা করিয়াও অনেকেই তাঁহার শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় দিবেন এবং তাঁহার বাণীও কেহ কেহ উদ্ধৃত করিবেন। সর্ব্বদিকেই তিনি বিরাট। তিনি শুধু বাংলার বা ভারতেরই কবি নহেন, বিশ্ব-সংসারের শান্তিবাণী তাঁহার কবিতায় ঝঙ্কৃত হওয়ায় তিনি সমগ্র পৃথিবীরই কবি। তাঁহার নিজের রচনাতেই পাওয়া যায়।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি.....

---

* ২৫ শে বৈশাখ ১৩৫৩ সালে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

'রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে আমি "ভারতীয় নাট্যমঞ্চে" কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। পৃষ্ঠা—১৯১

তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া, ভারতের জাতীয়তা রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনায় কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, সেই বিষয়েরই আজ এখানে একটু পরিচয় দিব।

রবীন্দ্রনাথ যখন বালক, সেই সময় ঠাকুর বাড়ীর অর্থ সামর্থ্যেই "হিন্দুমেলা" স্থাপিত নয়। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থ সাহায্য করেন, রাজ নারায়ণ বসু উৎসাহ দেন আর নবগোপাল মিত্র ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই হিন্দুমেলাতেই প্রথমে স্বদেশী শিল্প ও স্বদেশ-জাত দ্রব্যের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী ভাব এতই প্রবল ছিল যে জনৈক বন্ধু তাঁহাকে ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া পত্রখানি পুনরায় লেখকের কাছে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু বলিতেন, "ইংরাজদের সঙ্গে একটু মিশিলেই তিনি কে, সি, এস, আই প্রভৃতি হইয়া যাইতেন।" কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ লব বলিতেন "The proud old man does not condescend to accept any praise from Englishmen."

মিস্ মেরী কার্পেণ্টার দেখা করিতে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি কুষ্টিয়ায় জমিদারী দেখিতে চলিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা" প্রভৃতি গান এবং অপর পুত্র জ্যোতিরীন্দ্র নাথের গান, কবিতা ও "পুরুবিক্রম" এবং "সরোজিনী" নাটক জাতীয়ভাবে পরিপূর্ণ। এই অবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী শিক্ষা সুরু হয়। আর এই শিক্ষা যে উত্তরকালে কবির সুরে অপূর্ব্ব ছন্দে রূপায়িত হইয়া উঠিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই যখন প্রথমে

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে তাঁহার নিম্ন লিখিত সঙ্গীত দ্বারা মুগ্ধ করেন :

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
ঘরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?...

কবির 'ওই ভুবন মনমোহিনী' গানটিও এই ভাবধারাতেই রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেসের ১৮৯৬ সালের অধিবেশনে সর্ব্বপ্রথম তিনিই শুভ্রবস্ত্র পরিহিত হইয়া সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটি গাহিয়া উপস্থিত জনসাধারনকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেন। আজ সেই গানই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে সর্ব্বজনপ্রিয় একমাত্র জাতীয় সঙ্গীত।

লর্ড কার্জ্জন যখন বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাবে বঙ্গবাসীর মন একেবারে চঞ্চল ও বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিলেন সেই মহাযজ্ঞানুষ্ঠানেও রবীন্দ্রনাথের অবদান বড় সামান্য ছিলনা।

১৮৯৪ সনের জুলাই মাসে (বাঙ্গলা ১৩১১, ৭ শ্রাবণ) চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউসনে একটী সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতেও আমরা আত্মনির্ভরতামূলক রাজনীতির সন্ধান পাই। বক্তৃতা শুনিয়া সভাপতি মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত (আই, সি, এস) মহাশয় বলেন, এরূপ বক্তৃতা তিনি পূর্ব্বে কখনও শোনেননি। বক্তৃতার কতকাংশ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি—

"এখন আমরা আত্মনির্ভরের সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া দরখাস্ত জারি করিয়াই স্বদেশের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছি।···এখনকার রাজসম্মানে সম্মানিত ব্যক্তিগণের ন্যায় পূর্ব্বে কেহ আত্মবিক্রয় করিতেন না। বিলাতের মনও ভুলাইতে পারিতেন না। বারম্বার মাথা না হেঁট করিয়া এখন এ সমস্ত মিথ্যা ছলাকলা ফেলিয়া দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবারজন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি ?"

পুনরায় ১৯০৫, ১১ মার্চ্চ তারিখে রবীন্দ্রনাথ "সফলতার সদুপায়" প্রবন্ধে বলেন :

"গভর্ণমেণ্টের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই।···পরেণ দেয়মতি কাপুরুষা বদান্তি।"

বঙ্গভঙ্গের দিনে রবীন্দ্রনাথই সকলের জন্য নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়া দেন—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল"
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ

পুর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বংলার পণ, বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

গানটিতে সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতল, শস্য শ্যামলা বঙ্গমাতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়া বাঙ্গলার বাণিজ্য (হাট), শিল্প, বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর "এক ভাষা" ও "একতার" কথাই স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। বাঙ্গালীর এই রাখী বন্ধনের গান গাহিয়া জাতিগত বৈষম্য ভুলিয়া একই ভাষা ও কৃষ্টিতে যাহাতে লোক ছুটিয়া আসে, ইহাই ছিল তাঁহার আশা।

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'—

গানটিতেও রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি আমরা পূর্ণ ভাবেই উপলব্ধি করি।

'প্রায়শ্চিত্তের' ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন রাজা প্রতাপাদিত্যকে বলে—"খাজনা দিব কি' আগে বাঁচি, তারপরে তো খাজনা দিব।" তখনও সেই সংলাপের মধ্যে দরিদ্র বাংলারই রূপ দেখিতে পাই সুস্পষ্টভাবে। বিলাস ব্যসনের আচরণে রবীন্দ্রনাথ বুভুক্ষু জনগণের প্রতি যে মমতা পোষণ করিতেন, তাহার পরিচয় এই 'জাতীয় কথোপকথন ও সংলাপ চাতুর্য্যের মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ধনঞ্জয় বৈরাগীর গানটিও এখানে চমৎকার :—

আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারই জয় গাই,
তোমার শিকল ভাঙা
এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।

এইখানেই আমরা No Tax compaigun এর আভাষ পাই। এই বাংলার শ্যামলতায় তাঁহার মতন মন বুড়াইয়া গিয়াছে, অমৃত লাভ শ্যামলা আমাদের এই সোণার বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি লিখিতেছেন

"সার্থক জন্ম মাগো জন্মেছি এ দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

আলিপুরের দায়রা আদালতে যখন শ্রীঅরবিন্দ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির বিচার চলিতেছিল, সেই সময় একদিন সুরশিল্পী উল্লাস করের কণ্ঠে কবির উপরোক্ত ঐ গানটি শুনিয়া জজ, মিঃ বীচ ক্রফট্ এসেসার, উকিল, ব্যারিষ্টার সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন।

এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গীতে ও কবিতায় দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। দেশ সম্বন্ধে প্রাণের ভিতরে গভীর স্পন্দন না জাগিলে এইরূপে প্রাণোন্মাদকারী কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে না। কবি—'বন্দীবীরে' উদাত্তস্বরে বলিতেছেন—

এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পারের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চ নদী ঘিরি দশতীর এসেছে সে একদিন॥
দিল্লী প্রাসাদ-কুটে
হোতা বার বার বাদ্‌শাজাদার তন্দ্রা জেতেছে ছুটে।
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে, নিবিড় নিশিথ টুটে,
কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে॥
পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্ত লহরী মুক্ত হইল কিরে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ষ তিলক ললাটে পরাল পঞ্চ নদীর তীরে।...

—ইত্যাদি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাবে রবীন্দ্রনাথ

অবিলম্বে তাঁহার 'নাইট্' উপাধি ত্যাগ করিলেন এবং ভারত ভাগ্য-বিধাতার উদ্দেশে লিখিলেন :—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃন সহ দহে।'

এই উপলক্ষে ১৯১৯ সালের ৩০শে মে তারিখে তিনি বড়লাট লর্ড চেম্‌স ফোর্ডকে নিম্ন লিখিত পত্রখানি লেখেন—

নিরস্ত্র ও নিঃসহায় জাতির উপরে মনুষ্যঘাতী অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান শক্তিমান জাতি যে অত্যাচার করিল তা সভ্য গভর্ণমেণ্টের ইতিহাসে এই অত্যাচারের তুলনা নাই। আমাদের জনমনের পুঞ্জীকৃত বেদনা শাসকসম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছে, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্র সেই উপেক্ষার প্রশংসা করিয়াছে, আপনাদের দুঃখ দেখিয়া উপহাস করিয়াছে।... আজ আমি এই কোটী কোটী দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানানো কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। আজ আমি দেখিতেছি আমার এই সম্মানের নিদর্শন উপাধিটি আমাদের পূর্ব্বোক্ত অপমান ও লজ্জাকে আরও কল্পিত করিয়া তুলিতেছে। আমি এই বিশিষ্ট সম্মানের পদ ত্যাগ করিয়া আমার অবাঞ্ছিত, অপমানিত লাঞ্ছিত দেশবাসীর পাশে দাঁড়াইতে চাই। তাই আমাকে এই নাইট পদবী হইতে মুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যেদিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম গঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার স্বস্তিবচন এখনও আমাদের কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হয়।

সুরাটে যখন কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হয়, রবীন্দ্রনাথের "যজ্ঞভঙ্গী" প্রবন্ধ এবং পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ এবং প্রবাসীতে উভয়দলের মিলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ খুবই জ্ঞানগর্ভ তাঁহার "গোরা" উপন্যাসে তৎকালে স্বদেশী সম্বন্ধে যুবকগণ খুবই উৎসাহ পাইতেন।

১৯০৭ সালে পাবনায় যে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিরূপে প্রথম বাঙ্গলায় অভিভাষণ পাঠ করেন। নরম ও গরম দলের যাহাতে সামঞ্জস্য হইতে পারে সম্মিলনীতে তিনি এই স্বীয় মত ব্যক্ত করেন। এই সময়ে তিনি প্রবাসীতে "ব্যাধি ও প্রতীকার" প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

ইংরাজ রাজত্বে এই পৌণে দুইশত বৎসরে আমরা কি পাইয়াছি একথা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি আমাদিশকে বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেশের দুর্দ্দশার কথা তাঁহার প্রাণে তীব্রভাবে বিঁধিয়াছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার শেষ জন্মোৎসব বাসরে (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ) 'সভ্যতার সঙ্কট' ভাষণে তাহা মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন ঃ

"নিভৃত সাহিত্যের রস সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হইতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল, তা হৃদয় বিদারক অন্নবস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি শরীর মনের যা কিছু অত্যাবশ্যক, তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর

আধুনিক শাসন চালিত কোন দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরাজকে দীর্ঘকাল ধ'রে তার ঐশ্বর্য্য জুগিয়ে এসেছে। ···ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই একদিন না একদিন ইংরাজকে এই ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষ সে পেছনে ত্যাগ ক'রে যাবে! কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসন দ্বারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্ব্বিষণ্ণ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী আকিঞ্চিতকর উচ্ছিষ্ট সত্যাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাণ পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব।"

জীবনের শেষ বিদায় মুহূর্ত্তে পৃথিবীর দানবীর রূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সত্যাশ্রয়ী জনগণেক অন্যায় অবিচারের সম্মুখীন হইয়া উহা দূরীকরণ করিতে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। তাই কবি লিখিয়াছেন :—

নাগরীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ভাগ দিয়ে যাই—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

কবিকুঞ্জের রস সম্ভোগ হইতে অবসর লইয়া এক একদিনে যে কবি মাঝে মাঝে লোক সমক্ষে আসিয়া বাণী দিতেন, তাহাতে দেশবাসী যে অনু-প্রেরণা পাইয়াছে তাহাতে মনে হয় কবি যদি কয়েক বৎসর তাহার কবিতায় ভারতীয় জনগণের হিতকল্পে মহাত্মাজীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন,ভারতবধের কতনা সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি হইত।

যাহা হউক মহাপ্রয়াণের দুইএক মাস পূর্ব্বে মিস্ রাথবেনা নাম্নী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্যা ভারতবাসীদের প্রতি অথবা নিন্দা করিয়া পণ্ডিত জওহর লালের উদ্দেশে যে এক খানি পত্র লেখেন, রুগ্নশয্যায় শায়িতাবস্থায়ও কবিগুরু তাহার নিন্দোক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা করেন নাই। তাহার মর্ম্ম এই—

"আজ জওহরলাল কারাগারে' তাই রোগশয্যায় থেকেও আমাকেই কর্ত্তব্য কর্ত্তে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি দুই শতাব্দীর পরেও এই দেশবাসীর শতকরা একজন মাত্র ইংরাজী ভাষার জ্ঞান লাভ করেছে। এদিকে মাত্র ২৫ বৎসরের সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরে (১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত) শতকরা ৯৮ জন শিক্ষিত হয়ে উঠেছে।

"এদিকে ব্রিটিশ প্রভুরা দেশের সমুদয় সম্পদ শক্তি আহরণ করে পুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু প্রতিদানে দেখছি চারিদিকে ক্ষুধাকীর্ণ সব নরদেহ, অন্নের জন্য আর্ত্ত চীৎকার, পানীয়ের জন্য হাহাকার।"

"আর কোথায় বা শান্তি-শৃঙ্খলা, চারিদিকে তাকিয়ে দেখি দেশবাসী দাঙ্গার তাণ্ডব। ভারতবাসী দলে দলে প্রাণ হারাচ্ছে, আমাদের বিত্ত-সম্পত্তি লুণ্ঠিত, নারী লাঞ্ছিত, কিন্তু তবু শক্তিমান ব্রিটিশের বাহুপেশীতে

সাড়া নেই ; অত্যাচারিতের রক্ষায় সে এগিয়ে আসে না। শুধু সাগর-পার থেকে ব্রিটিস কণ্ঠের কটূক্তি ভেসে আসে, ঘরোয়া শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের এই অযোগ্যতার জন্য।"

রবীন্দ্রনাথের প্রাণ জাতির পতিত নিরক্ষরদের জন্যও যে কিরূপ ব্যাকুল হইত তাহার পরিচয় পাই—বিশেষভাবে এই কয়টি পরক্তিতে ঃ

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে
হবে আশা।"

ঐ কৃষক চাষাদের মুটেমজুরদের দুঃখে যে তাঁহার প্রাণ কিরূপ কাঁদিয়া উঠিত তাঁহারও বাস্তব পরিচয় পাই অন্যত্র, যেমন—

"হেথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্র বৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস
ওরা কভু আধা মিথ্যা রূপে
সত্যেরে তো হানেনা বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্ত মূল্য
ঐশ্বর্য্যের চেয়ে।"
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধ'রে থাকে হাল,

ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।”

সর্ব্বোপাঠ তাঁহার সাহিত্যে এক সর্ব্বজাতীয়তার অমর মন্ত্র মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে প্রাণোময়রূপে। ‘গোরা’য় মহিমময়ী আনন্দময়ীর চরিত্রে এই মহানুভবতারই পরিচয় পাইয়াছি। ‘ভারততীর্থ’ কবিতাটিতেও এই সুরই সুপ্রকটিত, যেমন—

“হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

* *

এস হে আর্য্য এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খ্রীষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এস হে পতিত হোক্ অবনীত
সব অপমান ভার।...

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থ-নীরে,
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে !”

এই ভারতের মহামানবের স্বপ্ন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আশা-বাণী। একদিন তপোবন হইতে এই বাণীই উদ্‌গীত হইয়াছিল ; আমাদের বেদ আর উপনিষদেও এই বাণীই চির জাগ্রত। সেই উপনিষদের সাধক কবি, বিশ্ববাসীর প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার নিজের দেশের আকাশ, মাটি, বাতাস আর জলের সঙ্গে এমনি করিয়া বিশ্বপ্রকৃতি এক হইয়া একই সুরে মিলিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধায় মাথা নত করি।

বাঙ্গলা ভাষার প্রথম গদ্য পুস্তক *

সম্প্রতি শ্রীরামপুর সহরে একখানি গদ্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম "ধর্ম্মপুস্তক"; ৮০০ পৃষ্ঠার বহি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইয়াছে। ১৭৯৯তে অথবা তাহারও পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। হুগলীর বিখ্যাত উকীল প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্-শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র-নাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি-এল, মহাশয় গ্রন্থখানি পাইয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছেন।

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের নব প্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে" এই পুস্তকখানির কোন উল্লেখ নাই।

বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান্ সুধীর কুমার মিত্র "হুগলী জিলার ইতিহাস" প্রণয়নে রত হইয়া আমাকে শ্রীরামপুরে ফণীন্দ্র বাবুর কাছে রক্ষিত কতিপয় মহামূল্য রচনার কথা বলেন, তদনুসারে শ্রীমান্ সমভিব্যাহারে শ্রীরামপুরে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া আসিয়াছি। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর, শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল দাঁ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বিষ্ণুবাবু ছবিগুলি তুলিয়া দিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে কতিপয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মনে করেন, ১৮০১ সালে মুদ্রিত রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য'

* বঙ্গশ্রী ভাদ্র, ১৩৫৩,

প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু আমাদের কথিত 'ধর্ম্মপুস্তকখানি' 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের'ও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পুস্তকখানি ডিমাই আকারে ৮০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা যে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত তাহাতে সন্দেহ হয় না। ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"ধর্ম্মপুস্তক, তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য—শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ১৮০১।" এই দীর্ঘ পুস্তকখানি কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হইতে প্রায় ৩।৪ বৎসর লাগিবার সম্ভাবনা। সুতরাং ইহা ফোরষ্টারের অভিধানেরও (১৮০১)* পূর্ব্বে রচিত। পূর্ব্বেই হৌক, পরেই হৌক, হেলহেডের ব্যাকরণে (১৭৭৮) বা ফোরষ্টারের পুস্তকাদি যে ইংরাজি বাঙ্গলা মিশ্রিত তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু "ধর্ম্মপুস্তক"খানি খাঁটি এবং অবিমিশ্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ। ইতিপূর্ব্বে এরূপ খাঁটি বাঙ্গলায় কোন গদ্যগ্রন্থ রচিত হয় নাই।

পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কণ যে ১৮০১ সালে শেষ হইয়াছে তাহা প্রচ্ছদপত্রে বর্ণিত আছে। আর বিশেতঃ ইহার শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওল্‌দে জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় জনাই—১২০৯, ৪ঠা ফাল্গুন।"- পুস্তকখানি বেগমপুরের এক তন্তুবায়ের গৃহ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি বাহির হইবার এক বৎসরাধিক পরেই চন্দ্রনাথ

*কেহ কেহ বলেন ফোরষ্টারের অভিধান ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত কিন্তু আমরা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বলিয়া অধিকতর সম্ভব মনে করি। অন্যত্র ইহার আলোচনা হইবে।

বাবুর নাম লিখিত হইয়াছে। তাহাতেও ১৮০১ সালের তারিখটি সমর্থিতই হইতেছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে যে কেরী সাহেবের শ্রীরামপুরে **Baptist Mission Press** স্থাপিত হয় তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং সেখানে রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের মত ক্ষুদ্র বহিই ছেনি কাটা অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও ১৮০১ সালে আরম্ভ হইয়া ১৮০২ সালে সমাপ্ত হয়। তর্কের খাতিরে ধরিলাম যদিই বা রামরাম বসুর পুস্তক ১৮০১ সালেই মুদ্রিত হইয়া থাকে, তথাপিও কথিত ধর্ম্মপুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ যে বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। **Baptist Mission Press** হইতে কেরী সাহেবের একখানি পুস্তক, রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং রাজীব মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত্র ভিন্ন বিশেষ নামকরা গদ্যগ্রন্থ বাহির হয় থাই। আর শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইলেও আমাদের আলোচ্য ধর্ম্মপুস্তক ব্যাপটিষ্ট মিসম প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কোন নিদর্শন নাই। সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে এই মৌলিক পুস্তকখানিই যে এতাবৎ আবিষ্কৃত প্রথম রচিত ও মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এখন এই ৮০০ পৃষ্ঠার ধর্ম্মপুস্তকখানির রচয়িতাই বা কে আর প্রকাশিত হইল কাহাদের চেষ্টায়, সেই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, শ্রীরামপুরে আসিবার পরে কেরী সাহেবও নিউ টেষ্টামেণ্টের (**New Testament**) কিছু কিছু অংশ বাহির করিয়াছিলেন এবং সেই পুস্তকের নামও ছিল "ধর্ম্মপুস্তক"।

আমাদের আবিষ্কৃত এই পুস্তকের নামও "ধর্ম্মপুস্তক"। এখন প্রশ্ন এই যে আলোচ্য পুস্তকখানিই কেরী সাহেবের পুস্তক কি না, আর ইহাকেই আমরা নবাবিষ্কৃত পুস্তক বলিয়া দাবী করিতেছি কি না - এ সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ বিদ্বজ্জনসমাজের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

আমরা পণ্ডিতপ্রবর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানিতে পারি যে, কেরী সাহেব নিউটেষ্টামেণ্ট অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ মাথিও কথিত সমাচার প্রথম ছাপা আরম্ভ হয় এবং ১৮০১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী ছাপা শেষ হয়।* যেদিন ছেনিকাটা অক্ষরে Baptist Mission Pressএ প্রথম ছাপা আরম্ভ সেদিন পাদ্রী সাহেবের আনন্দের পরীসীমা ছিল না। রেভারেণ্ড দেও সেই দিন স্মরণীয় দিনটির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"On the 18th March 1800, an ever memorable day, Carey took an impression of the first page of the Gospel of St. Mathew, The last page was printed on the 10th February 1801. There was the New Testament printed."†

কেরীর পুস্তকখানি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত বাবু তাঁহার নবপ্রকাশিত

---

* The Bengal Magazine 1875.

† শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যে লিখিয়াছেন, ৭ই ফেব্রুয়ারী তাহা ঠিক নহে তারিখটি ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮০১।

"বাংলা গদ্য সাহিত্যের" পৃষ্ঠায় বলেন "ইহা ১২৫ পৃষ্ঠার ডিমাই আকারের বহি, এবং শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরীর বোর্ডরুমে রক্ষিত আছে। আর ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইংরাজী নম্বর আছে।"

আলোচ্য পুস্তকখানি এবং এই পুস্তকখানির পার্থক্য এই—

(১) কেরীর পুস্তকের পৃষ্ঠা ১২৬, আর ইহার পৃষ্ঠা ৮০০।

(২) কেরীর পুস্তক নিউটেষ্টামেণ্টর আর আলোচ্যখানি ওল্ড এবং নিউ উভয়ই এবং ওল্ডই বেশী—যেমন গ্যালিসিয়ান, কলোসিয়ানস্, মেসোলোনিয়ানার, টিমোসি, টিটাস, সিফেলন, পিটার ১ম ও ২য় জন ও জুডা প্রভৃতি অধ্যয় প্রদত্ত হইযাছে।

(৩) কেরীর পুস্তকে ইংরাজীতে পাতার নম্বর আছে, ইহাতে পৃষ্ঠার কোন নম্বর নাই।

(৪) আলোচ্য পুস্তক তর্জ্জমা হয়—গ্রীক ভাষা হইতে, কেরীর পুস্তক হিব্রু ভাষা হইতে।

(৫) আলোচ্য পুস্তকে লেখা আছে—

ধর্ম্ম তাহার অন্ত্যভাগ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যেশুখ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার তর্জ্জমা হইল গ্রীক ভাষা হইতে।

কেরীর পুস্তক—

ধর্ম্মপুস্তক তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ মোশার ব্যবস্থা তর্জ্জমা হইল হেব্রু ভাষা হইতে।

(৬) আলোচ্য পুস্তক সমগ্র খণ্ডে ওল্ডটেষ্টামেণ্টসহ একত্র প্রকাশিত হয় ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে। আর কেরীর ওড্ডটেষ্টামেণ্ট ১৮০২ খৃষ্টাব্দের

পূর্ব্বে কিছুই বাহির হয় নাই ; উহা ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাহির হইতে লাগে। আর উহা খণ্ডে খণ্ডে চারিখণ্ডে বাহির হয়।

(৭) কেরীর পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় ৯ দফা হইতে ১৮ দফা পর্য্যন্ত বিবৃত আছে। আলোচ্য পুস্তকে অনুরূপ পৃষ্ঠায় ৬ হইতে মাত্র ১৫ দফা আছে

(৮) এখন উভয় পুস্তকের কথাগুলি পরীক্ষা করিলেই স্পষ্ট পার্থক্য প্রতীয়মান হইবে।

কেরীর পুস্তক—

(৯) অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ্ হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ

(১০) তোমার নাম পুণ্য করিয়া জানা যাউক তোমার রাজা আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেহ

(১১) মত পালিত হউক। আমারদের দিব

(১২) সিক যাহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনার দের দায়ীরদিগকে ক্ষমা

(১৩) করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ত্ত পরাক্রমও

(১৪) গৌরব তোমার সদাসর্ব্বক্ষণ আসেন। অতএব যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা

(১৫) করিবেন। ইত্যাদি ১৮ দফা পর্য্যন্ত

আলোচ্য পুস্তকে—

(৬-৭-৮) যাহা আছে, উল্লিখিত হইল না।

(৯-১৫) অতএব এই মত কামনা কর আমাদের পিতা যিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমাদের দায় গৃহস্থেরদিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কয় আমারদিগকে আপদ একারণ রাজ্য শক্তি ও নাম তোমার সদা কাল। আসেন। এ কারণ যদি তোমার মর্য্যদা কর মনুষ্যেয়দিগকে তাহারদের সীমা বহর্ভূত তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও মর্য্যাদা করিবেন কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যের দিগকে তাহাদের বহির্ভূত মর্য্যাদা না কর তবে তোমাদের পিতা মর্য্যাদা করিবেন না।

অতএব সমস্ত প্রমাণ হইতে স্বতঃই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই ৮০০ পৃষ্ঠার 'ধর্ম্মপুস্তকথানির ভাষা, ভাব এবং বিষয় কেরীয় পুস্তকখানি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং এই পুস্তকখানি তখনকার দিনে তদানীন্তন সমস্ত অসুবিধার মধ্যে ছাপাইতে যে ৪।৫ বৎসর লাগিবারই সম্ভাবনা তাহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং ১৭৯৭।৯৮ সালে রচিত এই পুস্তকখানি কাহার দ্বারা লিখিত হয় এবং তাহা ছাপাইল বা কে এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রোমানকাথলিক মিশনরীদের যত্নেই হউক বা অন্যপক্ষের যত্নেই হোক ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত **Baptist Mission**-এ নিশ্চয়ই ইহা ছাপা হয় নাই। সেখানে হইলে নিশ্চয়ই পুস্তকখানি সম্বন্ধে লং সাহেবের ক্যাটালগে থাকিত, আর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ওষ্টেট্‌ম্যান (**Baptist Mission** হইতে প্রকাশিত)

কাগজে যে বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা ছিল, তাহাতেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

এখন যদি কেরী সাহেবদের যন্ত্রে মুদ্রিত না হইয়া থাকে তবে ইহা কোথায় মুদ্রাঙ্কিত হইল ? তবে কি শ্রীরামপুরে আরও মুদ্রাযন্ত্র ছিল ? এই বিষয়ে এস্থলে আলোচনা আমরা সঙ্গত বোধ করি।

কতিপয় সাহিত্যিক কেরী প্রভৃতি পাদ্‌রী সাহেবের পাদস্পর্শে পবিত্র বলিয়া যে শ্রীরামপুরকে সেই কারণেই "তীর্থক্ষেত্র" বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন, আমরা সেইরূপ বলিতে প্রস্তুত নহি। আমরা জানি শেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র শ্রীপুর, মোহনপুর এবং গোপীনাথপুর শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহের সেবার জন্যদেবোত্তর করিয়াছিলেন বলিয়াই গঙ্গা-তীরস্থ শ্রীরামগর তীর্থস্থান, সেই বিগ্রহ এখনও দে বাবুদের বাড়ী বিদ্যমান আছে। আরও তীর্থস্থান—কারণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা এখানে হয় বলিয়া। ইংরাজ পাদরীদের যদি দেবতা বলিয়া কেহ আনন্দ পান, তবে আমরা পাদ্‌রীদের অপেক্ষা আরও বিস্ময়কর অবস্থার কথা সাধারণের নিকট বিবৃত করিব।

বেশী দিনের কথা নয়—গঙ্গাতীরস্থ হুগলী জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রিটিশের প্রাধান্য ছিল হুগলীতে, ফরাসীগণের ছিল চন্দননগরে, ব্যাণ্ডেল্ পর্ত্তুগীজদিগের, রিষড়া গ্রীকদিগের, ভদ্রেশ্বর জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়ানদের, চুঁচুড়া ওলন্দাজদের (Dutch), আর শ্রীরামপুর দিনেমারদের (Dance).

এই দিনেমারগণের শ্রীরামপুরে প্রাধান্য ছিল ১৭৪৬ হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত। ঐ বৎসরেই তাহারা শ্রীরামপুরের প্রাধান্য ব্রিটিশদের হাতে অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত হন। ঐ একশত বৎসরের মধ্যে তাহাদের শাসন বিদেশী হইলেও সুখশান্তি বর্দ্ধনেই সামধিক ভাবে তাহা নিয়োজিত হইত। ব্যবসা-পরিচালনে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রসারে ও সুব্যবস্থায় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রসারে তাঁহারা নিয়ত যত্নশীল ছিলেন! আজকালকার কাছারী-বাড়ীই ছিল গভর্ণরের বাড়ী। আর একটি গুদাম বাড়ী একুশটি বন্দুকে রক্ষিত হইত, সেইটিতে এখন মহকুমার হাকিম থাকেন। তাহারা অন্যান্য প্রপীড়িত জাতিদিগকেও আশ্রয় দিত। তাহাদের আশ্রিত কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিসনারী যাহাতে শিক্ষা করিতে পারে এই বিষয়েও তাঁহারা উৎসাহী ছিলেন।

এই শ্রীরামপুরে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে Roman Carholic Chuch of Zion নির্ম্মিত হয়। বোধ হয় এই রোমান ক্যাথলিক্ গির্জ্জার সাহেবদিগের ইচ্ছাক্রমেই এই ধর্ম্মপুস্তক রচিত হইয়াছিল।

দিনেমারদিগের কি অক্ষরের বন্দোবস্ত ও ছাপাইবার ব্যবস্থা ছিল তাহাও প্রমাণ আছে। মাদ্রাজের ট্রানকুবারে দিনেমারদের যে উপনিবেশ ছিল তাহাতে রোমান অক্ষরে ডেনিস গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হইত। সেই গেজেট হইতে সারাংশ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুরের Administrative Notification রোমান ও বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্বেই হইত। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলে ইহা হইতে পারিত না। আর সুদক্ষ অক্ষরনির্ম্মাতা

পঞ্চানন কর্ম্মকারকে বংশপরম্পরায় 'রায় বয়ান' উপাধি এই দিনেমার সরকারই প্রদান করে। বিশেষতঃ তাঁহার নিবাস বড়হাগ্রাম, শ্রীরামপুরের অতি সন্নিকটে। পঞ্চানন বিবাহ করিয়াছিল ত্রিবেণী গ্রামে, কিন্তু বাস করিত শ্রীরামপুর সহরে। তাহার বাড়ী ত্রিবেণীতে নয়। সুতরাং এই শ্রীরামপুরে কাঠের অক্ষরে ছাপা হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছি। এই কাঠের অক্ষরে একটী ব্লক ফণীন্দ্র বাবু সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, পাঠকের তাহা দেখিলেই ভ্রমাপনোদন হইবে। ফণীন্দ্রবাবুর বাবুর বাড়ীতে বাঙ্গালা ১০৬০ (খৃঃ ১৭৫৩) সনেরও বাঙ্গালা দলিল আছে। সুতরাং দিনেমারদের যত্নে বাঙ্গালী পরিচালিত মুদ্রাযন্ত্র ছিল, তাহা অবিশ্বাসযোগ্য নহে। সজনিবাবু নিজেও নিশ্চয়ই জানেন যে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরে আসিবার অনেক পূর্ব্বে জন মিলারের টিউটার শিক্ষাতরু নামে একখানি ওয়ার্ডবুক এই শ্রীরামপুর হইতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সুতরাং ছাপাখানা সেখানে নিশ্চয়ই যে ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরিশেষে আমরা রচনারও কিছু পার্থক্য দেখাইব। ১৮০১ সালে বাঙ্গলা রচিত রামরাম বসুর রচনার বাঙ্গলা শব্দের সঙ্গে পার্শী শব্দ মিশ্রিত আছে। আর ধর্ম্মপুস্তকের কোন ভাষায় কোন ফার্সি কথার সংমিশ্রণ নাই। যেমন প্রতাপাদিত্যে—

দপ্তরে মুহুরি ছিল। পুত্রদের আরজদাস্ত অনুযায়ী কাননগো দপ্তরে মুহরিগিরিতে পদার্পণ করিলেন।

আপনারা জনেক হেন্দোস্থানে থাকিলে হেহাতও হয়।
রাজা প্রতাপাদিত্য আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন।

তবে রামরাম বসুর গ্রন্থ সে সময়কার গদ্য সাহিত্যের গৌরবের বস্তু তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই খাঁটী প্রাঞ্জল 'ধর্ম্মপুস্তক' গ্রন্থখানির সহজ ভাষাই ইহার বিশেষত্ব। অন্যত্র কেরী সাহেবের পুস্তকের বাঙ্গলা ভাষা যে ভাল নয় তাহা সজনীকান্ত বাবু নিজেই বলিয়াছেন।

এই সমস্ত মুদ্রাঙ্কণ যে কাঠের অক্ষরের, তাহার আর একটী প্রমাণ প্রায় কথার পরই একটা টান দৃষ্ট হয়, যেমন কথাবার্ত্তা—ইত্যাদি—

এতদ্ব্যতীত, ১৮০৭ সালের বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত "দত্ত কৌমুদী" আর একখানা ৪১ পৃষ্ঠার হিন্দু আইনের পুস্তকের আমরা সন্ধান পাইয়াছি। এখানি Baptist Misson Press-এতেই মুদ্রিত হয়। ইহার রচয়িতা ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা। অনুসন্ধান করিলেও আরও অনেক তত্ত্ব বাহির হইবে।

—প্রথম দিকের বাঙ্গলা পুস্তকের সম্বন্ধে আরও মৌলিক গবেষণা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে সজনী বাবু রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' সম্পূর্ণ গবেষণা হয় নাই। আরও আলোচনা করিবার আশা রহিল।

IMPERIAL